ভূমিপুত্র

ফণিভূষণ আচার্য

বিকাশ গ্রন্থ-ভবন
৩৭/৩, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিপুত্র

: জমিন ত ভগমানের,আজ্ঞা। যে যতন-পাট করবেন, পিতিপালন করবেন, ফসল ফলাবেন, মা-লক্খি হবেন উর। ভূমি ত হচ্ছেন গে মা-লক্খী। সোব্বাইকে উর কিপা হয়েন নি। যে চাষী মায়ের মতন উর যতন-পাট করবেন, পরিবারের মতন পিতিপালন করবেন, উর খামারে মা-লক্খীর কিপা উতলে পড়বেন, আজ্ঞা।

কথাটা বংশী বলেছিল আঁদুলের ঘোষবাবুকে।

দেনার দায়ে ঘোষবাবুর দোকান,বাগান-বাড়ি, জমি-জিরেত সব বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। ছিল সাবেক কালের তিনতলা বাড়িটা। ওটা বিক্রী করে তিনি স্টেশনের রাস্তার ধারে বানিয়ে নিয়েছেন ছোট্টমতন একটা চলনসই বাড়ি। তারপরেও হাতে কিছু টাকা ছিল। তাই দিয়ে কন্ট্রাক্টারি বিজনেসে নেমে পড়েছিলেন। গত কয়েক বছর টানা সড়ক তৈরী হচ্ছে—বম্বে রোড। ঘোষবাবু তাতে মাটি-কাটার কাজ পেয়েছেন। তখন ঘোষবাবুর কাজ হচ্ছিল হলুদহাটি থেকে হাবসিডাঙা পর্যন্ত তেরো কিলোমিটার রাস্তায়। দেখামাত্র ঘোষবাবু তাকে ঠিক চিনতে পারেন। কি রে বংশী, কোথায় ছিলি এতদিন ? কাজকর্ম কিছু করছিস টরছিস ?

: দেশে চাষকাম করছিলাম, আজ্ঞা। জমিন বেইমানি করলেন, আর আমিও চলে এলাম আপনার তোর কাছে কাজকাম কিছু আছে নি কি খোঁজখবর করতি—

: জমিন বেইমানি করলো, তার মানে ?

: উ অনেক কথা, আজ্ঞা। আমার বাপকেলে সিকিস্তি লাখেরাজ জমিন ছিলেন পাঁচ বিঘা। গতর ঢেলে ফসল ফলিয়েছি কি শুনতি পেলাম, জমিদার নি কি জমিদারি থাকবেন নি জানতি পেরে সোব্ জমিন দেশের এক টাকাওয়ালা বদ্মাস লোকের কাছে বেচে দিয়েছেন। আমার লাখেরাজও। লোকটা বলে কি আজ্ঞা, জমিন উর, উর খামারে ফসল তুলতি হবেন, আর পাঁচটা ভাগচাষীর মতন আমাকেও ফসলের, খড়ের আধাআধি ভাগ দিতে হবেন। আপনি তুই বাবু কি বলিস, ইটা ঠিক কথা হলেন ?

: তুই কোন্টাকে ঠিক মনে করিস ?

: আজ্ঞা, জমিন আমার, ফসল ফলালামও আমি। ইখোন জমিনের মালিকানা

আর ফসলের আদ্দেক বখরা হলেন গে ইকটা উট্‌কা টাকাওয়ালা লোকের? ই কেমন কথা, আজ্ঞা?

ঘোষবাবু তার মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকেন।

: এ সব তোর কথা? না, কারো শেখানো বুলি?

: আজ্ঞা, ই আমার প্রাণের কথা। ই মাটি আমার মা, ই আসমান আমার বাপ। আমি উঁদের ছেল্যে। আমার আর কুনো ঠাকুর-দেব্‌তা নেই, আজ্ঞা।

ঘোষবাবুকে কেমন একটু বিচলিত মনে হলো। কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন: তাহলে উৎখাত হয়ে চলে এসেছিস তুই?

বংশীর মুখে কথা কুলোয় না। শুধু চোখের কোণ দুটো মোছে।

: এখন কি করবি? কাজ করবি তো?

: আজ্ঞা—

: তাহলে হলুদহাটিতে আমার কাজ হচ্ছে। মাটি কাটার কাজ। জাতীয় সড়ক তৈরি হচ্ছে। তুই ওখানে চলে যা। আমি দুপুরে থাকবো।

মোটর বাইকে স্টার্ট দিতে গিয়ে ফিরে তাকালেন ঘোষবাবু।

: তোর পরিবার কোথায়?

কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল বংশীর। সে রাস্তার ওপাশে অনেকদূরে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার বুকের ভেতরে যেন আষাঢ় মাসের জল-থমথমে মেঘ হাহা শব্দে ডেকে উঠলো বড়ো আচমকা।

: আসে নি?

: না, আজ্ঞা।

: অহলে তো কোন জোটের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে তোকে কাজ করতে হবে রে। একা তো আর মাটি কাটার কাজ হয় না।

ঘোষবাবু বংশীর ধাতধোত সব জানেন। সে কারো সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। একা একটা পশুর মতো খাটতে পারে সে। কারো সঙ্গে খাটা তার ধাতে নেই।

বাইকে স্টার্ট দিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন ঘোষবাবু। এখন আবার আগের মতো হয়ে গেছেন ঘোষবাবু। তেমনি পান খান, গলায় সোনার হার, চোখে চশমা, সুন্দর জামা-কাপড়, মুখে মিষ্টি কথা। অন্তত তার সঙ্গে—

: ঠিক আছে। আয়, দেখি কী করা যায়।

দশ সন বাদে জলশিয়রে ফিরছে বংশী কপালি।

রাতের ট্রেন ঝিমোতে ঝিমোতে ছুটে চলেছে। কামরায় সবাই ঘুমে ঢুলছে। ইস্টেশনে ট্রেন দাঁড়াচ্ছে। ইস্টেশনগুলোও যেন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বংশীর চোখে ঘুম নেই। সে আজ দশ সন বাদে কপালিপাড়ায় ফিরে যাচ্ছে। ফিরে গিয়ে সে

কি দেখবে? তার জমিনের কি হয়েছে? তা কি এখন আগাছার কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দীর্ঘ দশ সন সে ঘুমুচ্ছে পুরু আগাছার আস্তরণের নিচে? না কি, বালির পাহাড় বুকে নিয়ে কাঁদছে তার ফসল-ফলানো জমিন এই দশ-দশটি সন? নাকি, খোকন বক্‌সির কথামতো আধাআধি ভাগে চাষ করছে কপালিপাড়ার অন্য কোন বেইমান কপালি? কে জানে?

বংশীর গলাটা জ্বলতে থাকে এক অদ্ভুত অনুভূতিতে। সেটা রাগে কিংবা কান্নায়, সে বুঝে উঠতে পারে না। আর বাতাসী? কিছুক্ষণ কপালের রগ দুটো চেপে বসে থাকে বংশী। বাতাসী কি ফিরে এসেছে? সে তাহলে পরাণের সঙ্গে কোথাও পালিয়ে যায় নি? কপালিপাড়ার কারো ঘরে কিংবা অন্য কোথাও লুকিয়ে ছিল সে। এতদিন হয়তো সে তার ঘর, খামার, জমিন আগলে বসে আছে। বসে থাকবেই তো। থাকতেই হবে। বাতাসীকে যে সে বিয়ে করেছে। মন্তর পড়ে বিয়েই কি বিয়ে, মন্তর না পড়ে জানপ্রাণ দিয়ে বিয়ে কি বিয়ে নয়? ও কথা ভেবে সে বাতাসীর জন্যে দু'খানা শাড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বোঁচকা খুলে দেখিয়ে সে কাল দারুণ চমকে দেবে বাতাসীকে।

পরমুহূর্তেই চট্‌কা ভাঙে বংশীর। ট্রেন একটা জোর ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো কোন ইস্টেশনে। বংশী কি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ? না তো, জেগেই বসে আছে সে। এই তো সে বুকে টানটান একটা নিশ্বাস নিল। এই তো ঢোঁক গিললো চোয়াল চিপে। সে নিজের চোখে ইস্টেশনের শান-বাঁধানো গাছতলায় দেখেছে বাতাসীকে, পরাণকে; শুনেছে ওদের দুজনের বুক ফালা-ফালা-করা কাঁচভাঙা হাসি। তবু আশা? তবু সে বাতাসীর জন্যে দ'খানা শাড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তার কেমন মনে হচ্ছে, বাতাসী যেন কোথাও যায় নি। গিয়ে থাকলেও নিশ্চই ফিরে এসেছে সে।

বাতাসী! বাতাসী!

কে যেন ডেকে উঠলো বাইরে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। কোন ইস্টেশন হবে, মনে হয়। এখানে কে ডাকবে বাতাসীকে? না, সে ভুল শুনেছে। কেউ অন্য কাউকে ডাকলো, বোধ হয়। কিংবা,চা গরম! এই দশ সন ধরে সে যেখানে গেছে—আঁদুল, হলুদমাটি, হাবসিডাঙা, আমতা, বাগনান, উলুবেড়িয়া, চেঙ্গাইল, সাত্রাগাছি, হাওড়া—কোথাও সে বাতাসীকে দেখতে পায় নি। বাতাসীর মতো কোন মেয়েমনিষ্যি যে তার চোখে পড়েনি, তা নয়—অনেকটা বাতাসীর মতো, কিন্তু সে বাতাসী নয়। বাতাসী অন্য রকম—যেন আশ্বিন মাসের-ঘোর-হয়ে-ওঠা গাঢ় সবুজ ধানগাছ। বাতাসী ঠিক কারো মতো নয়, বাতাসী ঠিক বাতাসীরই মতো।

বেলা তখন রগের পাশে হেলে পড়েছিল, বংশী হলুদহাটিতে হাজির হলো। বুড়ো হরিদা একটা পশ্চিমা মজুরকে নিয়ে ফিতে দিয়ে মাটি মাপছিলেন। ঘোষবাবু

খাতা-হাতে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন কাছে দাঁড়িয়ে। রাস্তার ধারে তাঁর মোটর বাইক রোদ খাচ্ছে। শ' খানেকের বেশি লোক কাজ করছে। মাটি কাটা হচ্ছে, উঁচু চওড়া সড়ক তৈরি হচ্ছে। কাছেই তাঁবু পড়েছে কয়েকটা। তাঁবুগুলো তেরপলের। ওপাশে হোগলার অনেকগুলো ঝুপড়ি। ওগুলো পশ্চিমা মজুরদের জন্যে। মরদদের হাতে কোদাল ওঠানামা করছে, মেয়েদের মাথায় মাটির ঝুড়ি চালান হয়ে যাচ্ছে নির্মীয়মাণ সড়কের ওপর। সে এক বিরাট কাণ্ড!

এখন বংশীর নিজেকে বড়ো একা মনে হচ্ছে। বিরাট এই পিরথিবি, তার কত জনমনিষ্যি। সবার সব আছে, সবাই আছে। তার কেউ নেই, কিছু নেই। বাতাসী নেই, জমিনও নেই। জলশিয়রের কপালিপাড়ার বংশী কপালিকে এখানে কেউ চেনে না। তেষ্টায় গলার থুতু শুকিয়ে কাঠ। খুব জোরে হেঁটে এসেছে সে এই ক' ক্রোশ পথ। এই পথই তাকে পথ চিনিয়ে হলুদমাটি নিয়ে এসেছে। পথ আর মাথার ওপরের আকাশ ছাড়া তার আজ আর কিছুই নেই।

বংশীকে ঘোষবাবু কি চোখে দেখেছেন, কে জানে, তাকে দেখামাত্রই তিনি কাছে ডাকলেন। বংশীর সরল সততা ঘোষবাবুর ভালো লেগেছিল। সেইজন্যে উঁনি ওকে খুব পছন্দ করতেন, তার ভালোমন্দের কথা চিন্তাও করতেন। মোটর বাইকে আসার সময় তিনি ভেবেছেন, একগুঁয়ে এবং একরোখা বংশী মাটিকাটার ব্যাপারে এখানে কারো সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে না, কারো সঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। হরিদাকে তিনি ডাকলেন। হরিদা মাপজোঁখ ফেলে কাছে আসে।

: দ্যাখো তো হরিদা, ওকে চিনতে পারো কিনা—

হরিদার চোখ এখনও পরিষ্কার। বয়েস তাঁর দৃষ্টিকে কাবু করতে পারে নি। বলেন : কেন পারবো না? এ তো আমাদের সেই বংশী।

বংশী মাথা নামিয়ে হাসলো।

: ও তো এবার আবার পরিবার সঙ্গে আনে নি। মাটি কাটার তো অসুবিধে হবে ওর। তুমি একে অফিসের কাজে রেখে দাও, হরিদা।

তাই হলো। সেদিন থেকে বংশী ঘোষবাবুর অফিসের কাজে বহাল হয়ে গেল। দারোয়ানকে দারোয়ান, বেয়ারাকে বেয়ারা। সব সময় হরিদার কাছাকাছি থাকে। হরিদার ফরমাস খাটে, অন্য সময় অফিস পাহারা দেয়। রাতে হরিদা অফিসে ঘুমোয়। বংশী ঘুমোয় পাশের হোগলার ঝুপড়িতে। নিজেই রাঁধে, খায়। সড়কের ধারেই অফিস, সড়কের ধারেই ঝুপড়ি। একটু দূরে পশ্চিমা মজুরদের ঝুপড়ির সারি। ওদের ওপাশে থাকে কয়েকটি সাঁওতাল পরিবার। জ্যোৎস্নারাতে ওরা হাঁড়িয়া খায়, মাদল বাজায়, নাচে, গায়। বংশীর কিছুই ভালো লাগে না। মনের ভেতরে একটা গভীর দুঃখ সুব সময় যেন মাটি আঁচড়ে ফালা-ফালা করতে থাকে। এবং ক্রোধ। সাঁওতালদের ঝুপড়ির ওধারে দূরে মাঠের শেষ কিনারে সূর্য ডোবে। বংশীর

মনের মধ্যে মেঘ ডাকে। তার জমিনের কথা মনে পড়ে। কাঁচা সোনার মতো ভারি ভারি ছড়ায় ধান ফলিয়েছিল সে এবছর। এমনি পাথর চাপা কপাল, মা লক্ষ্মী এসেও ঘরে এলেন না। ঘরের লক্ষ্মী বাতাসীও বার হয়ে কোথায় চলে গেল। ওদিকে খোকন বকসি, এদিকে পরাণ। সমুদ্র, বালিয়াড়ি, আকাশের শয়তানির সঙ্গে লড়াই করে যদি-বা সে তার জমিনের মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, মানুষের শয়তানির সঙ্গে সে পারলো না, হেরে গেল।

শত্তুর! সোব্ শালা শত্তুর!

রাতে চোখে ঘুম আসে না বংশীর। মনটা পুড়তে থাকে।

বাঁশি বাজিয়ে রাতের ট্রেন অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটে চলেছে। তীরের ফলার মতো বাঁশির ধারালো আওয়াজের রেশ কোন্ দূরের বুক চিরে উধাও হয়ে যাচ্ছে। বংশী কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? মনে হয়, পড়েছিল। ঠিক ঘুম নয়, ঘুমের মতো। চট্‌কা ভাঙলো তার। কে যেন দূরে কোথায় বাতাসীর নাম ধরে গলা চিরে ডেকে উঠলো। একবার নয়, দু'বার। নাহ্, বাতাসীকে কে ডাকবে এখানে? ভুল। সে স্বপ্ন দেখছিল, বোধ হয়।

বাতাসী উঠোন নিকিয়েছিল নতুন ধান উঠবে বলে। ধান আর উঠলো না। খোকন বক্‌সির ডাক এলো। হুকুম হলো, ধান তুলতে হবে ওর খামারে। আদ্‌ধেক বখরা দিতে হবে তাকে, খড়ের বখরাও আদ্‌ধেক। মিনতি করে সে খোকন বক্‌সিকে বলেছিল, ওটা তার লাখেরাজ সিকিস্তি জমিন। বালিয়াড়ি সরিয়ে জান ঢেলে সে জমিন চাষ করেছে। কোন কথাই শুনলো না সে। মধুয়া বলেছিল, দু'পা সামনে এক-পা পিছনে। তার মানে তিন ভাগের এক ভাগ। জমিদারের কাছ থেকে শিরোপা - পাওয়া তার লাখেরাজ জমিন। খোকন বক্‌সির হুকুম সে শুনবে কেন? খোকন বক্‌সিও না-ছোড়, শুনবে না কোন কথা। বখরা তাকে দিতেই হবে। জমিদারের কাছ থেকে সব জমিন সে চুপিসাড়ে কিনে নিয়েছে। কিন্তু তার জমিন তো সব জমিনের মতো নয়। তার জমিন তো শুধু জমিদারের জমিনই নয়, সমুদ্দুরেরও। দুখী কপালির বংশ যে সেই জমিন সমুদ্দুরের সঙ্গে লড়াই করে তার খাবোল থেকে জোর করে ছিনিয়ে এনেছে। তার আগে যে সমুদ্দুর তার জমিনের সারা গা তার নোনা জিভ বুলিয়ে চেটে দিয়ে যেত খুশিমতো। জটা দেখেছে, ঘনু দেখেছে, কপালিপাড়ার সোব্‌বাই দেখেছে।

শত্তুর! সোব্ শালা শত্তুর!

কিন্তু বাতাসী? ও তাঁকে ফেলে চলে গেল কেন? জমিনে সেও তো গতর ঢেলেছিল, জমিনকে সেও তো ফসলবতী করে তুলেছিল। সেদিন যে পাকা সোনার রঙ তাদের জমিন খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, ওতে ওরও তো বখরা ছিল।

বাতাসী না হলে সে ওই নোনা- লাগা খরার ডাইনি- চোষা জমিনে ফসল ফলাতে পারতো না। সারাদিন মাথায় করে বালির ঝুড়ি বইতে বইতে সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। অবসন্ন একটা মাদী জানোয়ারের মতো সে হাঁপাতে থাকতো খর রোদের তাতে। তা দেখে বংশীর মায়া নয়, কেমন একটা রাগ তার মনের মধ্যে গরগর করে উঠতো। অত বছর বাতাসী সহবাস করছে তার সঙ্গে, কিন্তু এখনো কোন সন্তান ওর পেটে আসে নি। বাঁজা! তার জমিনও বাঁজা, আর যে মেয়েমনিষ্যিকে নিয়ে ঘর করছে সে এতগুলো বছর, সেও বাঁজা। চোয়াল দুটো শক্ত করে সে শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো একটা জানোয়ারের মতো। বাতাসী ভয় পেয়ে যেত, বালির ওপর ঝুড়িটা ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ে ভয়ে শুধু জিজ্ঞেস করতো: কি হলেন?

চোয়াল দুটো আরো শক্ত করে বংশী বলতো: হবেন নি—

মুখ শুকিয়ে বাতাসী জিজ্ঞেস করতো: কি হবেন নি?

: তোকে দিয়ে ফসলের আবাদ।

মাথা পেতে বালি-ভরা ঝুড়ি বংশীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে বলতো; হবেন গ হবেন। ইখনো শরীলে জোয়ার আছেন, গায়ে গতর আছেন ভরা কোটালের—

বাতাসীর হাসিতে ফুরফুরিয়ে বালি উড়ে পড়তো মাঠময়। তখন কেমন ধারালো একটা রগরগে যন্ত্রণা ওর বুকের শিরায় একটা ক্রুদ্ধ সাপের মতো বারে বারে মোচড় দিত। ঝুড়ি কোদাল গুছিয়ে নিয়ে মাথার গামছায় কপাল মুখ মুছতে মুছতে সে বলতো: থাক্। ইখোন ঘরে চল্—

বাতাসী ওর মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামাতো। বুঝতো সব। দেখতো, আকাশের রোদ্দুরে আর সেই গনগনে ভাব নেই, পশ্চিমের দিগন্তের ধারে আকাশের মুখ লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে।

দুজনের গতরে আর আশমানের দয়ায়-দরদে ওদের জমিনে ফসল ফললো। সেও যেন এক বাঁধভাঙা বন্যা। কিন্তু বাতাসীর পেটে বাচ্চা এলো না। বাতাসীর মনের ভেতর, চোখের ভেতর কে যেন কাঁদে। বংশী বুঝতে পারে। রাতপাখির ডাকের মতো সেই কান্না। কি করবে, সে বুঝতে পারে না। এমন সময় রাস্তার ধারে এবং মাঠময় ছড়িয়ে পড়ে-থাকা গোরু-বাছুর আর মানুষের হাড়-গোড়-কংকাল, মাথার খুলি— সব কোথায় উধাও হয়ে যায়। অন্ধকারে, বাতাসে বিড়ির আগুনের ফুলকি ভাসিয়ে পরাণ ফিরে আসে কপালিপাড়ায়। আকালের সনে বাতাসীকে মরবার জন্যে একলা ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে মাকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে গিয়েছিল শালা পরাণ। গ্রাম ফাঁকা। একটা জনমনিষ্যিও ছিল না গাঁয়ে। বংশীই বাতাসীকে বাঁচিয়েছিল। জীবনের কঠিন পথে সে সঙ্গিনী করে নিয়েছিল ওকে। আঁদুলের ঘোষবাবুর বাগানবাড়ির কুঁড়েঘরে ওকে সে নিজের

পরিবারের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাতে পূর্ণ সম্মতি ছিল বাতাসীর। কিন্তু বংশীর সঙ্গে এতগুলো বছরের সহবাসেও তার পেটে আসে নি কোন সন্তান। বংশীর মনে হতো, এতগুলো বছরেও সে বাতাসীকে সুখ দিতে পারে নি। সে বুঝেছিল, শুধু শরীলের সুখই সুখ নয়, সেই সঙ্গে চাই মনের সুখও। প্রিয় ওঝাকে দিয়ে নক্ষত্র-পূজা করে রাখুর বউর ছেলে হলো। ব্যাপারটা যে কী, তা বাতাসীও জানে, বংশীও জানে। তবু মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বংশী রাজি হয়েছিল সেইভাবে বাতাসীকে দিয়ে নক্ষত্র-পূজা করাবার জন্যে। কিন্তু তার আগেই কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল, সব ওলটপালট হয়ে গেল তার।

কে যেন দূরে কোথায় হাওয়া চিরে চিৎকার করে ডেকে উঠলো : বাতাসী—

ট্রেন একটা ইস্টেশনে যান্ত্রিক আর্তনাদ রেখে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সর্বনাশ! এ যে তাদেরই ইস্টেশন। ভাবনার তোড়ে ভেসে গিয়েছিল ওর মন। খেয়ালই ছিল না ট্রেন কতদূর এলো। দড়বড়িয়ে নামতে গেল বংশী। ধস্তাধস্তি করে নামতে হলো। এই সেই প্লাটফর্ম। অনেকটা চওড়া হয়েছে এখন। চেহারা পাল্টে গেছে একেবারে। ওই তো সেই শান-বাঁধানো গাছটা। গুঁড়িটা বেশ মোটা সোটা হয়েছে। ওর আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিল পরাণ আর বাতাসী ট্রেন আসার অপেক্ষায়। চাপা গলায় কথা বলছিল দুজনে, হাসছিল খিলখিলিয়ে। সে একটা দিন গেছে। হাতের মুঠো খুলে সেদিন সে সব হারিয়েছিল— হাতের ছুরিটাও সেদিন সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল দূরে— নয়ানজুলির জলে। দু'চোখে চাপসা কুয়াশা নিয়ে কাঠের স্লিপারগুলোর ওপর লাথি মারতে মারতে দূরের পথে পাড়ি দিয়েছিল বংশী। দুঃখ নয়, রাগে অভিমানে পৃথিবীটাকে সে গুঁড়িয়ে ফেলতেই চেয়েছিল সেদিন।

: অ্যাই—

নির্জন নয়ানজুলির জলে ভয়ে কি যেন একটা ঝাঁপ দিল। শব্দ হলো। নিশাচর কিছু হবে।

ভয়ে টিকস্‌বাবু হাত গুটিয়ে নেয়। বংশী ওর পকেটে টিকিটটা গুঁজে দিয়ে বাইরে এসে দ্যাখে, তখনও রাত আছে। লম্বা বাসে ধস্তাধস্তি করে লোক উঠছে। বংশীও উঠলো বোঁচকা মাথায়। সীটে বসে বোঁচকার ওপর পা তুলে দিল।

আজ বংশী দশ সন বাদে জলশিয়রের কপালি পাড়ায় ফিরে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে হঠাৎ তার কুইলির কথা মনে পড়লো। কুইলি বিশু খুড়োর বিশ বছরের পালাহড়কী মেয়ে। মরদ-মরদ চেহারা, মরদ-মরদ মেজাজ। কালো রং, বড়ো-বড়ো চোখ আর ভারী বুকে ওকে জলশিয়রের সবাই ভয় পেত। কিন্তু ওর সেই রূপের মধ্যে একটা নেশা ছিল— হাঁড়িয়ার নেশা। পোকা-মাকড়ের চোখে প্রথম বর্ষারাতের আগুনের শিসের মতো একটা ভয়ংকর টান। একটু বেশি বয়েসেই বিয়ে হয়েছিল

তার। শরীলে অমাবস্যার ভরা কোটালের জোয়ার নিয়ে সোয়ামির ঘর করতে গিয়েছিল কুইলি। কিন্তু সোয়ামির ঘর করা হলো না তার। কি যে হয়েছিল, সে-ই জানে। মধুয়ার বউ, বুধিয়ার মা বা ঝড়ু কপালির বউ জিজ্ঞেস করলে বলে : বাপ বিটাছেল্যে ভেবে বে দিয়েছিলেন। কিন্তুক উটা ত ইকটা মেয়েছেল্যে। মেয়েছেল্যের সাথে মেয়েছেল্যে ঘর করতি পারেন কি?

: ত, তুই ত ইকটা বিটা ছেল্যেকে—

: হঁ, পারলি ইকটা বিটা ছেলেকেই বে করব।

সবাই জানতো, কুইলির 'লজর' বংশীর দিকে। ব্যাপারটা বাতাসীও জানতো। বিশু খুড়োরও বংশীর ওপর 'লজর' ছিল। ব্যাপারটা বংশীরও অজানা ছিল না। কিন্তু বাতাসীকে ছাড়া সে অন্য কোন মেয়েমনিষ্যিকে ভাবতেই পারতো না। বাতাসীই ওর জীবনের প্রথম মেয়েমনিষ্যি— প্রথম বর্ষার রূপসী ধানগাছ। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে যায় ঘোষবাবুর বাগানের কথা, পুকুর, পুকুরের ঘাট, মাটির চওড়া দাওয়া, কুপী-নেভানো অন্ধকার ঘর, মেয়েমনিষ্যির গায়ের আঁশ্‌টে গন্ধ, হাতের মুঠোয়-পাওয়া প্রথম যৌবন ...। বংশী বাতাসী ছাড়া কোন মেয়েমনিষ্যির কথা ভাবতে পারে না। বাতাসীর শরীলের রূপসী ছায়া ওর চোখে 'লিশা' ধরিয়ে দেয়। সে বাতাসীর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। শরীলের মধ্যে কেমন-একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। সে চোখ সরিয়ে ওর খরায়-পোড়া জমিনের ওপর রাখে। তার আর বাতাসীর এখন কত কাজ। বাঁজা মাটিতে ধান ফলাতে হবে। ধান ওরা ফলিয়েও ছিল। কিন্তু ভাগ্যে সইলো না। খোকন বক্‌সির জানোয়ারের মতো লোমভরা হাতের লোভী থাবা এগিয়ে এলো। শালা নাকি নুনের কারখানা করবে ওখানে। তার সিকিস্তি লাখেরাজ জমিনে হবে খোকন বক্‌সির নুনের কারখানা! সে শাসিয়ে এসেছিল খোকন বক্‌সিকে : আমি বংশী কপালি। আমারও শরীলে লেঠেল রক্ত আছেন। কিন্তু ওর শরীলের লেঠেল রক্ত সেদিন আকাশের বাজের মতো ফেটে পড়ে নি। নিজের হাতে ফলানো ধান নষ্ট করে সে নিজের তৈরি বালিয়াড়ির বালির মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল সন্ধ্যে পর্যন্ত— দুঃখে নয়, ভাগ্যের ওপর রাগে, অভিমানে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, জানে না, ঘুম ভাঙলো সেই কুইলির ডাকে। ওকে খুঁজছে সবাই কপালিপাড়ায়। আর ওকে খোঁজা! দশ সন কেউ ওকে খুঁজে পায় নি।

বাস কখন ছেড়ে দিয়েছে, সে জানে না। রাস্তার ধারের সারবন্দী গাছগুলো হাত-ধরাধরি করে গায় জমাট বাঁধা অন্ধকার নিয়ে সাঁই-সাঁই করে ছুটে যাচ্ছে পেছনের সব-মুছে-যাওয়া গাঢ়তর অন্ধকারের দিকে। পেছনের দশটা সন সে ফেলে এসেছে জাতীয় সড়কের ধারের ঝুপড়িতে। পেছনের দিকে তাকায় সে। দেখে, দু'খানা সীটের পর একটা সীটের প্রায় সবটা জুড়ে থলথলে শরীল নিয়ে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে বসে আছে— অন্য কেউ নয়, চন্নপুরের সেই খোকন বক্‌সি।

সঙ্গে সঙ্গে বংশীর হাতের শিরাগুলো ফুলে উঠলো ফণা তুলে ফুঁসে-ওঠা ক্রুদ্ধ সাপের মতো। বুকটা হাপরের মতো উঠছে, নামছে। গলাটা আঠার মতো বিস্বাদে জড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষ যখন মানুষকে খুন করে, তার বোধ হয় এই রকমই গলা বিস্বাদ হয়ে যায়। রাগে একটা হিংস্র জানোয়ার তার বুকের ভেতর ধারালো নখে মাটি আঁচড়াতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী জানোয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ধারালো নখগুলোতে বোধ হয় সে একবার ভালো করে শান দিয়ে নেয়। বংশীর গলার ভেতরে একটা গরগর করে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

তুই সেই খোকন বক্‌সী, লয়? আমার সাত পুরুষের পাঁচ বিঘে লাখেরাজ তুই গিলেছিস, পরাণকে দিয়ে বাতাসীকে ঘরের বার করে লিয়েছিস, আমাকে গাঁ ছাড়া করেছিস। তোকে আজ বহুদিন বাদে লাগালের মধ্যে পেয়েছি। আজ তোকে আমি ছাড়তে লারব রে, গিধোড়। তোর কল্‌জেটা ছিঁড়ে আমি আজ চায়ে বুড়িয়ে খাব!

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বংশী হাতের আঙুলগুলো কট্‌কট্‌ শব্দে মট্‌কায়। হঠাৎ তার মনে হয়, সে গাঁ ছেড়ে চলে এসে ঠিক করে নি। খোকন বক্‌সির সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া করে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যের মাছি-অন্ধকারে ঘরে ফিরে বাতাসীকে দেখতে না পেয়ে পরাণকে খতম করার কথা তার মনে আগে এসেছিল। তার ফলন্ত লাখেরাজ জমিনের কথা তখন সে ভুলে গিয়েছিল। খোকন বক্‌সির কথা তখন আর তার মনে ছিল না। পরাণের অনেক তালাশ করেছে সে। হরিদার সঙ্গে সে বার-দুই হাওড়া হয়ে কলকাতায় গেছে। এদিক ওদিক সে অনেক খুঁজেছে। পায়নি। কি পেল্লাই শ[illegible] কলকাতা। বাতাসীকে নিয়ে ওখানে কোথায় সেঁধিয়েছে শালা, খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। পরাণকে পায়নি সে, কিন্তু দশ সন বাদে সে আজ পেয়েছে খোকন বক্‌সিকে একেবারে নাগালের মধ্যে। পেছনের দু'খানা সীটের পর বসে আছে খোকন বক্‌সি। বাসের ভিড় মনের কুয়াশার আড়ালে কোথায় হারিয়ে যায়। মানুষগুলোকে সে দেখতে পায় না। তার চোখের সামনে খোকন বক্‌সি— একা খোকন বক্‌সি।

: চিনতে পারিস আমাকে তুই?

: কে তুই?

: কে আমি? দ্যাখ্‌ দেখি ভাল করে—

: অ। তুই জলশিয়রের কপালিপাড়ার সেই— কি যেন তোর নাম?

: বংশী কপালি।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, বংশী কপালি—

: আমাকে তা'লে তোর মনে পড়েছেন?

: পড়েছে। তা সামনে এসে এভাবে দাঁড়ালি কেন?

: তোর ওই বুকের থলথলে মাংসের নিচে যে কলজেটা আছে, উটা আজ একবার দেখব—

: কলজে? আমার? কেন?

: উটা আজ আমি একটু চাখব—

: অ্যাঁ? আমার কলজে— তুই চাখবি? এত বড় সাহস তোর?

: হুঁ। ইতো বড় সাহস! আমার নাম বংশী কপালি, বাপের নাম মেঘু কপালি, উর নামে মেঘ ডাকতেন। আমার বংশের দুখু কপালি ডাকাত ঠেঙিয়েছিলেন। উ তুই জানিস না—

: আমার জানার দরকার নেই।

: দরকার আছেন। তুই আমার বংশের পাঁচ বিঘে জমিন চুরি করে গিলে ফেলেছিস্—

: ও— সেই জমিন? ও তো আমি হক টাকায় কিনে নিয়েছিরে।

: উ আমার বংশের লাখেরাজ জমিন— জমিদারের কাছ থেকে শিরোপা পেয়েছিলেন আমাদের বংশের দুখু কপালি। উ জমিন বিক্রি হয়েন না।

: বিক্রি হয় না তো আমি কিনলুম কি করে?

: চুরি করেছিস। তুই জমিন-চোর।

: মুখ সাম্‌লে কথা বলবি—

: এ্যাই—

ভুলের ঘোরে চিৎকার করে উঠেছিল বংশী। চমক ভেঙে চেয়ে দ্যাখে, কণ্ডাক্টার টিকসের জন্যে ওর সামনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে টিকস্ কাটলো সে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, সবাই ওকে চেয়ে দেখছে। বোধ হয়, চিৎকারটা একটু জোরেই হয়ে গেছে। তা হয়তো হয়েছে। খোকন বক্‌সি শুনলেও শুনে থাকতি পারেন। শুনে থাকলি ত ভারি বয়ে গেল আর কি! আমি বংশী কপালি, আমার বাপ মেঘু কপালি, উর নামে আসমানের মেঘ ডাকতেন। হুঁ—

রাতের বাস একটানা ছুটে চলেছে। সেই একঘেয়ে যান্ত্রিক কাঁপুনির মতো আওয়াজ। এক-ঘেয়ে আঁধার-মোড়া রাস্তার ধারের দৃশ্য। একটা কালো ফিতের মতো পিচের রাস্তাটাকে বাসটা গিলতে গিলতে চলেছে। জানলা গলে হু হু-হাওয়ায় বংশীর মাথার চুলগুলো উড়ছে। চোখ বুজে আসে আরামে। চোখ বন্ধ করে সে ভাবে, সে কেন ফিরে যাচ্ছে জলশিয়রের কপালিপাড়ায়। গত দশ সন মাটি কাটার কাজে জাতীয় সড়কের ধারের ঝুপড়িতে কেটেছে তার। তাও এক জায়গায় নয়। বার বার তাকে ঝুপড়ি ভেঙে নিয়ে নতুন জায়গায় আবার নতুন করে ঝুপড়ি

বানাতে হয়েছে। এক জায়গায় কাজ ফুরিয়ে গেলে অন্যখানে নতুন কাজ শুরু হয়েছে ঘোষবাবুর। অফিসের তাঁবু আর ঝুপড়ির হোগলা মাথায় নিয়ে হরিদার পেছনে পেছনে নতুন জায়গার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বংশী।

বৃষ্টির মরশুমে কাজ বন্ধ থাকতো। কিন্তু বর্ষার শেষে আকাশ পরিষ্কার হয়ে একেবারে সুনসান হয়ে গেলে আবার পুরোদমে শুরু হয়ে যেত রাস্তা তৈরির কাজ। একা-একা ভীষণ খারাপ লাগতো বংশীর। সারাদিন সারারাত দারোয়ানি, মাঝেমধ্যে অফিসের, কখনো হরিদার টুকিটাকি কাজ করে দিতে হতো। কাজের হাল-হকিকত দেখতে রোজ মোটর বাইকে চেপে আসেন ঘোষবাবু। তখন বংশীকে তাঁর কাছাকাছি থাকতে হতো। সব চেয়ে বেশি কাজের চাপ থাকতো 'হপ্তা'র দিন। সেদিন ছোট-ছোট ঠিকাদারদের টাকা-পয়সা দেওয়া হতো। তাঁবুর বাইরে চেয়ার-টেবিল পেতে বসতেন ঘোষবাবু আর হরিদা। টেবিলের ওপর একটা কালো রঙের লোহার বাক্সে থাকতো গোছা-গোছা টাকার বাণ্ডিল। কাছেই মাথায় এবং কোমরে গামছা বেঁধে লাঠিহাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো মেঘু কপালির ছেলে বংশী কপালি।

দিন কেটে যাচ্ছিল, ঝুপড়ির জীবন যেমন কাটে। একা-একা। এই সনে কার্তিক মাসে কোথা থেকে এসে জুটলো বিন্দিয়া। শ্যামলা মাজা গায়ের রং, শরীর-ভরা যৌবন, কপালে সিঁদুরের টিপ, চোখে কাজল, মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল বেশ কায়দা করে বাঁধা, পরনে রং-বেরঙের ছাপা শাড়ি। সড়ক-তৈরির কুলি-কামিনদের মধ্যে ওর চেহারা চোখে পড়ার মতো। ও মাটি কাটে না, মাথায় ঝুড়িও বয় না, শুধু এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, কথায় কথায় হাসে, পান খায়, আর অস্থির চোখের চাউনি নিয়ে তাকায় পুরুষ-মনিষ্যিদের দিকে। সে কোথায় থাকে, কেউ জানে না। কিন্তু সারাদিনই ওর কাটে সড়কের ধারে-ধারে ঠাট্টা আর রঙ্গ-তামাসায়। সন্ধ্যের পর আর দেখা যায় না, কোথায় যায়, কে জানে। সবাই জানে, বিন্দিয়ার মধ্যে রাতের নেবুফুল ফোটে। সেই গন্ধে সে যাকে ইচ্ছে, তাকেই ডেকে নিতে পারে— ঠিক নিশিডাকের মতো। তারপর আতান্তরে নিয়ে গিয়ে হয় রক্ত শুষে খেয়ে নেয়, নয়তো গলা টিপে নিঃশব্দে কোথায় মেরে ফেলে— কে জানে। ওর অত রূপ দেখে সবাই যেন ভয় পায়। হরিদা ওর দিকে কেমন একটা সন্দেহের চোখে তাকায়। কিন্তু বংশী ওকে কোথাও কখনো ঠিকাদারদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে।

মাসখানেকও আসেনি বিন্দিয়া। তারই মধ্যে তাকে ঘিরে কুলিকামিনদের লাইনে কেমন একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ে।

সেদিন দুপুরের রোদে বংশী গাঁ-ধারের টিপকল থেকে খাবার জল আনতে গিয়েছিল। সঙ্গে দুটো মাটির কলসী। একটা তার ঝুপড়ির, অন্যটা হরিদার অফিসের। কলসী দুটোয় জল ভরা হয়ে গিয়েছিল। সিকে-বাঁক ছিল না। তাই একটা কলসী

কাঁধে বসিয়ে অন্যটা হাতে নিতে যাবে, এমন সময় খিলখিল করে হাসি। চারদিকে তাকায় বংশী। একটা শিরিষ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বিন্দিয়া।

: এ তু, কেইসা মরদ রে? ভার নেই, বাঁক নেই—দু'দুটা গাগরা লিয়ে পানি লিতে আইছিস? হি হি হি—

এরকম পরিস্থিতিতে বংশীর রেগে যাবার কথা। আজ কিন্তু সে বিন্দিয়ার আচরণে রাগতে পারলো না। জিজ্ঞেস করে: তোর তাতে কি?

: কুছ নেহি। হট্, হাতেরটা হামাকে দে। হামি লিয়ে যাবে।

বলে সে তাকালো বংশীর মুখে।

: ডর্ মাত্। , হামি তোর ঝুপড়িতে পৌঁছিয়ে দিবে।

বংশী রুখে দাঁড়ায়।

: তুই লিয়ে যাবি ক্যানে? আমি তেমন মরদ লয় রে। আমি দু'কাঁধে দুটো কলসী লিয়ে যাবার তাগদ রাখি। জানিস?

: আরে যা যা। ঢের তাগদ দেখা হ্যায় হাম। হাতের গাগরা ছোড়্—

বিন্দিয়া কোনাকুনি তাকায় বংশীর চোখে। বংশীর বুকের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে, হাতটা কেমন শিথিল হয়ে যায়। সত্যি, বিন্দিয়া জাদু জানে। শরীল দুলিয়ে মাথায় কলসী নিয়ে সে বংশীর আগে-আগে চলতে থাকে। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় বিন্দিয়া। ফিরে তাকায় তার দিকে।

: তু ঘোষবাবুকা দারোয়ান আছিস্। নেহি?

: হুঁ।

: তু ঘোষবাবুকে বলে হামার আদ্‌মিকা এক্‌ঠো কাম জুটিয়ে দে না—

: তোর আদ্‌মির কাম?

: হাঁ।

: কি কাম?

: এই দারোয়ানি-টারোয়ানি—

: তোর আদ্‌মি কুথায়?

বিন্দিয়া একথার কোন জবাব না দিয়ে তাকে পুছ করে: তোর সাদি হয়েছে?

: তাতে তোর কুন্ কাম?

বিন্দিয়া খিল খিল করে হেসে ওঠে।

: কৈসা আদ্‌মি রে তু? সাদি নেহি হোনে সে মরদ কৈসে হোয়?

হঠাৎ ওর গলায় হাসির তোড় কমে যায়।

: এত উমরেও কি তোর সাদি হয় নি? আওরত কাঁহা?

বংশীর এই দশ সনে 'আওরত' কথাটা জলভাত হয়ে গেছে। তার আগে চটকলে কথাটা সে প্রথম শুনেছিল। তখন তার আওরত তার সঙ্গেই থাকতো। এখন নেই। সে বলে: আমার আওরত নেই।

: মর গিয়া ?

: উঁহু——ন্-না।

: তব্? ভাগ গিয়া ?

বংশী বুঝে উঠতে পারে না, বিন্দিয়ার এ সব কথা পুছ করার মানে কী? তার কথার কোন জবাব না পেয়ে বিন্দিয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসি তো নয় যেন টুটা সিসার টুক্‌রো—— পাঁজর কেটে বসে। আর চোখের সামনে ওর চলার লচক তাবড়-তাবড় লোকদের মায় ঠিকাদারদের পর্যন্ত মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

কলসীর একটু জল ছলকে পড়েছিল বংশীর কপালের ওপর। কপাল থেকে গড়িয়ে চোখে। বিন্দিয়া পেছন ফিরে তাকায়; দ্যাখে, বংশী গামছার খুঁট দিয়ে তার কপাল, চোখ, মুখ মুচছে।

: বড় ধূপ। থোড়া ছায়া বি নেই কুথাও——

: আমার জন্ম হইছিলেন রোদ্দুরে; আমার মিত্যুও হবেন রোদ্দুরে——

: এই ত সবে কাঁচা উমর, এখনই মরবি কি রে? আওরত ভেগেছে ত কি হয়েছে। আর একটা আওরত ধরে ডেরা বাঁধবি। জিন্দেগি আবি তক ভোগই করলি না। এখনই মরবি কি রে? মরণ যো হোগা, উ তুকে লেগা নেহি? ছুঁয়েগা ভি নেহি।

: তোর ডেরা কোথায় রে, বিন্দিয়া?

: হামার ডেরা ?

আবার বিন্দিয়ার সেই হাসি।

: হামার ডেরা নেই।

: তবে থাকিস কুথায় ?

: যার-তার ডেরায়। যে যখন ডাকে।

বিন্দিয়া দুহাতে মাথার কলসীর গলা চেপে ধরে খুব ধারালো চোখে তাকায় বংশীর দিকে।

: তোর ডেরায় থাকতে দিবি হামাকে।

: আমার ডেরা নেই, কুথাও ডেরা নেই। ঝুপড়িতে থাকি।

: ও-হি ঝুপড়িতেই। আসব আজ রাতে ?

বংশীর সমস্ত শরীরের রক্ত শির-শির করে ওঠে। যেন মাঠের ধারের অশথ গাছের পাতায় লেগেছে কার্তিকের গা-শিরশির শরীর-কাঁপানো হাওয়া। মাথাটা কেমন ঘুরে যায় বংশীর। তার চোখের মধ্যে বিন্দিয়া, তার মনের মধ্যে বিন্দিয়া। তার রক্তের মধ্যে বিন্দিয়া, তার হাসির টুটা সিসার গুঁড়া শিরশির করে হাঁটছে তার রক্তের মধ্যে। ঘোর যখন কাটলো, তখন সে দ্যাখে, কিছু না বলেই লচক মেরে বিন্দিয়া কলসী-মাথায় অফিসের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে নিঃশব্দে। অফিসে সব সময় কিছু-না-কিছু টাকা পয়সা থাকেই। বাইরের কারোর তাই অফিসে ঢোকা

নিষেধ। হরিদা এই বুঝি চোখ-মুখ পাকিয়ে তেড়ে আসবেন, বের করে দেবেন বিন্দিয়াকে। হয়তো দু'একটা কড়া কথা শুনতে হবে তাকেও। বংশীও কিছু না বলে অফিসের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। হরিদা স্বপাকে খান। রান্না করছিলেন তিনি। হঠাৎ তাঁবুর মধ্যে বিন্দিয়াকে দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। একটু পরে তাঁবুতে ঢুকলো বংশী। বংশীকে দেখে হরিদার মুখে কথা ফুটলো।

: তাই বল্। আমি ভাবি, এ আবার জুটলো কোথ্ থেকে—

বংশী কোন রকমে বলে: টিপকলে দেখা হয়ে গেলেন। কলসী ছিল দুটো। ভার-বাঁক নেই। তাই—

বিন্দিয়া ততক্ষণে মাথার কলসীটা ভুঁয়ে নামিয়ে রেখে হাল্কা পায়ে তাঁবু থেকে হাওয়া।

জলশিয়রের কপালিপাড়ায় আর ফিরবে না, বংশী মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছিল। যে মাটিতে সারা জীবন সে গতর ঢেলে তার মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, যার ওপর মাথা ঠেকিয়ে তাকে সে সহস্রবার মা বলে ডেকেছে, সেই মাটি বেইমানি করেছে তার সঙ্গে। সে জানে, মাটি হলেন গিয়ে মা লক্খী, স্বয়ং ভগবতী। সেই মাটিই কিনা তার সঙ্গে পেতারণা করেছেন। না, সে তার জলশিয়রের কপালিপাড়ায় ফিরবে না। ওখানে তার কেউ নেই। জমিন নেই, বাতাসী নেই — কেউ নেই।

সড়কের ওপর অন্ধকারে বসেছিল বংশী। মাথার ওপর তারাগুলো জোনাকির মতো দপদপ করে জ্বলছিল। হাওয়ায় হিমেল আভাস। সড়কের দুধারে কুলি-মজুরদের ঝুপড়িতে আলো জ্বলছে। ওদিকের পশ্চিমা মজুরদের ডেরায় কোথায় ঢোলক আর খঞ্জনি বাজনাসহ তারস্বর রামায়ণ গানের হল্লোড় চলেছে। সাঁওতালদের ঝুপড়িতে ছুটছে হাঁড়িয়ার ফোয়ারা। আজ বিকেলে ঘোষবাবু এসেছিলেন। হপ্তা দিয়ে গেছেন।

অন্ধকারে ছায়ামূর্তির কে এগিয়ে আসে তার দিকে। হাতের শস্তা রেশমি চুড়ির আওয়াজে শরীরের আমন্ত্রণ।

: কে বটে?

এবার সজোরে হাতের রেশমি চুড়ির আওয়াজ। চুড়ির আওয়াজগুলো যেন তার মনে গেঁথে বসে যায় বঁড়শির কাঁটার মতো। এরকমটা আগে তার হতো না— ইদানীং হচ্ছে। কেন হচ্ছে, সে বুঝতে পারে না। এই দশ-দশটা সন তার কেটে গেছে বাতাসীকে ছাড়া। কিন্তু মনে বাতাসী হারায় নি কোনদিন। সেখানে সে নতুন ধানের জন্যে খামার নিকোয়, তরকারির ক্ষেতে জল দেয়, মাটির উনুনে জ্বাল দিয়ে ভাত রাঁধে রোজ। কিন্তু কিছুদিন হলো, বাতাসী যেন সরে যাচ্ছে পরাণের দিকে।

পরাণ, তুই শালা শেষে জিতে গেলি রে। শালা খোকন বকসি তোকে জিতিয়ে দিলেন। যা শালা, যা—আবার রেশমি চুড়ির আওয়াজ হলো খুব কাছেই। ডানদিকের আকাশে একটা শাদা সন্ধ্যামণি ফুলের মতো সাঁঝের তারাটা এতক্ষণ তার দিকে খুব তরল চোখে চেয়েছিল। এবার কে যেন ওটা আড়াল করে দাঁড়ালো।

: কে রে ?

: হামি বিন্দিয়া—

: কুথায় যাবি ?

: তোর কাছে—

: আমার কাছে ? ক্যানে ?

বুকের আঁচলটাকে মাটির ওপর ছড়িয়ে দিয়ে পাশে বসলো আঁট হয়ে।

: ক্যানে ? এই মাটিকে পুছ কর্, এই আসমানের সাঁঝের তারাকে পুছ কর্—হামি ক্যানে এসেছি, তোর কাছে।

বিন্দিয়ার রেশমি চুড়িভর্তি নিরাশ্রয় একটা হাত বংশীর কাঁধের ওপর ভাঁজ হয়ে আশ্রয় খুঁজে নিল।

: তু কেমন মরদ রে ? আদমির কাছে আওরত আসে ক্যানে— তু জানিস না ?

কাঁধের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে দেয় বংশী।

: রাতে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে ক্যানে, জোনাক জ্বলে ক্যানে অন্ধোকারে, উ কি বলার লাগে ?

বিন্দিয়া ওর দু' হাতের আঙুলে খিল এঁটে আবার বংশীর কাঁধের ওপর তুলে দেয়। এবার বংশী বিন্দিয়ার হাত দুটো জোর করে নামিয়ে দেয় না। হাতে কেমন আগের মতো জোর নেই ওর। সামনের নয়ানজুলির অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে সে, ওখানে ঝিঁঝিঁরা একটানা ডেকে যাচ্ছে, জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে। বংশীর মনে হয়, এই পিরথিবিতে বাঁচতি হলে ইকটা মেয়েমনিষ্যির পেয়োজন আছেন। শুধু মেয়েমনিষ্যির ভাবনা লিয়ে বাঁচা যায়েন নি। গরম ভাতের মতন মেয়েমনিষ্যির চনমনে ইকটা শরীল, শরীলের লিশা-ধরানো গন্ধ, উর সব না হলি জীবনটাকে বড় ফাঁকা লাগেন।

বংশী ডাকে : বিন্দিয়া—

: উঁ ?

: তোর মরদ কুথায় ?

: নেই।

: সাদি হয়েছিলেন ?

: হুঁ।

: তা'লে ?

: বলেছি ত — মরদ নেই।

: নেই ত, কুথায় ?

বিন্দিয়া আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

: তুই বেধবা ?

: বেওয়া।

: তা'লে যে তোর হাতে রেশমি চুড়ি, সিঁথায় সিঁদুর, অঙ্গে রঙিন শাড়ি—

: উ সোব্ পরতে হয়। বহুৎ সুবিধা উতে। উ তু সমঝে উঠতে পারবি না।

একটু থেমে বলে : হামি উ সোব মানে না। আদমি মর্ গিয়া ত কি হয়েছে, আওরত ত জিন্দা আছে। উকে ত জিন্দা থাকতে হবে।

বংশী ওর মুখে অপলক চেয়ে থাকে। আঁধারেও তার কাঁচ-বসানো পেতলের নাকছাবিটা জ্বল্ জ্বল্ করছে।

: তু কি ভাবছিস ?

বংশী বুঝতে পারে, বিন্দিয়া ছাইচাপা একটা আগুনের মালসা। খোঁচা মারলেই গনগনে আঙ্‌রা ঠিকরে বেরোবে। খোঁচা মারতে হলো না। আঙ্‌রা ঠিক ঠিকরে বেরুলো।

: জিন্দা থাকলে, আদমিই হোক আর আওরত হোক, উর ভুখ থাকবে, পিয়াস থাকবে। হামারও পিয়াস আছে রে।

বংশী কাঁধের ওপর থেকে ওর হাতটা নামিয়ে দিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিন্দিয়া ওর শরীলটা বংশীর শরীরের সঙ্গে লেপটে দেয়।

: এই মরদ, তুঁ হামাকে তোর আওরত করে লিবি ? হামার ভাত-কাপড় হামি জুটায়ে লিব। তোর থেকে কিছু লিব নি।

বংশী বিন্দিয়ার দিকে তাকায়। বুকের ভেতর সমুদ্দুরের সাঁড়াসাঁড়ি জোয়ারের একটা ঢেউ আড়মোড়া ভাঙে। ভাদ্দরমাসের মাটির ভাপের মতো একটা উত্তাল যৌবনের গন্ধ বিন্দিয়ার শরীল চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। রক্তে ঘোর লাগছে বংশীর। সমস্ত শরীল দাপিয়ে যেন একটা রেলগাড়ি ছুটে যাচ্ছে। তার সামনের আলোর ফিন্‌কিতে সে দেখতে পায়, একটা মেয়েমনিষ্যি তার মাথার চুল খুলে দিয়ে ওর মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। বড়ো করুণ তার চোখ দুটো, কপালে ডগডগে সিঁদুর, ঠোঁটের কোণে যেন সারা পিরথিবির কান্না। জলশিয়র— কপালিপাড়া— আঁদুলের ঘোষবাবুর বাগান— রাজগঞ্জের চটকল— ফের জলশিয়র— কপালিপাড়া— ওর লাখেরাজ জমিন— বাতাসী এবং বাতাসী।

: আমাদের কুনো কুটুম নেই। আমার কুটুম তুই, আর তোর কুটুম—

বিন্দিয়া উঠে দাঁড়ায়। আবার সেই টালমাটাল যৌবনের গন্ধ আর রেশমি চুড়ির শব্দ হাওয়ায় একটা ঘোর-লাগা অনুভবের মতো ভাসতে থাকে।

: হামি যাচ্ছে। তু শুচতে থাক্। আজ রাতে তোর ঝুপড়িতে হামি যাবে। উই সাঁঝের তারা ডুবে গেলে তারপর—

এক নিমেষে বিন্দিয়া অন্ধকারের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়। আর দেখা যায় না।

বাসের যাত্রীরা সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু বংশীর চোখে ঘুম নেই। সে যতই ভাবে, সে আর বাতাসীর কথা ভাববে না, ভাববে না তার বেইমান জমিনের কথা, ততই মনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে ওরা— বাতাসী আর তার সেই ফলন্ত ধানের জমিন। সে একবার পেছন ফিরে তাকায়। খোকন বকসি কাদার মতো ঘুমোচ্ছে। মনের গোপন তলা থেকে একটা আক্রোশ লকলক করতে করতে সাপের মতো ফুঁসে দাঁড়ায়। একটা খুনের ইচ্ছা সারা বুক তোলপাড় করে গলার কাছে দলা পাকাতে থাকে। দুখু কপালির লেঠেল রক্ত তার শরীলে আছে। খুন দেখলে খুনের নেশায় পেয়ে বসতো দুখু কপালিকে, বাপের মুখেই ও শুনেছে। দুখু কপালি ছিলেন ইকটা মরদের মতন মরদ। কিন্তুক কুনোদিন কুনো অন্যায় কাম করেন নি। আর এই খোকন বক্‌সি ওর সব্বোনাশ করেছেন। উকে খুন করাটা কি কুনো অন্যায় কাম হবেন? মনিষ্যি মনিষ্যিকে খুন করেন এক ঝটকায়। অত ভাবনা-চিন্তা করে কাউকে খুন করা যায়েন না। কুনো পরম শত্তুরকেও লয়। শালা খোকন বক্‌সি ঘুমোচ্ছে গা এলিয়ে দিয়ে। ঘুমোক। ওকে ও ছাড়বে না। ওর হাতে আজ ওর মৃত্যু আছেন।

মনের আক্রোশের সাপটা মাথা নামিয়ে বুকের হড়পির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বিন্দিয়ার নেশা-ধরানো মুখখানা একটা রাত পাখির ডাকের মতো অন্ধকারে ভাসতে থাকে। সাঁঝের তারা ডুবে গেছে। তার ওপরের তারাটাও। হাওয়ায় কুয়াশার গন্ধ। নয়ানজুলির বদ্ধ জলের গন্ধের সঙ্গে মিশে কেমন যেন মেয়েমনিষ্যির শরীলের মতো একটা গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। অন্যদিন এমন সময় বংশী ঘুমিয়ে পড়ে। অন্তত জেগে থাকতে কষ্ট হয় তার। আজ ওর চোখে ঘুম আসছে না। বিন্দিয়া কেন বলে গেল, আজ সে আসবে।

রাত বেড়ে চললো। অনেক তারা ডুবলো, অনেক তারা উঠলো। বিন্দিয়া বোধ হয় আজ আর আসবে না। আলো নিবিয়ে বসে বসে অনেকগুলো বিড়ি পুড়িয়েছে বংশী।

: এই মরদ, তু হামাকে তোর আওরত করে লিবি?

কথাটা হাঁড়ির ভাতের মতো ওর বুকের ভেতর টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু বাতাসী? না, বাতাসী আর তার কেউ লয়। উ পরাণের বে-করা বউ। আকালের সময়ে আতান্তরে পড়ে ওর সাথে ঘর করেছিল ক'টা সন। তারপর ত অনেকগুলো

সন কেটে গেছেন। বাতাসী হলেন গিয়ে এখন পরের ইস্ত্রী। বিন্দিয়াকে ও এখন ইচ্ছে করলেই বে করতি পারেন।

: তু শুচতে থাক। আজ রাতে তোর ঝুপড়িতে হামি যাবে। বংশী ভাবে। ভাবতে থাকে। বিন্দিয়াকে বে করে কামটা কি ঠিক হবেন ? অথচ ইকটা মেয়েমনিষ্যি না হলি শুধু ঝুপড়ি লয়, মনের ভেতরটাও বড়ো ফাঁকা-ফাঁকা লাগেন। ও ভাবে। ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। বিন্দিয়া আজ আর আসবে না। সে ঘোষবাবুর দেওয়া কম্বলখানা গায়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

মাঝরাতে বিন্দিয়ার ডাকে ওর ঘুম ভেঙে যায়। ও বুঝতেই পারে নি, বিন্দিয়া কখন ওর কম্বলের নিচে ঢুকে পড়েছে। বংশীর শরীলের সঙ্গে ওর শরীলটা লেপটে দিয়ে শুয়ে আছে ও, চাপা গলায় ডাকছে: এই, এই মরদ—

বংশী সাড়া দেয় : কি ?

: হামি ইলাম আর তু ফিরে শুইয়ে থাকলি ?

বংশী বলতে পারলো না, সে অনেক রাত পর্যন্ত ওর জন্যে জেগে বসে ছিল।

: এই মরদ, তু হামাকে লিবি না ? ইধারে ঘোর্—

বংশী নড়ে না।

: এই মরদ—

বিন্দিয়া জোর করে বংশীকে ওর দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে। বংশী এবার ধড়মড় করে উঠে বসে। কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে মাটির ওপর বসে থাকে।

: হামাকে পসন্দ হয় না তোর ?

বিন্দিয়াও উঠে বসে। গায়ের কম্বলটা সরিয়ে রাখে।

: এই মরদ—

: কি ?

: পসন্দ লাগে না হামাকে ?

: লাগে।

: ত, কি শুচ্ করলি ? হামাকে সাদি করবি ত ?

: করব। কিন্তুক—

: ফের কিন্তুক ? কিন্তুক কি ?

: আর ইকটু ভাঁবতি লাগবেন রে—

: শুচ্ করার আর কুছু নেহি। হামার গতর আছে, তোর ভি গতর আছে। হামার রুপিয়া আছে, তোর ভি রুপিয়া আছে, হামি আউর কুছ্ রুপিয়া ভি পাবে। বাস্। দুজনে ইখান থিকে চলে যাবে।

: চলে যাব ? কুথায় ?

: যানেকা বহুৎ জায়গা আছে। তু কুথা যাবি বোল? কলকাত্তা না টাটালগর?

বংশী নিঃশব্দে ভাবে। বিন্দিয়া ডাকে : এই—

: হুঁ, যাব। তোর সাথেই চলি যাব।

: কলকাতা না টাটালগর?

: তুই যেখানে লিয়ে যাবি—

বিন্দিয়া এবার কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

: ইয়ে কোন্ মাহিনা রে?

: অঘ্রাণ—

: তবে আজ রাতেই হামাদের সাদির লগন—

: না।

অঘ্রাণে তার জমিন আর বাতাসী দুজনেই তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। সে বিন্দিয়াকে অঘ্রাণে কিছুতেই বিয়ে করবে না। অঘ্রাণ মাস তার জীবনের বড় খারাপ মাস।

: হামাকে ত় সাদি করবি না?

: করব।

: কবে?

: আগে ইখান থিকে চলে যাই। তারপর—

বাসের বাইরে অন্ধকার অতি দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। একঘেয়ে বাসের ছোটার শব্দ। বাসের ভেতরে সবাই ঘুমোচ্ছে। বংশীর চোখে ঘুম নেই। আজ দশ সন বাদে সে জলশিয়রে ফিরছে? কপালিপাড়ার কোন খবর সে জানে না। এই দশ সন সে তার লাখেরাজ জমিনের কোন খবর রাখে নি। তার অমন সাধের জমিন খোকন বক্সি কব্জা করে নিয়েছে কিনা কে জানে? তখনই যেভাবে ব্যাটা ধানখড়ের আধাআধি ভাগ নিয়ে দখল নিতে উঠে পড়ে লেগেছিল, এতদিন কি ও আর তা করে নি? সে নিজে না হলে কে এই রাক্ষসটার হাত থেকে তার জমিন বাঁচাবে? মধুয়া নেই, বিশুখুড়ো মরেছে, থাকার মধ্যে জটা আর ঘনু খুড়ো। ওরাই যা একমাত্র ভরসা। রাগে অভিমানে ওর গাঁ ছেড়ে চলে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয় নি। রাগ? অভিমান? গরিবের আবার রাগ, অভিমান? কার ওপর রাগ-অভিমান? বাতাসীর ওপর? বাতাসী ওর কে যে, ওর ওপর রাগ-অভিমান করবে সে? বাতাসী ওর কেউ লয়। পরস্ত্রী। ওর ওপর ওর কোন অধিকার নেই। ওর নিজের জমিনের ওপর ওর অধিকার নেই, বাতাসী তো কোন্ পর। পর মুহূর্তেই তার মনে হয়, বাতাসী কোথাও যায় নি। ঘর আগলে বসে আছে এই দশ সন। কোথাও গিয়ে থাকল নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে।

পরক্ষণেই বিন্দিয়ার কথা ওর মনে পড়ে যায়। ওর জন্যে আজ বারে বারেই ওর মনটা মোচড় দিচ্ছে। কেন এমন হয়? একসঙ্গে দু'জন মেয়েমনিষ্যির কথা

মনে পড়ে কেন? বাতাসী জমিনের সঙ্গে ওর লড়াইয়ের শরিক। ওর জন্যে ভাত রাঁধে, তালবাঁধ থেকে জল আনে, খামারের জন্যে উঠোন নিকোয়। আর বিন্দিয়া? বংশী ওর কিছুই জানে না। কোথায় থাকে, কি করে— সে জানতে পারে নি। ওর শরীলভরা যৌবন, রঙদার সাজগোজ তক্ষকের ডাকের মতো কেমন যেন নেশা ধরায়। ও ভালোই ছিল, কোন ঝামেলাই ছিল না ওর। হঠাৎ কোথ্থেকে এ সনে এসে হাজির হলো বিন্দিয়া, সব গোলমাল হয়ে গেল। মজুর লাইনে অনেক মরদ আছে। খাটিয়ে, বেহিসেবি। সবাইকে ছেড়ে সে ওর সাথেই ঘর বাঁধতে চায়—কলকাতায়, নয় টাটালগরে। ক্যানে? সে কি কোনদিন বিন্দিয়াকে মনেপ্রাণে চেয়েছে? রাগ করে বাতাসীর ওপর বদলা নিতে? অতশত ভাবতে পারে না বংশী।

ঘরই বাঁধবে সে বিন্দিয়ার সাথে। কলকাতায়, নয় টাটালগরে। বিন্দিয়া ওকে যেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন রাতের ঘটনাটা সব হিসেব কেমন এলোমেলো করে দিল। মাঝরাতে অন্ধকারে কেমন একটা আওয়াজ এলো কানে। লোহার বাক্সের আওয়াজ। পাশের আপিসের তাঁবুর ভেতর থেকেই মনে হলো। তাঁবুতে হরিদা একাই থাকে। সঙ্গে টাকাপয়সাও থাকে। মজুরদের হপ্তার টাকা। ওর ওপর ঘোষবাবুর ভরসা খুব। ও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে পারলো না। বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে হ্যারিকেন জ্বাললো। ঝুপড়ির কোণ থেকে লাঠিটা টেনে নিয়ে হ্যারিকেন-হাতে বেরিয়ে গেল। হরিদার তাঁবুর সামনে পর্দা ফেলা। ভিতরে কারা কথা বলছে। হরিদার গলা। বংশী ডাকে: হরিদা—

সব চুপ। ভেতরে যেন জনমনিষ্যি নেই। বংশী দেরি না করে পর্দা সরিয়ে ভেতরে একপা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বুঝতে পারলো, ভেতরে ঢুকে সে ভুল করে ফেলেছে। বেরিয়ে আসতেও পারছে না। কেমন নেশাগ্রস্তের মতো হরিদার গলা শোনা গেল: কে? বংশী?

: কিসের আওয়াজ হলেন? আপনি তুই শুনেছিস, হরিদা?

: ও কিছু নয় রে। তুই তোর ঝুপড়িতে যা—

মাথা নামিয়ে ঝুপড়িতে ফিরে এসেছিল বংশী। মাথাটা টলছিল। ঘাম দিচ্ছিল কপালে। ঝুপড়ির কোণে লাঠিটা রেখে দিয়ে বাকি রাত খালিগায়ে বিছানার ওপর বসে কাটিয়ে দিল সে। পুবের আকাশ ফরসা হয়ে ভোর হলো, পাখি ডাকলো, মজুর লাইনে ঘুম ভাঙলো সবার। সে বুঝে উঠতে পারলো না, অত রাত্তিরে বিন্দিয়া খালিগায়ে হরিদার পায়ের কাছে কেন বসেছিল? কি করছিল সে?

ক'দিন বিন্দিয়া বংশীর সামনে আসে নি। অন্তত বংশী ওকে দেখতে পায় নি। দেখতে না পেয়ে ভালোই হয়েছে। দেখা হয়ে গেলে বিন্দিয়া কি করতো সে জানে না, তবে সে জানে, সে বিন্দিয়ার সঙ্গে কথাই বলতে পারতো না। সেদিন রাতের ঘটনায় ওর মনটা এক ঝটকায় অনেক দূরে ছিটকে সরে গেছে।

এখানে ওর আর কোন কাজে মন বসছে না। আর সে থাকতেও চাইছে না এখানে। দশ-দশটা সন সে গাঁ-ছাড়া। জলশিয়র এখন মনটাকে তার বড় টানছে। ফিরে গিয়ে সে কি দেখবে জলশিয়রে, জানে না। তবু যাবার জন্যে মনটা বড় আনচান করছে। যা-ই দেখুক ওখানে, ওখানেই সে যাবে। ওখানেই যে ওর সব পড়ে আছে। অন্য কোথাও সে যাবে না। না কলকাতায়, না টাটালগরে। সে জলশিয়রেই যাবে।

ঘোষবাবুকে সে বলেছে— সে চলে যাবে। আর আসবে কিনা, ঠিক নেই। আসতেও পারে, না-ও আসতে পারে। ঘোষবাবু কিছুদিন ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন, একেবারে ছেড়ে দিতে রাজি নন। হরিদার মতো বংশীও তাঁর বড়ো আপন মানুষ।

সড়কের ওপর দুটো স্টীম রোলার প্রবল গর্জনে দিনরাত চলছে। অনেক দিন ধরেই চলছে। খুব শিগ্‌গির পিচ পড়বে। তার কাজও ঘোষবাবু পেয়েছেন। ঘোষবাবুর ঠিকাদারির এখন রমরমা। হরিদা আজ ঘোষবাবুর মোটর সাইকেলের পেছনে বসে গিয়েছেন আঁদুলে। বোধ হয়, টাকা আনতে। কাল হপ্তা দিতে হবে মজুরদের, মজুরদের ঠিকাদারদের। রাতেও ফিরলেন না হরিদা। অগত্যা আপিসের ক্যাম্পের সামনেই শুতে হলো বংশীকে। সবে শীত গেছে। কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড রকমের গরম পড়ে গেছে। ফাল্গুনের শুরুতে গরম পড়ে যায়। কিন্তু এত গরম কখনো পড়ে না।

বংশীর ঘুম আসছিল না। সে ভাবছিল, যদি আজ এই রাত্তিরে বিন্দিয়া এসে পড়ে, সে কি বলবে ওকে? সে ওর সঙ্গে কলকাতা কি টাটালগর, কোথাও যাবে না— একথা সে বিন্দিয়ার মুখের ওপর বলতে পারবে না। কথাটা বিন্দিয়া যদি না বলে বা তার সামনে একেবারে না আসে, তাহলে খুবই ভালো হয়। কপাল ভালো, সে রাতে বিন্দিয়া আসে নি।

পরের দিন দুপুরে রোদ মাথায় নিয়ে ঘোষবাবু হরিদাকে মোটর সাইকেলের পেছনে নিয়ে ছেড়ে গেলেন ক্যাম্পের আপিসে। বিকেলে তিনি এসে হপ্তা দেবেন মজুরদের। বংশী আপিস ছেড়ে কোথাও যেতে পারছিল না। ওকে গাঁয়ের মুদির দোকানে যেতে হবে চাল আর দু' একটা টুকিটাকি জিনিস কিনবার জন্যে। টুকিটাকিগুলো না হলেও যা হোক চলে যাবে। কিন্তু চাল না হলে চলবে কি করে? যেতেই হলো মুদির দোকানে। ফিরবার পথে দেখা হয়ে গেল বিন্দিয়ার সঙ্গে। সে ভেবেছিল, বিন্দিয়া লজ্জায় কথাই বলতে পারবে না ওর সাথে। কিন্তু সে দেখলো, বিন্দিয়া তেমনিই আছে। একটুও বদলায় নি। কপালে সিঁদুরের টিপ, চোখে কাজল, ঠোঁটে পানের কস। রাস্তার ধারের একটা ডুমুর গাছের ছায়ায় সে কোথা থেকে এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

: এই মরদ, আজ রাতে তৈয়ারি থাকিস। আজ রাতের অন্ধকারেই ভেগে পড়বো, সমঝেছিস?

কিছু সম্‌ঝে ওঠার আগেই বিন্দিয়া তার শরীলের যৌবন ভার নিয়ে গাঁয়ের গাছগাছালির ছায়ার আড়ালে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

বিকেলের দিকে আকাশ কালো করে ঝড় উঠলো। অকালের কালবোশেখী। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। অনেকক্ষণ ধরে চললো। সেদিন ঘোষবাবু আসতে পারলেন না। সেদিন হপ্তা দেওয়া হলো না, ঝড়বৃষ্টির জন্যে অবিশ্যি পাওনাদার ঠিকাদারেরা সবাই আসতে পারে নি। দু'একজন যারা এসেছিল, সবাই ফিরে গেল। হরিদা জানিয়ে দিল, কাল ঘোষবাবু আসবেন, এলেই হপ্তা দিয়ে দেওয়া হবে। চিন্তার কোন কারণ নেই। টাকা এসে গেছে। সকালেই হয়তো দিয়ে দেওয়া হবে।

যা গরম পড়েছিল, বৃষ্টি হয়ে একটু স্বস্তি হলো। একটু ঠাণ্ডা পড়লো। মনে হলো, ঠাণ্ডাটা যেতে যেতে ফিরে এলো যেন। কোথাও শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, মনে হয়। সন্ধ্যের পরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ঝাঁক বেঁধে তারা উঠেছে আকাশে। কুলিদের ঝুপড়িগুলোতে নাচগানের ফোয়ারা ছুটছে। একদিকে মাদল, অন্যদিকে ঢোল , জগঝম্প আর নারী-পুরুষের সমবেত গলার গান।

ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। রাস্তার ধারের খোদলগুলোয় জল জমে গেছে। ওখানে ব্যাঙ ডাকছে। রাস্তার ওপর স্টীম ইঞ্জিন দুটো ঠায় দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্ছে। কাল রোদ উঠলে, মাটি শুকোলে আবার প্রবল দাপটের সঙ্গে ওরা কাজ শুরু করবে।

বংশী মাটির হাঁড়িতে ভাত ফোটালো। ডাল আর আলুবেগুনের তরকারি রাঁধলো। তারপর ঝুপড়িতে তালা দিয়ে কুলি লাইনে গিয়ে একটু তাড়ি খেয়ে এলো। একটু মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। মনটা বেশ খুশি-খুশি। আপিসের তাঁবুতে আলো জ্বলছে। বোধ হয় হরিদা টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেশ কিছু করছেন। রাতে উনি রান্নাবান্না কিছু করেন না। গরম দুধ আর খৈ-টৈ কিছু খেয়ে শুয়ে পড়েন। সেদিনের পর থেকে হরিদা বংশীকে একটু এড়িয়ে চলেন। ওর সামনে উনি কেমন যেন একটু আড়ষ্ট থাকেন। বংশীও ওঁর সামনে আগের মতো আর তেমন সহজ হতে পারে না।

আলো নিবিয়ে ঝুপড়ির বাইরে বসেছিল বংশী। ভাবছিল, আজ রাতে বিন্দিয়া যদি আসে, মনে হয় ও আসবেই, তাহলে ও কি করবে? চলে যাবে ওর সঙ্গে কলকাতায় কিংবা টাটালগরে? না কি ফিরিয়ে দেবে বিন্দিয়াকে, ও যেতে পারবে না, ঘোষবাবুর সঙ্গে বেইমানি করে ওর পক্ষে বিন্দিয়ার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। মনের ওপর বংশী আর তেমন জোর খুঁজে পাচ্ছে না। ও যেতে না চাইলেও বিন্দিয়া কি ওকে ছাড়বে? বাতাসীর কথা, জমিনের কথা মনের ভেতর আঁকড়ে ধরে আর কতদিন সে এভাবে বাঁচবে? দশ-দশটা সন তো কোথা দিয়ে কেটে গেল। দুনিয়ার সবাই যখন ওর সাথে বেইমানি করতে পারে, ও-ইবা কেন করবে না? কতদিন আর ভালো থাকবে ও। ঘোষবাবুরও কাজকর্ম শেষ

হয়ে আসছে। এরপর ও কি করবে? কোথায় যাবে? সেই জলশিয়রে? তাছাড়া, ও আর কোথায় যাবে? কিন্তু ওখানে যে তার আর জমিন নেই, বাতাসীও নেই। আছে খোকন বক্‌সি আর সমুদ্দুরের মতো তার সীমাহীন বাঁধভাঙা লোভ।

: সোব্ শালা শত্তুর, সোব্ শালা বদ্‌মাস—

আপিসের বাতি নিবিয়ে হরিদা বোধ হয় শুয়ে পড়লো।

ঠাণ্ডায় শালা বুড়োর ঘুম পেয়েছে। মাল-টাল খেয়েছে কি না, কে জানে। বুড়ো শালা লুকিয়ে লুকিয়ে সবই করে, হয়তো সবই খায়। বাইরে ভিজে বেড়াল। কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই।

বংশী ঝুপড়িতে ঢুকে হ্যারিকেন জ্বাললো, ভাত, ডাল-তরকারি, যা রেঁধেছিল খেল। বেশ মউজ করে একটা বিড়ি ধরালো। স্থির করলো, আজ রাতে বিন্দিয়া যদি আসে, সে ওর সঙ্গে চলেই যাবে। কলকাতা, নয় টাটালগরে। অনেক সয়েছে ও, এবার একটা অন্তত কিছু ওর করা দরকার। বিড়ির টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আলো নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

খোদল আর নয়ানজুলির ধারে ব্যাঙেরা একনাগাড়ে ডেকে চলেছে নতুন বৃষ্টির জলের জৈবিক অলঙ্ঘ্যতায়। ঝিঁঝি ডাকছে, আরো নানা জাতের পোকামাকড়। এতদিন এরা কোথায় ছিল? মাটির কোন গোপন ডেরায়? বংশীর চোখে ঘুম আসছে না। ব্যাঙ ঝিঁঝি আর পোকামাকড়ের ডাকে কানে তালা ধরছে, নাকি বিন্দিয়া আজ রাতে আসবে বলেছে বলে ঘুম আসছে না তার? এবার আর নড়চড় হবে না। সে ভেবে এবার ঠিকই করে ফেলেছে, আজ বাতে বিন্দিয়া যদি আসে, সে ওর সঙ্গে চলেই যাবে। যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই চলে যাবে। সেখানে দুজনে ঘর বাঁধবে। আর জলশিয়র গাঁয়ে সে ফিরবে না। জলশিয়র গাঁয়ের তালবাঁধ, বুড়োবটতলা, সাতপুরুষের গতরে-ফলে ওঠা সির্কাগু লাখেরাজ জমিন, বাস্তুভিটা, তোরা সোব্বাই শোন্ , দুখু কপালির বোংশের শেষ সন্তান বংশী কপালি আজ চলি যাচ্ছেন বেওয়া এক মেয়েমনিষ্যির সাথে কুথায়, কেউ জানেন না। তোরা ভালো থাকিস, আমার কথা ভুলি যা। আমাকে মনে রাখিস নি। আসমান আমার বাপ, মাটি আমার মা। কিন্তুক আমি আর উদের কেউ লয়।

বংশীর চওড়া বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল। সত্যি, কপালিপাড়ার সে আর কেউ নয়। সে মুখে বা মনে মনে যা-ই বলুক। সত্যি কথা বলতে কি, এই দশ সনে কপালিপাড়া ওর মনে ফিকে হযে গিয়েছিল। এবার থেকে একেবারে মুছে যাবে। সে আর ভাববে না কপালিপাড়ার কথা।

বংশী উঠে বসলো। ঘোষবাবুর দেওয়া কম্বলটা পাট করে একপাশে তুলে রাখলো। নিজের পয়সায় কেনা জিনিসপত্রগুলো নিয়ে গাঁট্‌রি বাঁধলো। গাঁটরিটা খুব একটা ছোট হলো না। সব শেষে ঝুপড়ির কোণের মাটিগুলো হাত দিয়ে

সে সরাতে লাগলে ওখানে ও একটা মাটির ভাঁড়ে পুঁতে রেখেছে ওর দশ সনের রোজগারের টাকা।

ঝুপড়ির বাইরে, কার পায়ের শব্দ হলো। বংশী সরে আসে। এমন সময় ঝড়ের বেগে ঝুপড়িতে ঢোকে বিন্দিয়া। দু' হাতে কালোমতো একটা বাক্স। একপাশে ওটা নামিয়ে রেখে বিন্দিয়া হাঁপাতে থাকে।

: এই মরদ, তু তৈয়ার আছিস ত? হামি হামার রুপিয়াগুলো লিয়ে আসি। দের হবে না। তু তৈয়ার থাকিস।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় বিন্দিয়া। টাকা আনতে কোথায় গেল সে, কে জানে। কখন আসবে, কত দেরি হবে— বংশী জানে না। বেশি দেরি হবে না, বলে গেলেও, বংশী জানে, একটু সময় লাগবে ওর। কিন্তু বিন্দিয়া ওর বাক্স রেখে গেল এখানে, অথচ ওর টাকা ওতে নেই, রয়েছে অন্যখানে— কেমন যেন খটকা লাগে বংশীর মনে। তবে কি বাক্সটা ওর নয়, অন্য কারো? বংশী দেশলাইর কাঠি জ্বেলে তার আলোতে বাক্সটা দেখে চমকে ওঠে। এ যে আপিসের তাঁবুর টাকার বাক্স। এতে যে মজুরদের হপ্তার টাকা আছে। কাল সকালে ঘোষবাবু মজুরদের হপ্তা দেবেন— আজ বৃষ্টির জন্যে দিতে পারেন নি। শেষে বিন্দিয়া, আপিসের টাকার বাক্স চুরি করেছে! ওর মনটা ফুঁসতে লাগলো। গরমের পর ঠাণ্ডায় বুড়ো হরিদা বোধ হয় খুব জোর ঘুমিয়ে পড়েছে; আর সেই সুযোগে বিন্দিয়া টাকাভর্তি বাক্সটা সরিয়ে ফেলেছে ওর ঝুপড়িতে।

বিন্দিয়ার ফিরতে যত দেরি হবে, বংশী ভেবেছিল, তত দেরি হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে আসে। হাতে কাপড়ের একটা পুঁটলি। ব্যস্তসমস্তভাবে বলে: চোল্, ইখান থেকে পালাই।

বংশী নড়ে না। ঘাড় শক্ত করে বসে থাকে।

: এই মরদ, কিরে? চোল্—

: আমি যাব নি। যাব নি তোর সাথে। তুই চোর। তুই চুরি করেছিস আপিসের টাকার বাক্স।

: ত, কি হয়েছে? আপিসকা রুপিয়া বাক্স ত তোর বাক্স নেহি। ও হামি চুরি করেছে ত কি হয়েছে?

: এ বাক্স আলবাৎ আমার টাকার বাক্স। আমি দারোয়ান। এ বাক্স আমি চুরি হতি দিব নি। হুঁ—

: এ ত তু আউর হামি দোনোই চোরি করছে। কুছ কসুর নেহি—

: এ আমি চুরি করতি লারব, চুরি হতি দিতিও লারব।

তুই যা। আমি যাব নি তোর সাথে।

অন্ধকারে দু'জোড়া চোখ জ্বলছে রাগে, বিস্ময়ে, ঘৃণায়। বাইরে খোদল আর ময়ানজুলির ধার থেকে তুমুল জৈবিক উচ্চারণ, আর ঝুপড়ির মধ্যে বিন্দিয়াকে

তার সঘৃণ প্রত্যাখ্যান। রাত গড়িয়ে চলে একঘেয়ে ব্যাঙ আর ঝিঁঝির ডাকে।

: তু নেহি যায়ে গা?

: না।

: ত, বাক্স হামি লিয়ে যাবে।

: না। বাক্স তোকে আমি লিতে দিব নি। উ আমার বাক্স। আমার হেপাজত—

বিন্দিয়া আর কোন কথা বলার সাহস পায় না। সে ধীরে ধীরে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

সকাল হলো। বংশী ভেবেছিল, হরিদা তাকে ডাকবে। টাকার বাক্স চুরি হয়ে যাবার কথা বলবে। কিন্তু না, হরিদা তাকে কিছু বললো না। একটু পরেই টাকার জন্যে ঠিকাদাররা আসতে লাগলো। ঘোষবাবু আসেন নি। সবাই মন খারাপ করে ফিরে গেল।

রাস্তার কাদা শুকোলে ঘোষবাবু এলেন একেবারে বেলার দিকে। টাকার বাক্স উধাও হয়ে যাবার খবর শুনে অমন শান্ত ঘোষবাবু চিৎকার করে উঠলেন: এ তোমারই কাজ, হরিদা। আমি তোমাকে পুলিশে দেবো। কোন কথা শুনবো না। আপিসের তাঁবু থেকে ক্যাশ বাক্স হাপিস হয়ে গেল, তুমি বলছো, শুয়েছিলে ঘরে, কিছু জানো না। এ কথা আমি বিশ্বাস করবো? বলো, তাঁবুতে কে এসেছিল?

হরিদাকে এত বিপন্ন কোনদিনও মনে হয়নি বংশীর। কেমন কেমন অপরাধী-অপরাধী গলায় হরিদা বলে: কেউ তো আসে নি তাঁবুতে। আমি তো সারারাত প্রায় জেগেই ছিলাম।

: তবে কি ক্যাশ বাক্সের ডানা গজালো? না, এক ডজন ··? ঠিক করে বলো, তুমি কোথায় ছিলে? তাঁবুতে, না অন্য কোথাও?

: তাঁবুতেই তো ছিলাম।

: বংশী কোথায় ছিল? বংশী, তুই কোথায় ছিলি কাল সারা রাত?

: আজ্ঞা, ঝুপড়িতেই—

: অন্য কোথাও যাস নি?

: না, আজ্ঞা—

ঘোষবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হরিদা খুব ভেঙে পড়েছে। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো টেবিলের পাশে।

: অতগুলো টাকা! হরিদা! কাউকে সন্দেহ হয় তোমার?

: কাকেই বা সন্দেহ করি? কাউকে তো দেখি নি। কেউ আসেও নি —

: হুঁ—

ঘোষবাবু চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

: চুরি হলো না, ডাকাতি হলো না, অথচ টাকার বাক্স উধাও! আমি তোমার কোন কথাই শুনবো না, হরিদা। ও টাকা তোমাকেই দিতে হবে।

: আমি কোথা থেকে অত টাকা দেবো ? তার চেয়ে তুমি আমাকে মেরে ফ্যালো, জেলে দাও—

ঘোষবাবু রোদ-চশমা খুলে টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। ওটা পরে মোটর বাইকে উঠে চলে যাবার জন্যে স্টার্ট দিলেন।

বংশী কাছে এসে বলে : আজ্ঞা। আপনি, তুই ইকটু দাঁড়া, বাবু—

: কেন ?

: কথা আছেন—

বংশী ওর ঝুপড়ির ভেতর থেকে টাকার বাক্সটা এনে ঘোষবাবুর সামনে ধরে।

: আমিই ইটা চুরি করেছিলুম, আজ্ঞা।

ঘোষবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

: তুই ? তুই চুরি করেছিলি ক্যাশবাক্স ? অসম্ভব ? এ হতেই পারে না।

ক্যাশবাক্স টেবিলের ওপর রেখে বংশী দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

: ক্যানে ? আমি কি চুরি করতি লারি ? টাকার লোভ ত সবারই থাকেন, আজ্ঞা ?

: হরিদা, বংশী কী বলছে ?

: না। বংশী এ কাজ করতেই পারে না।

ঘোষবাবু বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে টেবিলে এসে বসেন।

: বংশী, তোকে আজ বলতেই হবে, কে করেছে এ কাজ।

: উ আমি বলতি লারব, আজ্ঞা। আপনি তুই আমাকে ইবার ছুটি করে দে, বাবু। আমি দেশে চলি যাব—

বিন্দিয়ার সঙ্গে বংশীর আর মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। আজই—আজ সন্ধ্যেয়, তখন দিনের আলো নিবে গিয়েছিল। আবছা অন্ধকারে সে সড়ক ধরে স্টেশনের দিকে আসছিল। সড়কের ধারে একটা পুরনো অশ্বত্থগাছের নিচে একটা বোঁচকা মাথায় দাঁড়িয়েছিল একলা বিন্দিয়া। সে কি করে যেন জানতে পেরেছে, বংশী চলে যাচ্ছে আজ।

বংশী কাম ছেড়ে দিয়ে ঘোষবাবুর কাছ থেকে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে। ওর মতন আদমি হয় না। বহুৎ সাচ্চা আদমি।

বংশী অশ্বত্থগাছটার কাছে আসতেই তার থমকে-থাকা ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বিন্দিয়া।

: এই মরদ, চলে যাচ্ছিস ?

বংশী ফিরেও তাকালো না। কাঁচা মাটির ওপর তার ভারি-ভারি পা ফেলে সে চলে আসে। স্টেশনে পৌঁছতে এখনো অনেকটা রাস্তা।

: এই মরদ; হামাকে তু নিয়ে যাবি না ? এই মরদ—

বিন্দিয়ার কথাটা এখনো কানে বাজছে। বংশী বিন্দিয়াকে একটু দেরিতে হলেও চিনে ফেলেছে। ওকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না। বিন্দিয়া বাতাসী নয়। এখন ওর মনে শুধু বাতাসী। বাতাসীকেই ওর মন আবার ফিরে পাবার জন্যে খুঁজছে। সে বুঝতে পারে, এই দশ সনেও ওর মনে বাতাসী একটুও ফিকে হয়নি। ওর মনে হয়, বাতাসী জলশিয়রে ফিরে এসেছে। ওখানে সে আজও উঠোন নিকোচ্ছে, ঘরের ভেতরে মেঝের মাটির উনুনে ওর জন্যে এখনো ভাত রাঁধছে, পুকুরের ঘাটে সানকি-ঘটি ধুচ্ছে, নয়তো তরকারির ক্ষেতে জল দিচ্ছে, কিংবা জল আনছে তালবাঁধ থেকে আঁচল কোমরে জড়িয়ে।

চন্নপুর। নামটা শোনামাত্র বুকের রক্ত ধক করে ওঠে। এখানে যে ওকে নামতে হবে, মনে ছিল না। হঠাৎ মনে হতেই কাপড়ের গাঁট্‌রিটা তুলে নিয়ে সামনের এবং দুপাশের লোকজনদের মাথায় ঘাড়ে কাঁধে ধাক্কা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নামতে যায়। কারো পা মাড়িয়ে দিয়ে যায় সে, কারো পাঁজরে লাগায় কনুইর গুঁতো, কারো কানে ঘষা লাগে ওর মাথার বোঁচকার।

কিন্তু বাস থেকে নেমেই মনে হলো, এ চন্নপুর যেন দশ সন আগে ফেলে-যাওয়া সেই চন্নপুর নয়। এ যেন অন্য কোন একটা অচেনা জায়গা। দশ সন আগের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। দোকান-পাটগুলো আর আগের মতো নেই। কোন-কোনটা পাকা হয়েছে, কোনটা হয়েছে টালির। হাটের দিকে সব পাকা। রাস্তার ও দিকের দোকানের সারিগুলোও সব টালির। জায়গাটাকে আর চেনা যায় না।

অবাক হয়ে বংশী চেয়ে-চেয়ে দেখতে থাকে। সকালের কেমন একটা ঠাণ্ডা অপরিচয় ওর চারদিক ঘিরে ঢেউ ভাঙছে।

সব শেষে বাস থেকে, ধীরে-সুস্থে নামলো খোকন বক্‌সি। ফরসা থলথলে চেহারা, শরীলের কোথাও যেন হাড় নেই, শুধু মাংস আর মাংস। কণ্ডাক্টার নিচে ঘাড় উঁচিয়ে খোকন বক্‌সির নামার তদারকি করছে। পারলে যেন বৃহৎ মাংস পিণ্ডটাকে কোলে করে সে নামিয়ে দেয়। বাসের দরজার পাল্লা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক শিখ পাঞ্জাবী তাকে দেখছে—বংশীকে। দেখতে দেখতে পাশের চায়ের দোকান আর এখান-ওখান থেকে অনেকগুলো লোক এসে খোকন বক্‌সিকে ঘিরে ধরলো। মাথা নুইয়ে নমস্কার জানায় কেউ-কেউ মামলার হারজিতের কথা জিজ্ঞেস করে। তার মানে, খোকন বক্‌সি কলকাতায় গিয়েছিল মামলার দরকারে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে খোকন বক্‌সির গাড়ি। সে গাড়ির দিকে এগোয়। পাশাপাশি চলে পাঞ্জাবী দারোয়ানটা। সাকরেদরা পেছনে-পেছনে যায়। বাবুকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে আসে। পাঞ্জাবী দারোয়ানটা খোকন বক্‌সির গাড়িতে উঠে চলে গেল। বাস স্টার্ট দিয়ে চলে যায় গড় বাসলীর দিকে।

খোকন বক্‌সি তাহলে পাঁচজনের খাতিরে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। পাঞ্জাবী দারোয়ান থেকে সাদরেদবাবু পর্যন্ত কেউ বাদ নেই। টাকায় কী না হয়!

ও পাশের টালির চায়ের দোকানটা ফাঁকা। খদ্দের জমে নি। বোঁচকাটা ঘাড়ে নিয়ে বংশী সেই চায়ের দোকানেই ঢোকে। সামনে উনুনে চায়ের জল ফুটছে। বোঁচকা নামিয়ে বলে : চা দে দি'নি ইকটা।

দোকানদার গেলাস ধুতে ধুতে জিজ্ঞেস করে : কলকাতা থেকে?

: হঁ।

বংশী ভালো করে চেয়ে দেখে লোকটাকে। দশ সনের বিস্মরণের আগাছা সরিয়ে সে ওর তখনকার মুখটা মনে করবার চেষ্টা করে। হঁ, ঠিক ধরেছে সে। দনু পালের ছেলে। চন্ননপুরের হাটে ছিল দনুপালের বিখ্যাত তামাকের দোকান।

: তোর হাটে তামাকের দোকান ছিল নি?

: তামাকের দোকান তুলে দিয়ে এখন এই চায়ের দোকান করেছি।

: ভাল করিস্‌নি।

: কেন?

: বাপদাদার কালের ব্যবসা, নামডাকও ছিলেন খুব। তুলে দিয়ে ভাল করিস নি। আমরা কত তামাক খেয়েছি তোদের দোকানে।

: এখন আর সেই বিক্রি-পাটা নেই। লোকে বিড়ি-সিগ্রেট ধরেছে, আর তামাক খেতে চায় না।

চা বানিয়ে লোকটা বংশীর হাতে দিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে : কোথায় ঘর?

: জলশিয়র—

বংশী ভেবেছিল, লোকটা এবার জমিনের কথা, জমিনের ফসলের কথা বলবে, বাবুদের মিটিনের কথা বলবে। লোকটা ওসব কিছুই বললো না।

বংশী চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করে : তা'পর ইদ্দিকের খবর কি?

: কোন্‌ দিকের?

: উই-যে লাঙল যার জমিন তার।

: কথাটা কি করে যে হাওয়ায় ভেসে এসেছিল, কে জানে। লাঙল যার, জমিন তার কথাটা শুধু চাষীদেরই নয়, সবাইকে এমন পেয়ে বসলো, ধানকাটা নিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে অনেক দাঙ্গা হয়ে গেল।

বংশীর শরীলের সমস্ত রক্ত কেমন এক নেশায় ক্ষেপে ওঠে, বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা মোচড় খেয়ে ফুঁসতে থাকে। কৌতূহলের বশে জিজ্ঞেস করে : ধান কাটা নিয়ে দাঙ্গা হয়েছিলেন? বল্‌ছিস কিরে?

: অনেক দাঙ্গা হয়েছে। কেন? তুই জলশিয়রের লোক হয়েও জানিস না? এখনো যে হচ্ছে রে—

: জলশিয়রে হয়েছেন?

: হয়েছে। এই হাটেও দাঙ্গা হয়ে গেছে।

: উ আমি দেখেছি। উদিন মিটিনে আমি ছিলুম। উদিনের দাঙ্গায় আমাদের কপালিপাড়ার গাঁ-বুড়ো বিশুখুড়ো মরে গেলেন।

: এখন খোকন বক্‌সির নামে শ'খানেক মামলা ঝুলছে। আর মামলা করে হবে কি? ব্যাটাকে তিন ভাগ মেনে নিতে হয়েছে।

: তিন ভাগ মেনে লিয়েছে খোকন বক্‌সি?

উত্তেজনার আতিশয্যে বংশী চা খেতে ভুলে গেছে। গেলাসের চা জুড়িয়ে জল।

: চা-টা একদম জল হয়ে গেছেন। আর ইকটা চা দে, ভাই—

চা বানাতে বানাতে লোকটা বলে: জরিপ এসেছিল। চাষীরা সব বর্গা লিখিয়ে নিয়েছে। খোকন বক্‌সি ইচ্ছে করলেই আর চাষীকে তুলতে পারবে না। ভাগের ধানও আর কেউ দিচ্ছে না।

চায়ের গেলাস বংশীর হাতে দিয়ে দনুপালের ছেলে বলে: দু'দিন সবুর করো না, দ্যাখো কী হয়!

: কি হবেন?

: সরকার চাষীদের পাকা পাট্টা দিয়ে দেবে।

: বলছিস কি তুই? সত্যি?

: আরো আছে। শোন্— যে সব চাষীর জমিন নেই, খোকন বক্‌সির বাড়তি জমিন সরকার তাদের বিলি বিতরণ করে দেবে।

গরম চা গলা দিয়ে নামছিল না বংশীর। কোন রকমে ঢোঁক গিলে বলে: আর লাখেরাজ জমিন?

: লাখেরাজ জমিন আছে নাকি তোর?

: ছিলেন—

: ও আমি বলতে পারবো না।

বংশীর মনটা একেবারে, বর্ষাকালের বাতাসের মতো মিইয়ে যায়। যেন মালসার গনগনে আগুনে এক কলসী জল ঢেলে দিল কেউ।

বোঁচকা ঘাড়ে তুলে নিয়ে চলে যাবার জন্যে সে পা বাড়ায়।

: ভাই, পয়সাটা দিয়ে যা—

চায়ের দাম দিতে ভুলে গিয়েছিল বংশী। কোমরের গেঁজে থেকে পয়সা বের করে লোকটার হাতে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে: লাখেরাজ জমিনের কি হবেন, তুই সত্যি কিছু জানিস না?

: না, ভাই।

•

বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে ভারি-ভারি পা ফেলে বংশী জলশিয়রের রাস্তায় বাঁক নেয়।

এই তো সেই পুকুরটা, এর পাড়ে সে-বছর চন্ননপুরের পূজা দেখতে এসে বাতাসী পিরাণ কিনে এনে ওকে পরিয়েছিল। ও-কথা কি বাতাসীর এখন মনে আছে? সেই প্রথম সে পিরাণ পরেছিল। সেই শেষ। তারপর সে আর পিরাণ পরে নি। কারা গাছ পুঁতেছে পুকুরটার পাড়ে, সবুজে সবুজ হয়ে আছে। দশ সন বাদে জলশিয়রের রাস্তাটা বংশীর পায়ের শব্দে আজ এই প্রথম চমকে উঠলো। বংশী জোরে জোরে পা চালায়। ওর মনে হয়, ঘরের দাওয়ায় তার পথ চেয়ে বসে আছে বিজলির ঝিলিক-মারা একজোড়া করুণ গাঢ় কালো চোখ। চোখ দুটো এত কালো যে, কোনদিন তাতে কাজল পরতে হয় না। এখান থেকে খানিকটা পথ ছায়া-ঢাকা। তারপর ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে সটান সোজা পথ।

দনুপালের ছেলের মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে এখন বংশীর মনে হচ্ছে, রাগের মাথায় ওর গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হয় নি। এখানে ধানকাটার সময় খোকন বক্সির লোকজনদের সঙ্গে নাকি চাষীদের অনেকবার দাঙ্গা হয়ে গেছে, এখনও হয়। সেই দাঙ্গায় সে থাকতে পারলো না। পোড়া কপাল কাকে বলে? থাকলি উ দেখিয়ে দিতেন দুখী কপালি উর রক্তের মধ্যে আজও জেগে বসে আছেন। কে জানে, তার লাখেরাজের আখেরে এখন কি হয়েছে?

এবার হাটখোলা টিটি মাঠের ভেতর দিয়ে রাস্তা। সবে ফাল্গুন শুরু হয়েছে। এখনই ধুলো উড়তে শুরু করে দিয়েছে। সামনে কৈবর্তপাড়ার গা ঘেঁষে একটা কালো চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। বংশী এই চিমনি আর তার কয়লার কালো ধোঁয়া চেনে। উলুবেড়িয়ার কাছে সে এ-রকম অনেকগুলি কালো চিমনি দেখেছিল। সেগুলি ইটের ভাটি আর টালির ভাটি। সামনের কালো চিমনিটা ইটের ভাটির, টালির ভাটির নয়। এদিকে টালির চল খুব কম। ইটের ভাটিটা কার হতে পারে? নিশ্চয়ই খোকন বক্সির। রাস্তায় লরির চাকার দাগ। লরিও হয়তো খোকন বকসির। এত সব ঝামালি-মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভেতরে থেকেও খোকন বক্সি ঠিক আঙুল ফুলে কলাগাছ। আগে ছিলেন তালবাঁধের ছটকা চিংড়ি, এখন শালা হয়েছেন যেন লালমুখো পোয়াতি রুই।

কৈবর্তপাড়া ডানদিকে পড়ে রইলো। বাঁক নিয়ে তালবাঁধের ধারে পৌঁছেই প্রকাণ্ড একটা ধাক্কা খেল বংশীর পুরনো দিনগুলোকে খুঁজে-ফেরা মন। কারা কাঁটা-তার দিয়ে তালবাঁধকে ঘিরে ফেলেছে। এক জায়গায় একটা শুধু দরজা। ওখানে বসে আছে একটা পাহারাওয়ালা। খোকন বক্সি এখানেও তাহলে পয়সা রোজগারের কোন কল ফেঁদেছে। খানিকটা এগোতেই চোখের ওপর আছড়ে পড়ে পরাণের ঘরটা। ঘরটা মেরামত করা হয়েছে, মনে হচ্ছে। তবে কি পরাণ আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে? আগড়ের কাছে এসে একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বংশী। দরজা বন্ধ। কিন্তু মানুষের আসা-যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে। বংশী বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড়ায় না। কি জানি, যদি পরাণের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। বাঁ দিকে বাঁক ঘুরতেই সেই

সেই পুরনো বুড়ো বটগাছ। নিচটা মাটি দিয়ে বাঁধানো। বেশ পরিষ্কার করে লেপা-পোঁছা। চোখ চলে যায় বিশু খুড়োর ঘরের দিকে। রঘু মেঘু এখন কোথায়? ওরা কি এখনো রোজ সকালে চন্দনপুরে খাটতে চলে যায়? আর সেই আঁটোসাঁটো শরীলের কুইলি? উ কি এখন জলশিয়র ছেড়ে চলে গেছে তার সোয়ামির ঘর করতে? দূরে সমুদ্দুর ঢেউ ভাঙছে। হু-হু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে। মানুষজনের গলা শোনা যাচ্ছে। কোথায় একটা বাচ্চা কাঁদছে। মায়ের বুকের দুধ খাবার জন্যে।

কপালিপাড়ার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বংশী বুঝতে পারে, এটা ফাল্গুন মাস। গাছপালার নতুন পাতায় কচি-কাঁচা উজ্জ্বল রং। কপালি-পাড়ার রাস্তা তেমনি রয়েছে। ধূলোয় সাইকেলের চাকার দাগ। কপালিপাড়ার কেউ বোধহয় সাইকেল কিনেছে। বা, খোকন বক্‌সির পেয়াদা-টেয়াদা কেউ এসেছিল হয়তোবা। মধুয়ার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মধুয়ার বউ পুলি। ও তাহলে ফিরে এসেছে। ওর কোলে একটা বাচ্চা। ওই বাচ্চাটাই কাঁদছিল। একটু এগোতেই বংশীর ঘরের আগড়। ওর ঘরটা তো এখনো পড়ে যায় নি। চালে এখনো আগের মতই খড় রয়েছে। আগড় খুলে বংশী এগোয়। আজ সে যেন একজন ভিন্‌দেশী মানুষ। একী! উঠোনের দড়িতে শাড়ি শুকোচ্ছে কার? বাতাসী! বাতাসী কি তাহলে সত্যিসত্যিই ফিরে এসেছে? নিখুঁত হাতে নিকোনো উঠোন, ঝকঝকে দাওয়া! বোঁচকা নামিয়ে বংশী দাওয়ায় পা রাখে। ঘরের দরজা খোলা ছিল। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কুইলি। বংশীকে দেখে যে চমকে ওঠে।

: তুই এসেছিস, বংশীভাই? কতদিন বাদে তুই এলি! আমি জানতুম, তুই আসবি। তোকে আসতেই হবেন এই মাটির টানে। এই মাটি যে তোর মা। লয়?

বংশী চেয়ে দেখলো, কুইলি কাঁদছে। একটু পরে সে বুঝতে পারলো, তারও চোখে জল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কপালিপাড়ার সবাই জেনে গেল, এতদিন পরে বংশী ফিরে এসেছে। বাতাসী আসে নি। সবার আগে বাচ্চা-কোলে পুলি এলো। ও আগে বংশীর সঙ্গে কথা বলতো না। কথা বলতে ভয় পেত, লজ্জা পেত। ওর যা কিছু কথা গল্প তামাশা—সব ছিল বাতাসীর সঙ্গে। আজ সে বংশীকে ভয় পেল না, লজ্জাও না। এসেই জিজ্ঞেস করে: বংশীভাই, বাতাসী কুথায়?

বংশী সামনের উঠোনের দিকে চেয়ে বলে: জানি না।

সে এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছে, বাতাসী সেই-যে গেছে, চারজন্মের মতো গেছে। সে আর ফেরেনি, ফিরবেও না কোনদিন।

: মধুয়া আসেন-টাসেন?

মুখ নামিয়ে নিচু গলায় পুলি বলে: মাঝে-সাঝে।

বাতাসীর কোন খবর না পেয়ে পুলির সমস্ত উৎসাহ নিবে যায়। সে জানতো, বাতাসী বেশিদিন বংশীর সঙ্গে ঘর করবে না। হয়তো করতো, পরাণ গাঁয়ে ফেরার পর ওর মন পালটে যায়। সেই কবে থেকে পরাণের কাছে ফিরে যাবার জন্যে ওর ভেতরটা উথালি-পাথালি করছিল, সে জানে। এখন ওর কোলে হয়তো পরাণের বাচ্চা। বংশী উকে যা দিতে পারেন নি, পরাণ হয়তো উকে তাই দিয়েছেন। উ ইখোন তা'লে সুখে ঘর-সোংসার করছেন পরাণের সাথে।

পুলি আর দাঁড়ায় না। বাচ্চাটা দুধ খাবে বলে বারবার বুকটা উদোম করে দিচ্ছিল।

পুলি চলে গেলে কুইলি দাওয়ার খুঁটির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে। বংশীকে তার অনেক কথা বলার আছে। অনেক কথা। সে একদিনে শেষ হবার নয়, অনেক দিন লাগবে।

: উদিন সন্ঝায় তুই ত কাউকে কিছু না বলে-কয়ে কুথায় চলে গেলি। সোব্বাই ভাবলেন কি যে, তুই দু'চার রোজ বাদেই ফিরে আসবি। আর কিছু না থাক, জমিনের টান যাবেন কুথায়? দু'চার রোজ ক্যানে, রোজের পর রোজ কাটতি লাগলেন। তুই আর ফিরলি নি। ইখোন তোর জমিন দেখবেন কে, জমিনের ধান দেখবেন কে? ঘর দেখবেন কে, বলদ দুটা ছিলেন, উগুলান দেখবেন কে? শেষে আমাকেই দেখতি হলেন। ইদিকে হপ্তাখানিকের মধ্যেই তোর জমিন লিয়ে শুরু হয়ে গেলেন দাঙ্গা। অনেকগুলান লেঠেল আর জন-মজুর লিয়ে জোর করে তোর জমিনের ধান কাটতি আইলেন খোকন বক্সির লায়েব। গাঁয়ের সোব্ লোক লাঠি টাঙ্গি, কুড়ুল লিয়ে মার-মার করে তেড়ে গেলেন। উড়াও ছাড়বেন নি, জোর করে ধান কেটে লিয়ে যাবেন। আমরাও ছাড়ব নি। ইদিকে কৈবত্তপাড়া থিকে, উদিকে চাঁপাবনি থিকে লাঠি দা ভালি লিয়ে ছুটে আইলেন সোব্ চাষীভাইরা। আর যায় কুথায়! খোকন বক্সির দল বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে সমুন্দুরের চরে পালিয়ে বাঁচলেন। আমি লায়েবটাকে টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে দিই আর কি! জটা আমাকে রুখে দিলেন। বেঁচে গেলেন বুড়া গিধোড়।

বংশী এসব কিছুই জানে না। সে বাতাসীর ওপর রাগ করে, জমিনের ওপর গোসা করে কোন কিছু না ভেবে দেশান্তরী হয়ে গিয়েছিল নির্বোধের মতো। এখন ওর নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে ওর। হাতের শিরাগুলো টান-টান হয়ে ফুঁসতে থাকে।

: তা'পর আমার জমিনের গতিক কি হলেন?

: কি আবার হবেন? তোর জমিন তোরই রয়েছেন।

বংশীর বুকের ওপর থেকে যেন একখানা হাজারমণি পাথর নেমে গেল। ওর জমিন এখনো ওর আছে। খোকন বক্সির পেটে যায় নি। গাঁয়ের মানুষ-জনের

ওপর, কুইলির ওপর ও এখন কেমন একটা গভীর টান অনুভব করছে। একেবার নতুন রকমের একটা টান। বংশী ওর বোঁচকায় বাতাসীর জন্যে যে ক'টা শাড়ি নিয়ে এসেছে, ভাবে, ও গুলো ও কুইলিকে দিয়ে দেবে না কি।

কুইলি বলে: কিন্তুক বংশীভাই, তোর বলদ দুটো বুড়া হয়ে মরেছেন, তোর গাড়িটা ঘরের পেছনে রাখা আছেন। রোদ্দুরে বিষ্টিতে এক্কেবারে লড়ঝড়ে হয়ে গেছেন। আর তোর সোব্ ধান—

ধানের সম্বন্ধে কি বলতে গিয়ে কুইলি উঠোনে জটা আর ঘনুকে দেখে চুপ মেরে যায়।

: কি রে বংশী, কখন এলি? কি বিপদে যে তুই ফেলে গেছিলি—উহ্!

কুইলি ঘরের ভেতর থেকে একখানা মাদুর এনে দাওয়ায় পেতে দেয়। জটা আর ঘনু দুজনে জুত্ করে মাদুরে বসলো। বংশী ঘনুকে চিনতে পারলো। ওর মাথার চুল সব পেকে গেছে, গায়ের রং পুড়ে গেছে, সামনের দাঁতও দুটো পড়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ওকে চিনতে অসুবিধে হলো না। কিন্তু জটাকে বংশী চিনতে পারলো না কিছুতেই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে: তুই কে?

: ইটা কি রকম কথা হলেন রে, বংশী? তোর জন্য ইতো কাণ্ড করলাম। আর তুই কিনা আমাকে চিনতিই্ লারলি?

বংশী আস্তে আস্তে বলে: মনে লয়, তুই জটা—

জটা ছাড়া সবাই জোরে হেসে ওঠে। কুইলিও। ওর হাসি থামতে সময় লাগে।

: তা তোর ই দশা কে করলেন? মাথার জটা কুথায় গেলেন তোর? পরনের গেরুয়া?

হাসতে হাসতে ওর একথার জবাব দেয় কুইলি। বলে: জটাভাই এখন গাঁ-বুড়ো হয়েছেন, বে করেছেন। বউর মন রাখতি জটাভাই তার মাথার জটা আর পরণের গেরুয়া বসন বিদায় করেছেন।

ধমকের সুরে জটা বলে: দ্যাখ্ কুইলি, তুই আজকাল আমার সম্পোক্কে বড় অকথা কুকথা বলতে লেগেছিস্।

: আমি যা বলেছি, উ অকথাও লয়, কুকথাও লয়। যা হক কথা, তাই বলেছি। তোর গায় ছ্যাঁকা লাগে ক্যানে?

জটা সোজা হয়ে বসে। বংশী বলে: আমি ভাবলুম কি যে, খোকন বক্সি জটার মাথা মুড়িয়ে দিয়েছেন—

কথাটায় কেউ হাসতে পারলো না। ঘনু ভারি গলায় বলে: কথাটা তুই মন্দ বলিস নি, বংশী। অবস্থা যা হয়েছিলেন, উ প্রায় উই রকমই। জটা কপালিপাড়াকে রক্ষা করেছেন।

কুইলি বলে: জটাভাই না হলি—

বংশী লজ্জা পায়। নিচু গলায় বলে : জটা, তুই আমাদের মুখিয়া, গাঁ-বুড়ো। সোব্ লড়াইয়ে তোর সাথে আমরা আছি—

কথাটা শুনে হাসি পেলেও জটা হাসতে পারে না। হাসির কথাতেও কেউ কোনদিন জটাকে হাসতে দেখে নি। সে বলে : উদিন তোর সাথে কথা ছিলেন। তোর জমিন লিয়ে কি করা হবেন, উই লিয়েই কথা। তুই কাউকে কিচ্ছুটি না বলে-কয়ে উই যে উধাও হয়ে গেলি, এলি দশ সন বাদে। দাঙ্গা—লড়াই করে তবে নি তোর জমিন আর জমিনের ধান রক্ষা করতি হয়েছেন। উদিন কি হয়েছিলেন, তুই ঠিক বুঝতি লারবি। তেভাগা আন্দুলন যদি কুথাও হয়ে থাকেন, তা'লে উ হয়েছিলেন ই কপালিপাড়ায়। উদিন গাঁয়ের চেহারা দেখলি তুইও ডর পেয়ে যেতিস—

বংশীর চোখদুটো লাল, হাতের শিরাগুলো যেন মোচড় দিচ্ছে। বলে : ইখোন রাগ হয়েন, গাঁ ছেড়ে ক্যানে চলে গিয়েছিলাম। লে, বিড়ি খা—

বিড়ির কৌটো থেকে বিড়ি বের করে সবাইকে দেশলাই-সুদ্ধ এগিয়ে দেয় বংশী।

জটা আর ঘনু বিড়ি ধরায়। নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে : কলকাতার বিড়ির সোয়াদই আলাদা। কি বল্, জটা ?

বংশীও বিড়ি ধরায়।

জটা বলে : তোর জমিন লিয়ে তোর কথাই থেকেছেন। খোকন বক্সিকে কুনো ভাগ দেওয়া হয়েন নি। উই লিয়েই ত দাঙ্গা—মারামারি—

বংশী জিজ্ঞেস করে : মধুয়া কুথায় ? ইকটু আগে উর বউ এসেছিলেন। মধুয়া নিকি মাঝেসাঝে—

: হঁ। রাতেভিতে মাঝেসাঝে আসেন, শুনা যায়েন।

একটু থেমে জটা জিজ্ঞেস করে : বাতাসীর কুনো খবর জানিস ? পরাণের সাথে দেখা হয়েছিলেন ?

: নাহ্—

: তা'লে পরাণই লিয়ে ভেগেছেন। ভালই হয়েছেন। যেখানকার ঘুঁটি উখানেই গিয়ে পড়েছেন। তুই ত ইখোনও বে-থা করিস নি। ইবার তুই তা'লে ইকটা বে করে ফ্যাল্।

ঘনু বলে, আমার শালীটার ইখোনও বে হয়েন নি। চনমনে ডব্‌কা চেহারা। সারা গায় যেন তেল গড়িয়ে পড়ছেন। যদি বলিস—

কুইলি কথার মাঝখানে বলে : ই দশ সন হলেন, জটাভাই তোর জমিন চাষ করছেন। সোব্ ধান উর খানে জমা আছেন।

জটা গম্ভীর হয়ে যায়। ঘনু বলে : জটার খানে থাকা আর তোর কাছে থাকা একই কথা। উতে ভাবনার কিছু নেই।

দেখতে দেখতে পুরো কপালিপাড়াটাই ভেঙে পড়লো দাওয়ায়। কেউ বাদ নেই।

আজকাল কোন ব্যাপারে শুধু একটা খবর করলেই হলো— অন্তত একটা সংকেতের আওয়াজ— সব হাজির, সব একজোট। বংশীর দাওয়ায় আজ আর ঠাঁই নেই। রঘু, মেঘু, রাখু, ঝড়ু, জগা, ভাকু, শিবু, নাড়ু, লগন— কেউ বাদ নেই।

গাঁয়ে খবর করার ব্যাপারে মধুয়ার বউ পুন্নির জুড়ি নেই। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে একবার ঘুরে এলেই হলো। সারা গাঁ তারপরই টালমাটাল।

কুইলি বলে : ইবার বংশীভাইর জমিনের ধানের কি হবেন ?

জটা রেগে যায় : দ্যাখ্ কুইলি, তখন থিকে তুই ধান-ধান করছিস— বংশীভাইর জমিনের ধান বংশীভাইর জমিনের ধান। বলেছি ত, উ ধান আমার খানে রয়েছেন। বংশী ধানের গোলা বা কডুই যা-হোক ইকটা বানাক, দ্যাখ, আমি ধান দি কিনা।

ঘনু বলে : জটার খানে থাকা যা, বংশীর খানেও থাকা তা। উ লিয়ে কথার ইতো ঝাপ্টা-ঝাপ্টি ক্যানে ?

: কুইলি ভাবেন, আমি বংশীর ধান সোব্ খেয়ে লিয়েছি। উর ধান-বেচার টাকায় আমি সাইকেল কিনেছি।

কুইলি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে : আমি কি উকথা ইকবারও তোকে বলেছি, জটাভাই ?

জটার রাগ পড়ে না।

: তুই মুখে বলিস নি, কিন্তুক আমি তোর মন জানি, তুই মনে মনে বলেছিস—

কুইলি সবার সামনে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। কুইলি যখন এভাবে হাসে, তার সমস্ত শরীর দিয়ে হাসে। ভারি সুন্দর লাগে দেখতে, কিন্তু আবার ভয়ও করে।

: তুই আমার মন জানিস। আমি তোকে মনে মনে বলেছি উক[illegible] !

কুইলির হাসি থামে না। জটা গজরাতে থাকে।

: ইবার মধুয়া আসুক। বলব, আমি আর গাঁ-বুড়ো থাকতি লারব, মুখিয়া বা নেতা থাকতি লারব। আমাকে ইবার তোরা রেহাই দে—

কুইলি এবার আর হাসে না। ওর হাসি থামলেও মুখে হাসির একটা ঝিলিক লেগে থাকে। তা আবার বড়ো অর্থবহ। বলে : ইখোন ত তুই উকথাই বলবি, আমি জানি, বে-সাদি করেছিস, ছেলেপুলে হয়েছেন, সাধুর গেরুয়া ছেড়েছিস, ঘোর সাংসারী হয়েছিস, সাইকেল কিনেছিস, খোকন বক্সির ঘরে আসা-যাওয়া করছিস, শুনছি, শিগ্গির পাকা কোঠাঘরও বান[illegible]নি—

জটার গলার স্বর রাগে হঠাৎ চড়ে যায়।

: কে বলেছেন ইসোব্ কথা ? কুথা থিকে শুনেছিস তুই, আজকে তোকে বলতি হবেন।

: তুই যেখানে বলেছিস, উখান থিকেই আমি শুনেছি। তুই পুরা পাল্টে গেছিস, জটাভাই। আগের মতন নেই তুই আর। তোর মিত্যু হয়েছেন। উকথা কপালিপাড়ার

সোব্বাই জানে। মুখে কেউ কিছু বলেন না, তাই। বংশীভাই ত সবে আজ সোকালে এসেছেন, উও জেনে গেছেন তোর পরিবত্তনের কথা।

জটা রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়।

: উঠে দাঁড়ালি যে! চলি যাবি নিকি?

কুইলিও উঠে দাঁড়ায়।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জটা বলে: চলে যাব নি ত কী? বসে বসে তোর এই অকথা-কুকথা শুনতি হবেন নি কি?

: তা'লে বংশীভাইর দশ সনের ধানের হিসাব দিয়ে যা।

রাগে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে যায় জটা। কি বলবে, ভেবে পায় না। মুখে খারাপ-খারাপ কথা উজিয়ে আসছিল। মুখ চেপে কথাগুলো গিলে ফেললো সে।

: হিসাব? হঁ, হিসাব দিব। হিসাব না দিয়ে পালিয়ে যাব নিকি? তবে তোকে হিসাব দিব নি, দিব মধুয়াকে—

: বংশীভাইর জমিন চাষ করলি, বংশীভাইকে হিসাব দিবি নি?

: না।

: বংশীভাইর জমিনের ধানের হিসাব বংশীভাইকে দিবি নি? ক্যানে দিবি নি উকে?

: আমি মধুয়াকে দিব। উ মধুয়ার থিকে সমঝে লিবে। বাস্—

জটা কোনদিকে না তাকিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে সবার চোখের আড়ালে চলে যায়। সবাই হতভম্ব হয়ে যায় আজকের ঘটনায়। জটা গত দশ সন সবার ওপরে নেতাগিরি করেছে। যাকে যা বলেছে, সবাই মাথা নিচু করে মেনে নিয়েছে। কেউ কখনো ওকে কোন রকম প্রশ্ন করে নি। অবাক চোখে সবাই জটার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। কিন্তু মুখ ফুটে কখনো কোন কথা ওকে বলতে পারে নি। ও এখন কপালিপাড়ার নেতা। কপালিপাড়ার মাথা—মুখিয়া, ওর কাজ বা কথার জন্যে কেউ ওকে কোনদিন কোন প্রশ্ন করতে পারে নি। আর, সেও ওর কোন কাজের জন্যে কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নয়। অন্তত এই রীতি গত দশ সন চলে এসেছে।

আজ সেই রীতি প্রথম ভাঙলো কুইলি।

আজকের ঘটনায় গাঁয়ের সবাই বেশ একটু অবাক হয়ে গেছে। খুশি হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে উত্তেজনামাত্রই একটু ছোঁয়াচে। সবার চোখে-মুখে, মনে হচ্ছে যেন একটা উত্তেজনার ছোঁয়াচ লেগেছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশি অবাক হয়েছে বংশী। বিশুখুড়োর আব্দারে কুইলি চিরকালই একটু জাঁহাবাজ। কিন্তু সে যে এই ক'সনে কথায়-বার্তায় এমন চৌখুস, এমন লড়িয়ে হয়ে উঠেছে, তা সে আজ প্রথম জানলো। এ কুইলি যেন অন্য কুইলি। যে কুইলিকে সে দেখে গিয়েছিল দশ সন আগে, এ সে-কুইলি নয়।

নিজের মনে বলতে থাকে কুইলি : বাহ্, বেশ হলেন। মধুয়াভাইকে উ হিসাব দিবেন। বাহ্! মধুয়াভাই কখন আসেন, কখন যায়েন, কেউ জানেন না, পুলিশও না। উকে উ হিসাব দিবেন, আর উর থিকে বংশীভাই হিসাব লিবেন। সোন্দর বেবস্থা!

জটাকে লক্ষ্য করে বলা ওর কথাগুলো শান-দেওয়া ছুরির ফলার মতো হাওয়া কেটে কেটে সবার ঠিক পাঁজরের নিচে যেন গেঁথে বসতে থাকে। বংশী বুঝতে পারে, ওর সামনে দুটো লড়াই পড়ে আছে। একটা লড়াই খোকন বক্‌সির সঙ্গে, অন্যটা জটার সঙ্গে, হ্যাঁ, জটার সঙ্গে।

সেদিন বিকেলে বংশী মাঠের পথে গেল তার জমিন দেখতে। আলবাঁধের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেই খেজুরগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের মুখচোরা সাক্ষীর মতো। উত্তর-পুব কোণের তার আর বাতাসীর হাতের তৈরী বালিয়াড়িটা তেমনি আছে। তার ওপরে বাবলা গাছগুলো সরু কালো-কালো কাণ্ড রেখে মাথায় বেশ কিছুটা ঢ্যাঙা হয়েচে। স্থলকলমীর লতায় পাতায় ফুলে ঢেকে গেছে বালিয়াড়ির বালি। আকাশের আলো নিবে আসে। বংশী আলবাঁধ থেকে নেমে জমিনে মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলে : তুই আমার মা জননী, আমার সোব্। তোকে ছেড়ে দশ-দশটা সন বিদেশ-বিভুঁয়ে কাটিয়ে এসেছি। ছেলের দোষ ধরিস নি, মা, মাজ্জনা কর্। আর তোকে ছেড়ে কুনোদিন কুথ্থাও যাব নি।

ফিরে এসে আলবাঁধের ওপর বসে বংশী। খানিক পরে একটি-দুটি করে তারা ফুটলো আকাশে। যেন আকাশ ওকে চোখ মেলে দেখছে। ঠিক চিনতে পেরেছে ওকে। পারবে না? আকাশ যে ওর বাপ! ওই আকাশে ওর বাপ আছে, ওর মা আছে—দুখু কপালি আছে। ওরা ওকে দেখছে। দক্ষিণের বালিয়াড়ির ওধারে সমুদ্দর উথালি-পাথালি করে ঢেউ ভাঙছে। ফোঁস ফোঁস করে ফুঁসছে। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বেলেহাঁস উড়ে গেল। সাঁই সাঁই শব্দ বাজলো বুকের ভেতর। এখানে কি কম গতর ঢেলে গেছে বাতাসী? সব ভুলে গিয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তুই পরাণের সাথে ঘর বাঁধতি চলে গেলি। ইকবার ভাবলি নি, আকালের সনে পরাণ আর উর মা যখন তোকে ফেলে রেখে চলে গেলেন, কাতারে কাতারে মানুষজন মরছেন ইখানে-উখানে পড়ে—খেতে না পেয়ে, কে তোকে সাথে লিয়ে গিয়েছিলেন, বিদেশ বিভুঁয়ে কে তোকে দানাপানি দিয়ে দু'ডানায় আগলে রেখেছিলেন?

ঘরে ফিরতে রাত হয়ে গেল। সামনের গোয়াল ঘরটা পড়ে গেছে। ঘরটা তাই বড়ো ফাঁকা লাগে। চিনতে কষ্ট হয়। দাওয়ার আলো দূর থিকেও দেখা যায়।

কুইলি কেরোসিনের কুপী জেলে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল। পিঠের ওপর

এক ঢাল অন্ধকার চুল। আজ সকালে সে যেভাবে জটাকে সবার সামনে কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে, তাতে ওকে কেমন যেন একটু সমীহ্ হয়।

: কুথায় গিয়েছিলি? আমি ভাত-তরকারি রেখে সন্‌ঝা থিকে বসে আছি। খেতে বস্। তোকে ভাত দিয়ে আমি চলে যাব।

কুইলি চলে যাবেন? ক্যানে? ইখানে থাকবেন নি? রোজ রাত্তিরে কি উ চলে যায়েন? না, আজ উ ঘরে এসেছেন বলে কুইলি চলে যাবেন?

ঘরের ভেতরে গিয়ে খেতে বসলো বংশী। পেছন ফিরে দেখলো, জানলার কাছে বিছানা পাতা, একটা মশারিও টাঙানো। ঠিক আগে যেমনটি থাকতো। কুইলি আগেকার সেই সানকিতে ভাত-তরকারি বেড়ে ওর সামনে এগিয়ে দেয়। বংশী ওর মুখের দিকে তাকায়।

: কি হইছেন?

: তোর ভাত কুথায়?

: নেই।

: ক্যানে? তুই খাবি নি?

: না।

: ক্যানে?

: ইখানে খাই না। ঘরে খাই—

: তা'লে লিয়ে যা—

: লিয়েও যাই না। বউরা রেঁধে রেখেছেন।

: ই কেমন কথা হলেন? সারাদিন কাম করলি ইখানে, খাবি গিয়ে ঘরে—ই কি ইকটা কথার মতন কথা হলেন? গাঁয়ের লোকজনে বলবেন কি?

: খারাপ ত বলবেন নি। ইখানে খেলে বা ঘরে লিয়ে গেলে লোকজন খারাপ বলবেন।

: খারাপ বলবেন? ক্যানে?

কুইলি বংশীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। লোকটা কী? গাঁয়ের মানুষজনদের চেনে না? ওদের মন বোঝে না? ওদের মনগুলো আনাচে-কানাচে ছোঁক-ছোঁক করে সব সময় কোন-কিছুর গন্ধ ঢুঁড়ে ফেরে। কিছু-একটা পেলেই বাস্, শুরু করে দেবে তুলকালাম কাণ্ড। পরাণের বউ বাতাসীকে নিয়ে বংশী অনেক দিন ঘর করেছে, কেউ কিছু বলে নি। তার অনেক কারণ ছিল। আকালের সনে পরাণ আর পরাণের মা বাতাসীকে ফেলে পালিয়েছিল। বংশী ওকে বাঁচায়। আকালের পরেও পরাণ ওর খোঁজখবর করেনি। ভেবেছিল, বউটা মরেছে। পরাণের বউ বাতাসী মরে গিয়েছিলেন, যে বাতাসী বেঁচেছিলেন, উ বংশীর বউ। বংশী উকে বউ করে ঘরে তুলে লিয়েছিলেন। তাছাড়া, বংশী চিরদিন একরোখা—গাঁয়ের কারো সাথে ওর কুনো সম্পক্কো ছিল নি। পরে আন্দুলনের পেয়োজনে গাঁয়ের

মানুষজনের সাথে মেলামেশা করলেও পুরোপুরি মিলমিশ হয়েন নি উর। উ কাউকে পরোয়া করতেন নি। আর ইখোন? জমিন লিয়ে উ পুরাপুরি বাঁধা পড়ে গেছেন কপালিপাড়ার সাথে। চলতে হবেন ইখোন কপালিপাড়ার সাথে সাবধানে, কথা বলতে হবেন সাবধানে। বংশী ইসোব্ জানেন না, বোঝেন না।

: ইখানে খেলে লোকে মন্দ বলবেন ক্যানে?

: বলবেন।

: ক্যানে মন্দ বলবেন? আমার মনে খারাপ কিছু নিই, তোরও মনে খারাপ কিছু নেই। তা'লে—

: তুই কিছু বুঝিস না।

কুইলি পেছনের দেয়ালে-পড়া তার গভীর ছায়াটাকে সামনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বংশীর কেমন যেন মনে হলো, কামটা ঠিক হলেন নি। ডাকে: কুইলি! শুনে যা। ইকটা কথা—

: কাল সোকালে আসব।

কদিন খুব চিন্তায় কাটলো কুইলির। বংশীকে কোন কথা সে বলতে পারলো না। সে সকালে আসে, রাত্তিরে চলে যায়। সেদিনের পর থেকে বংশীর সঙ্গে কথা প্রায় হয়ই না। একটি কি দুটি, তাও কখনো-সখনো। প্রায় ছোটবেলা থেকেই সে দেখে আসছে বংশীকে। কোনদিন কারো দিকেও ফিরেও তাকায় না। নিজের মনে থাকে, নিজের মনে কাজ করে, ঝগড়া করে কখনো নিজের সঙ্গে, কখনো জমিনের মাটির সঙ্গে। সমুদ্দুরকে গালাগাল দেয়, বাতাসকে বকে, বালিয়াড়ির বালিকে ধমকায়, কখনো বিড়বিড় করে কথা বলে জমিনের মাটির সঙ্গে, কখনো বা আকাশের সঙ্গে। গাঁয়ের মানুষ জনের সঙ্গে ও মিশতে জানে না, কথা বলতেও চায় না। সবাই জানে, বংশী যেমন বদ্‌খেয়ালী, তেমনি বদ্‌রাগী। খরার সনে সবাই যখন কাজকামের খোঁজে গাঁ ছেড়ে এদিকে-ওদিকে পালাচ্ছে, ও তখন বাতাসীকে নিয়ে জমিন থেকে বালি সরিয়েছে, জমিনের মাটি কুপিয়েছে। একটা একগুঁয়ে জানোয়ারের মতো। কারো কথা শোনে নি। আবার খোকন বক্‌সির সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে যখন সে জানলো, ওর জমিন এখন থেকে আর ওর নয়, তখন সে তার সেই ফলন্ত জমিন ফেলে বাতাসীকে নিয়ে কোথাও উধাও হয়ে যাবার কথা ভেবেছে, কিন্তু যখন সে দেখলো, বাতাসীও ওকে ছেড়ে পরাণের সঙ্গে পালিয়েছে, তখন সে সেই যে চলে গেল, দশ সনের মধ্যে আর গাঁ-মুখো হয়নি। অদ্ভুত মানুষ এই বংশীভাই। কিন্তু সেই কবে থেকে কুইলির বংশীকে ভালো লাগে। ওকথা সে কোনোদিন কাউকে বলতে পারে নি। বলতে পারবেও না। পুরুষমনিষ্যি হয়েও যদি সে বুঝতে লারে, তা'লে কি করেই বা উকে বোঝানো

যায়েন মনের সেই গোপন কথা। যে ক'দিন সে এসেছে, কুইলি ওকে রেঁধে-বেড়ে দিয়ে রাত্তিরে চলে যায়। একদিনও ও তাকে বলেনি, কুইলি, আজ রাত্তিরটা তুই ইখানে থেকে যা। কুইলি জানে, কুনোদিন উ বলবেন নি উকথা। কুইলি বুঝতে পেরেছে, উ ইখোনো উর মনের ভেতর বাতাসীর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছেন।

সেদিন বিকেলে খুব হাওয়া দিচ্ছিল হু-হু করে। নিজের হাতে ঘরের পেছনে তরকারির ক্ষেত তৈরি করেছে কুইলি। কলসীতে করে জল দিচ্ছিল একা-একা। বংশী বললো: আমায় দে। তুই আমার জন্যে আর কত করবি? এ্যাদ্দিন ত করলি। ইবার আমায় দে—

কুইলি শোনে না ওর কথা। মেদহীন কাঁকালে জলভরা কলসী নিয়ে সে তৃষ্ণার্ত ঝিঙে গাছগুলোর শিকড়ে জল দিয়ে চলে। বংশী দাঁড়িয়ে দেখছিল ওকে। এক সময় ওর কাঁকাল থেকে কলসী ছিনিয়ে নিয়ে ঘট থেকে জল ভরে এনে তুলে দেয় ওর হাতে। কুইলি ঢ্যাঁড়স গাছগুলোর গোড়ায় জল দিতে থাকে। ঢ্যাঁড়স গাছগুলোতে কুঁড়ি এসেছে। কদিন পরেই ফুল হয়ে ফল দেবে। বংশী ডাকে: কুইলি—

চমকে কুইলি ওর মুখে তাকায়।

: কদিন থিকে ইকটা কথা তোকে পুছ করব, ভাবছি—

কুইলির বুকের ভেতর কলসীতে জলভরার শব্দ হয়।

: কি?

: বাতাসী চলে গেল্লেন ক্যানে? তোর কি মনে হয়েন?

বাতাসী! বাতাসী! কুইলির মনের অভিমানে ওর মুখে যেন মুঠো মুঠো বাতাস ছুঁড়ে মারে দক্ষিণের ক্রুদ্ধ ফাঁকা মাঠ।

: জানি না।

: যে পরাণ উকে কুনোদিন ভাত দেন নি, ভালবাসা দেন নি, উর সাথেই উ চলে গেলেন। আমি কি কুনোদিন উকে ভালবাসিনি?

: উ তুই ভাল করে জানিস—

: বাতাসী তা'লে এ্যাদ্দিন ঘর করেছেন ইখানে, উতে মন ছিলেন নি উর। কি বল্— ?

: বলতে লারব উকথা।

বংশী আর কিছু বলে না। ওরও মনের ভেতর দক্ষিণের বাঁধনখোলা বাতাস ধুলো উড়িয়ে বয়ে চলে। হাতের জলের কলসীটা কুইলির হাতে এগিয়ে দিয়ে বংশী জিজ্ঞেস করে: তোর কি মনে হয়েন, বাতাসী ফিরে আসবেন?

তরকারির ক্ষেতে জল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কুইলি কলসী নিয়ে সোজা ঘরের দিকে চলে। কাঁকালে করে জল বইতে গিয়ে পরনের শাড়িটা ওর সম্পূর্ণ

ভিজে গিয়েছিল। শাড়িটা পাল্‌টানো দরকার ওর। কিন্তু ও কি তা করবে? ভিজে শাড়িটা হয়তো সে গায়েই শুকিয়ে নেবে। কুইলির জিদ খুব। বংশী জানে। ও খুব জেদী মেয়ে।

সেদিন সকালে রাস্তায় বেরিয়ে একটা সাইকেলের চাকার দাগ কুইলির চোখে পড়লো। আর যার হোক, এটা জটার সাইকেলের দাগ নয়। সে জটার সাইকেলের চাকার দাগ চেনে। আগে সে এ-দাগ অনেকবার দেখেছে, বুঝতে পারে নি। যার সাইকেলের দাগ হোক, সে দিনের বেলায় আসে না, রাতে আসে, রাতেই ফিরে যায়। আজ সে ভোরের আলোয় সাইকেলের দাগ ধরে চলতে লাগলো। আশ্চর্য! সে যা অনুমান করেছে, তাই। দাগটা বাঁক নিয়ে সোজা মধুয়াভাইর আগড়ের সামনে এসে হারিয়ে গেছে। সে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক ভালো করে দেখলো। মনে একটা কেমন জোর পেল সে। আস্তে আস্তে আগড় খুলে মধুয়াভাই ঘরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিকোনো উঠোনে দাগ নেই, কিন্তু রাস্তার ধুলো উঠোনের গায়ে লেগে আছে। কুইলি ডাকলো: বউ, অ বউ, ঘুম ভাঙলেন নি তোর?

ভেতরে মধুয়ার ছেলেটার গলা শোনা গেল।

দোর খোলার শব্দ হলো। পুলি পরনের শাড়িটা গায়ে জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে এলো। কুইলি দাওয়ায় উঠে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে: রাত্তিরে মধুয়াভাই এসেছিলেন?

ঘুম-জড়ানো চোখ দু'হাতে বেশ করে রগড়ে নিয়ে পুলি বলে: মাথা খারাবি হয়েছেন তোর। উ আসবেন কুথা থিকে?

: মাথা আমার খারাবি হয়েন নিরে, বউ, উ কুথা থিকে আসবেন, উকথাও জানিনা। কিন্তুক জানি, মধুয়াভাই কাল রাত্তিরে এসেছিলেন।

চোখ বড়ো বড়ো করে পুলি কুইলির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: তোকে তা'লে তোর মধুয়াভাই জানিয়ে গেছেন, আমি জানিনা। ইমোন আসমান-ফাঁদি কথা পাস্‌ কুথা থেকে বল্‌ নি?

: আসমান-ফাঁদি কথা লয়, আসমান-ফাঁদি কথা লয়, একেরে খাঁটি কথা। আলাতানি কথা দিয়ে তুই আমকে ভুলাতে লারবি।

পুলি ধরা পড়ে গেছে। তবু এলোমেলো করে দিয়ে আসল কথাটা চাপা দেবার শেষ চেষ্টা করে।

: কেউ যদি এসে থাকেন, এসে থাকবেন। কিন্তুক ই তোর গা ছুঁয়ে বলছি, উ কাল আসেন নি। বলেই পুলি হেসে ওঠে কুলকুল করে।

: ইকটা পুরুষ মনিষ্যি রাত্তিরে এলেন তোর ঘরে, তোর সাথে সারা রাত কাটালেন। রাত পোয়াবার আগে চলে গেলেন। তুই কিছুই জানতে লারলি। বলছিস

কিনা মধুয়াভাই আসেন নি। আর মিছা কথা বলিস নিরে বউ। তুই ধরা পড়ে গেছিস।

: তা'লে অন্য কেউ হবেন, উ লয়।

: তুই তেমন মেয়েমনিষ্যি কিনা—

: ক্যানে? অন্য পুরুষমনিষ্যি আসতে—

: না। মিছাকথা আর বলিস নি। মধুয়াভাইর সাইকেলের চাকার দাগ আমি চিনি। মধুয়াভাই কাল রাত্তিরে এসেছিলেন।

:চুপ্। কাউকে বলিস নি, কুইলি। ইখোনো উ ফেরার আছেন। উকে পুলিশ খুঁজছেন ধরবেন বলে।

: উকথা বলতে পারি কখনো? উকথা তুই ভাবলি কি করে, বউ? আর কারো কথা হলে ভেন্ন কথা। মধুয়া ভাইর কথা মরি গেলেও বলতে লারব।

পুলি কিছু না বলে কুইলিকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খায়।

জলশিয়র গাঁয়ে সকালের বাতাস খুব নম্র। তখন মনেও হয় না, একটু দূরেই একটা বিশাল সমুদ্র ঘুমিয়ে আছে। গাছের শুক্‌নো পাতা সব ঝরে গিয়ে ডালে ডালে নতুন পাতার মেলা বসে গেছে। পাতারাও এ-সময়ে কথা বলে না। ওদের চোখেও যেন এখনো ঘুম জড়িয়ে আছে। কান পাতলে বহুদূর পর্যন্ত গাঁয়ের বুকের কথা যেন শোনা যায়।

কুইলি তখনও পুলির ডান হাতটা ধরে আছে।

: বউ, ইকটা কথা পুছ করব তোকে? ঠিক বলবি?

: কি কথা?

: এ্যাদ্দিন ত মধুয়াভাইর কথামত বংশীভাইর ঘর সামলে এসেছি। বংশীভাই ফিরে এসেছেন। ক'দিন উর রাঁধাবাড়ি করে দিলাম। ইখোন কি করব? ইবার ত গাঁয়ের মানুষজন মন্দ বলবেন।

পুলি কুইলির চোখে চোখ রাখলো। ঠোঁট চেপে হাসলো একটু।

: মন্দ বলবেন লয়, মন্দ বলতে লেগেছেন। আচ্ছা কুইলি, তুই কি কুনোদিন তোর মরদের সাথে ঘর করতে যাবি নি, ঠিক করেছিস?

: বউ, তোকে আগেও বলেছি, ইখোনও বলছি, উ মরদ লয়—উ ইকটা মেয়েমনিষ্যি। মরদ হলি উকে ছেড়ে আমি ইত সন বাপের ঘরে লাথিঝাঁটা খেয়ে মরতে পড়ে থাকি?

: উ পুরুষমনিষ্যি লয়?

: আমি তোকে কি করে বুঝাব রে, বউ? বাপ না জেনেশুনে বে দিয়েছিলেন।

: তা'লে আমাকে বলবি, তোর মনের বাসনার কথা? তুই কি বংশীর সাথে ঘর করতি চাস?

কুইল পুলির হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে আসে।

: মধুয়াভাইর কথায় এ্যাদ্দিন উর ঘর সামলেছি বলে তুই কি করে ভাবলি, আমি উর সাথে ঘর করতি চাই? গাঁয়ের আর যে যা ভাবুক, আর যে যা বলুক, তুই কিন্তুক, বউ, আমাকে ভুল সম্ঝাস নি। আমি মধুয়াভাইর কথা রেখেছি শুধু—

পুলির ঠোঁটের চাপা হাসি মিলোয় না। ওটা ওর স্বভাব। ওর মতো হাসতে হাসতে অন্যের পেটের কথা বের করে আনতে কপালিপাড়ায় আর কেউ নেই। বলে: আমি সোব্ জানি। কাল রাত্তিরে উও বলছিলেন উই কথা।

: কি কথা?

: তুই উর কথা রেখেছিস। তা হলিও তোকে ইকথা শুধুলাম। ক্যানে শুধুলাম বল নি? মনিষ্যি ইক কথা বলেন, উর মন বলেন ভেন্ন কথা। বাতাসীও বলতেন, উ বংশীভাইকেই শুধু ভালবাসতেন। কুনোদিন উকে উ ছেড়ে যেতে লারবেন। কিন্তু কি করলেন উ শেষে? বংশীভাইকে ছেড়ে পরাণের সাথে ঘর করতে চলে গেলেন? বলেছিলেন পরাণকে উ একদম ভালবাসেন না।

: আচ্ছা বউ, তুই কি মনে করিস, বাতাসী পরাণভাইর সাথেই পালিয়েছেন?

: লয় ত কি?

: উ কি আর ফিরবেন নি?

: দশ সন কেটে গেলেন। ফিরবার হলে এ্যাদ্দিন ঠিক ফিরে আসতেন। আমি বলছি কি কুইলি, তুই বংশীকে বে করে ফ্যাল্।

: মধুয়াভাই কি উই কথা বলেন?

: মুখে বলেন নি, মনে হয়, উর মন উই কথাই বলবেন।

: মধুয়াভাইর মনের কথা মনেই থাক্। মুখ ফুটে যদি কুনোদিন বলেন, তা'লে বউ, উকে বলে দিস, আমি আর বে করব নি।

: জীবনটা এমনি করেই লষ্ট করবি?

: মধুয়াভাইও ত জীবন লষ্ট করেছেন।

পুলি চমকে তাকায় কুইলির কঠিন চোখের দিকে। পুলি, যার মুখে কথার কোন আগল থাকে না, যা মুখে আসে বলে যায়, সে কয়েক মুহূর্ত কথা খুঁজে পায় না। সে জানে, কুইলি ইকটা মালসার ছাইঢাকা আগুন। ইকটু ফুঁ দিয়েছিস কি একেরে গন্‌গনে আঙ্‌রা। মুখে হালকা হাসি টেনে এনে বলে: বংশীভাই তোকে কিছু বলেন নি?

: বলেছেন।

: কি বলেছেন রে?

: বলব ক্যানে?

: বল্ নি, কুইলি। আমি কুনোদিন কাউকে বলব নি। ই তোর গা ছুঁয়ে বলছি।

পুলি কুইলির বুক ছুঁয়ে শপথ করে। কুইলি ওর হাতটা সরিয়ে দেয়।

: তুই আবার কাউকে বলবি নি, বউ? পিরথিবি ফেটে যাবেন নি? কুনো কথা তোর পেটে থাকেন?

: ঠিক থাকবেন, দেখিস। বল্ নি কি বলেন, বংশীভাই?

: বলেন, কুইলি, তোর কি মনে হয় না, বাতাসী আবার ফিরে আসবেন?

: ইখোনো বলেন ইকথা? ইখোনো বাতাসী?

: হঁ। উ বংশী কপালি রে, বউ। উকে চেনা সহজ কম্ম লয়।

: আমি ভেবেছি কি, উ বাতাসীকে ভুলে গেছেন।

: পাগল হয়েছিস বউ? বংশীভাই ভুলবেন বাতাসীকে?

পুলি কাছে এগিয়ে আসে। কুইলির নিশ্বাস ওর গালে এসে লাগে।

: তোর ভুলের জন্যে উ বাতাসীকে ভুলতে লারছেন।

: আমার ভুল? আমি কি ভুল করেছি?

: ক্যানে তুই রাতে থাকিস না? ক্যানে তুই রাতে চলি যাস?

কুইলি ঠোঁট এবং চোখের চাহনি কঠিন হয়ে যায়।

: আমি যদি রাতে উর ঘরে থাকি, সোবার আগে তুই কপালিপাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াবি, কুইলি ইকটা লষ্ট মেয়েমনিষ্যি, উ লষ্ট হয়ে গেছেন। বউ, তোকে আমার চিনতে বাকি আছেন?

: তালে ঠিক করে ফেলেছিস, বে করবি নি?

: হঁ। ঠিক করে ফেলেছি। তোর আগে মধুয়াভাইকে ইকবার দরকার।

: ক্যানে রে? উর উপর তোর লজর নি কি? অ, তুই আমার কপাল পুড়াতে চাস, পোড়ারমুখী? তোর পেটে ই মতলব রয়েছেন নি কি?

: লজর? মধুয়াভাইর উপর? হঁ, উর উপর সোবার লজর। পুলিসের লজরও রয়েছেন উর উপর। তবে আমার লজর উ রকম লয়। মধুয়াভাই আমার ভগমান।

: ইতো ভক্তি? বেশি ভক্তি ভাল লয়।

: লয় ত লয়। তুই, বউ, ইকটা কথা শুধাবি মধুয়াভাইকে?

: কি কথা?

: জটাভাই বংশীভাইর জমিনের ধানের হিসাব মধুয়াভাইকে ছাড়া আর কাউকে দিবেন নি। উদিন সোবার সামনে উকথা বলে গেছেন। ইখোন কি হবেন? এখোন বংশীভাইকে উর ধানের হিসাব যদি উ না দেন—

: দিবেন নি ক্যানে? জটার বড় লোভ বেড়ে গেছেন। আগে ত খুব সাধু সেজে ঘুরে বেড়াতেন। বে করার পর উ দেখছি, একেরে পাল্টে গেছেন।

: শুনছি, পাকা ঘর তুলবেন।

: ঠিক আছেন। উ ইবার এলে পুছ করে লিব। তুই তা'লে ঠিক করে বল্, বংশীভাইর সাথে তোর পাকা কথা হয়ে গেছেন?

কুইলির চোখের চাহনি কঠিন হয়ে ওঠে। কেটে কেটে বলে: পাকা কথা! কিসের পাকা কথা?

: বংশীভাইর সাথে—

: তোকে আমি আর কী বলব রে, বউ?

পুলি কুইলিকে ঠেলা দেয়। বলে: ঠিক আছেন। কাউকে বলব নি। তুইও কাউকে বলিস নি।

ফাল্গুনের শেষ হতে চললো। সমুদ্রের একেবারে কোলের কাছে বলে সকালে একেবারে হাওয়া থাকে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু-একটু করে হাওয়া উঠতে থাকে। শেষে শুরু হয়ে যায় হাওয়ার ঝাপটানি। গাছগাছালির পাতাসুদ্ধু ডালগুলোর ওপর সমুদ্দুরের হাওয়া যেন জল-ডাকাতের দলের মতো একসঙ্গে হামলে পড়ে। পাতায় পাতায় ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে যায়। ডালগুলো মাঝে মাঝে ফুঁকিয়ে ওঠে। বংশীর ঘরের দাওয়াতে হাওয়া হুটোপুটি খাচ্ছিল। সে বসে দেখছিল, উঠোনে ঘরের খড়ো চালের ছায়া বড়ো গাঢ় হয়ে পড়েছে। উদিকে তাকালি একজনের চাহনি মনে ভাসতে থাকেন। উ চাহনি বাতাসীর। উর চোখের পাতার নিচে এমনি ইকটা, জমাট-বাঁধা পুরু ছায়া থম মেরে থাকতেন সোব সময়। বাতাসী নেই, তাই ঘরের চালে কুমড়ো গাছ লতিয়ে ওঠেনি। ওদিকে বলদ দুটো নেই, মরে গেছে। ওদের চালাঘরের চিহ্ন নেই। ঘরের পেছন দিকে গোরুর গাড়িটা পড়ে আছে। একেবারে জরাজীর্ণ দশা। চালে খড়ের বড়ো টানাটানি—জটা খড়ও দেয় না। তাই রোদে জলে গাড়িটার একেবারে খড়িওঠা লড়ঝড়ে অবস্থা। চুলা ধরানো ছাড়া উতে কুনো কাম হবেন নি। বাতাসী যে নেই, উ-ও জেনে গেছেন।

বংশী উঠোনের ছায়া আরো গাঢ় হতে দেখে টান মেরে হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠোনে নেমে দড়ি থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে কাঁধে রাখে। কুইলি বসেছিল দোরগোড়ায়। সে বুঝতে পারে, বংশী হাটে যাবে। আজ হাটবার। বলে: চাল আনতি হবেন, ছাঁচি তেল হলুদ নুনও লাগবেন। আর দিয়াশলাইও লিবি ইকটা। ঘরে দিয়াশলাই একদম নেই।

হাটে যাবার সময় বাতাসীও এরকম বলতো। মাঝে মাঝে কুইলিকে তার বাতাসী বলে মনে হয়। কিন্তু কুইলিতে বাতাসীতে কতো তফাৎ। কুইলি শক্ত-সমর্থ যেন একটি বয়স্থা ঝাউগাছ। আর বাতাসী যেন লক্‌লকে একটি লাউগাছের ডগা। সেই নরম করুণ শরীল লিয়ে খরার সনে উ জমিন থিকে বালি সরিয়েছেন, মাটি কুপিয়েছেন, বীজতলা তুলেছেন, রোপন করেছেন। ধান কাটবার আগেই উ ঘর ছেড়ে, জলশিয়র ছেড়ে চলে গেছেন।

চন্ননপুরের হাটের রাস্তায় জলশিয়রের মেয়েরা তরি-তরকারির ঝাঁকা-মাথায়

চলেছে দল বেঁধে ঠিক সেদিনের মতো। সমুদ্দুরের ছুঁড়ে-মারা হাওয়ার ঝাপটে ওদের সব কথা শোনা যাচ্ছে না, টুক্‌রো-টাক্‌রা একটু-আধটু হাওয়ার উজান ঠেলে ভেসে আসছে। একদিন বাতাসী ওদের সাথে এই রাস্তায় তরকারির ঝাঁকা-মাথায় চন্নপুরের হাটে গেছে। পরাণের সাথে যেদিন সে চলে গেছে, সেও তো এই রাস্তায়। এই রাস্তার ধুলোয় বাতাসীর ছোঁয়া লেগে আছে।

সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজে যেন চট্‌কা ভাঙলো বংশীর।

: জটা লয়? অ জটা—

বংশী ডাকে। জটা সাইকেল থেকে নেমে পড়ে।

: হাটে যাচ্ছিস, বংশী? দ্যাখ্‌, উদিন কুইলি আমাকে সোবার সামনে মুখে যা এলেন, বলে দিলেন। উটা কি ঠিক হয়েছেন। তুই বল্‌?

বংশী জটার একথার জবাবে কি বলবে, ভেবে পেল না। ভেবেছিল, ও জটাকে ভালমন্দ দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবে। তার কথা, আন্দুলনের কথা, মধুয়ার কথা। কিন্তু জটা ওকে ওসব জিজ্ঞেস করার সুযোগ না দিয়ে সেদিন কুইলি ওকে কি বলেছে এবং ওসব সবার সামনে বলা ঠিক হয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে ওর মতামত কি, জিজ্ঞেস করে বসলো। অথচ সে একটু আগে ওকে কিছু না বলেই সাইকেল হাঁকিয়ে চলে যাচ্ছিল। যেন ওকে সে দেখেনি বা চেনেই না। সত্যি, জটা পাল্‌টে গেছে, একদম পাল্‌টে গেছে। একটা রাগ ওর মনের মধ্যে আড়মোড়া ভাঙে। বলে: ক্যানে? কুইলি ত হক কথাই বলেছেন তোকে। দশ সন আমার জমিন চাষ করেছিস তুই, ধানের হিসাব, খড়ের হিসাব—ই সোব্‌ দিবি নি? উর বাইরে এক সন ত আমিই চাষ করে রেখে গিয়েছিলাম, ধান তুই কেটেছিস—হিসাব দিবি ত? আমি ত উতে কুইলির কোন দোষ দেখছি নি।

: আমি ত বলেছি, মধুয়াকে হিসাব দিব। মধুয়া আমাকে চাষ করতি বলেছিলেন।

: দ্যাখ্‌ জটা, মধুয়া ফেরারী আসামী, উকথা তুইও জানিস, আম্মো জানি। উর দেখা পাওয়া বড় সহজ কাম লয়। ইদিকে আমার ঘরে চাল নেই, হাট থেকে চাল লিয়ে গেলে চুলায় হাঁড়ি চড়বেন।

: চাল? চাল লয় কিছু লিয়ে যাস আমার ঘর থিকে। উই ত ঝড়ু উদিন দু'কিলো চাল লিয়ে গেলেন—

জটা ওর জমিন চাষ করে তার ধানে যেন তাকে দয়া করছে, ভিক্ষে দিচ্ছে। একটা অমানুষিক রাগ তার মনের মধ্যে গা-নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে থাকে অপমানে। কি ভেবেছে তাকে জটা? বংশী শান-দেওয়া চোখে তাকায় ওর দিকে। বলে: আমার নিজের জমিন থাকতি আমাকে তোর কাছ থেকে চাল ধার নিতে হবেন ক্যানে রে, জটা?

: উ জমিন আর তোর লয়—

: তা'লে কার? খোকন বক্‌সির?

: না। আমার—উ জমিন আর তোর লয়।

: তোর মাথা খারাপ হইছেন নিকি রে, জটা ?

: মাথা খারাপ হয়েছেন তোদের। কিছু জানিস না। তাই, উল্‌টা-পাল্‌টা বকে চলেছিস। উ জমিন ইখোন আমার।

: তোর ?

: হঁ। তোকে মিছা কথা বলছি নি কি ? তুই জানিস না, সোব্ জমিন জরিপ হয়ে গেছেন। আমি চাষ করছিলাম। জরিপে উ জমিন আমার নামে তাই বর্গা লিখা হয়েছেন। সরকারী আপিসে দেখে আয় গিয়ে। উ ইখোন আমার জমিন। উর হিসাব এখন আমি কাউকে দিব নি। তোকেও দিব নি, মধুয়াকেও দিব নি। যাহ্—

বংশীর মনে হলো, দক্ষিণের বাতাস হঠাৎ যেন মরে গেছে। চেয়ে দেখলো, কৈবর্তপাড়ার মাথার ওপর খোকন বক্‌সির ইটের ভাটির চিমনিতে ধোঁয়ার গোলা যেন ঘন ঘন পাক খেতে খেতে আকাশে উঠে যাচ্ছে।

: আমার সাতপুরুষের রক্ত-জল-করা লাখেরাজ জমিন ইখোন মাগ্‌না-মাগ্‌নি হয়েছেন তোর ? এ্যাঁ ? শালা জটা, মাথার জটা কেটে গিধোড়ের মতন ভেতরে ভেতরে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে আমার জমিনটা গিলে বসে আছিস ? তোকে ত মধুয়া নিকি কপালিপাড়ার সামনে আমার জমিনের দেখাশুনা করতি বলেছিলেন। দেখাশুনার নামে গিলে বসে আছিস আমার জমিন ? বের কর্ আমার জমিন্, লয় ত শালা, তোর পেট ফেড়ে বের করি লিব— হঁ—আমি বংশী কপালি রে— শালা, ভুলে গেছিস ? আমার রক্তে খুনের লিশা আছেন জানিস্ ? দুখু কপালির খুনের লিশা—

বংশী একটানে জটার হাত থেকে সাইকেলটা ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে তুলে বলে : ইটাকে আগে খতম করে তাপ্পর শালা তোকে—

জটা ভাবতে পারে নি, বংশী হঠাৎ এতখানি ক্ষেপে যাবে। বংশীর হাতে শূন্যে তার সাইকেল উঠে যেতে দেখে তার দুর্গতির কথা আঁচ করে সে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে : ভাল হবেন নি, বংশী। লগদ তিনশ টাকা দাম। উটা ভাঙিস না—খারাপ হয়ে যাবেন—

কথা শেষ হবার আগেই জটা দেখলো, ওর সাইকেলটা শূন্যপথে রাস্তার ওধারের মাঠে গিয়ে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়লো। বেলটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো আরো দূরে। হ্যাণ্ডেল বেঁকে গেছে, প্যাডেল খুলে গেছে, চেন গেছে ছিঁড়ে। সর্বনাশ হয়ে গেল তার। সে সাইকেলটা তোলার জন্যে পা বাড়াতেই বংশী ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। জটার দু-কাঁধের ওপর দুটো হাত রাখে। হাতের আঙুলগুলো সমুদ্দুরের রাক্ষুসে কাঁকড়ার দাড়ার মতো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

: ইবার শালা, তোর পেট থিকে আমার গতর-ঢালা জমিন বের করব। দ্যাখ্—

বংশীর হাতের আঙুলগুলো জটার গলাটা দু'দিক থেকে সাঁড়াশির মতো চেপে

ধরে। জটা প্রাণপণে চেঁচাতে থাকে : ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বংশী, মরে যাব, ঠিক মরে যাব—

ততক্ষণে জটার সমস্ত শরীলটা শূন্যে উঠে গেছে।

: মরে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি রে, বংশী—

: শালা, আমার জমিন গিলেছিস। রক্ষক হয়ে, শালা, কিনা ভক্ষক হয়েছিস। বের কর্।

: ছেড়ে দে, বংশী—

: আমার জমিন ?

: ফেরত দিব—

: ঠিক ?

: ঠিক।

পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়ে জটা প্রথমেই রাস্তা থেকে নেমে তার সাইকেলটাকে তুলে দাঁড় করায়। আর হবে কি ? জটা দেখলো, বেল ছিট্‌কে গেছে, হ্যাণ্ডেল বেঁকে গেছে, প্যাডেল খুলে গেছে, চেন কেটে গেছে, সেই সঙ্গে অনেকগুলো স্পোক ভেঙে চাকা দুটোও টাল খেয়েছে, আর ঘোরে না। ওটা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। চন্দনপুরের সাইকেল সারাইয়ের দোকানে এখন সারাতে দিতে হবে। এক কাঁড়ি টাকা গচ্চা। সারিয়ে কবে দেয়, কে জানে। জটার সমস্ত শরীলটা কাঁপছে হাওয়ার মুখে অশত্থের পাতার মতো। আজ খুব জোর বেঁচে গেছে সে। যেভাবে শয়তানটা ধরেছিল ওর গলাটা চেপে, হয়তো ওকে মেরেই ফেলতো আজ। ঘরে বউ আছে, দু-দুটো বাচ্চা আছে। উহু, খুব বেঁচে গেছে আজ জটা। ব্যাটাকে প্রাণের ভয়ে সে ওর জমিন ফেরত দেবে বলেছে। জমিন ফেরত ! হুঁ। ভাল করে জমিন ফেরত দিব তোর। সরকারী আপিসে গিয়ে একেরে পাকাপোক্ত বেবস্থা করে আসব। দশ সন চাষ করেছি কি এমনি-এমনি ? কপালিপাড়ার সোব্‌বাই সাক্ষী আছেন।

বংশী আর দাঁড়ায় নি। কাঁধের গামছাটা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। ওটা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলে হাঁটা লাগায়।

দয়ালের ছেলের চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে বংশী একটা চা দিতে বললো বেশ কড়া করে। কদিন চা খায় নি সে। ঘরে চায়ের বেবস্থা নেই। কুইলিও, বোধ হয়, চা বানাতে জানে না। বসে বসে বংশী হাটের মানুষজনের চলাফেরা, হালচাল, পোশাক-আশাক দেখতে লাগলো। মানুষ বেড়েছে, অনেকের গায়ে পোশাক-আশাক উঠেছে, মানুষের ব্যস্ততা বেড়েছে, কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে সবাই বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছে। কেউ আর আগের মতো নেই, অন্তত ওর মতো বোকা-হাবা কেউ নেই। চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়েছে, দ্যাখে, জটা

সাইকেল ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের রাস্তা দিয়ে। বংশী ডাকে : জটা, এই জটা—

জটা অতি কষ্টে ঘুরে তাকায়।

: চা খাবি ?

: না।

: খেয়ে যা না—

জটার ভেতরটা পুড়ছিল। ওর কথার জবাব না দিয়ে সাইকেল ঘাড়ে মুখ খিঁচিয়ে চলে যায়। বংশীর মনের রাগে যেন এক ঝলক দক্ষিণের হাওয়া লাগে। আজ জটাকে বেশ একটু জব্দ করা গেছে। বিশুখুড়োর পর শালা গাঁ-বুড়ো হয়েছেন। পা থেকে মাথা অব্দি শালার লোভ আর লালচ। জটায় আর দাড়িতে আর শেষের দিকে গেরুয়া কাপড়ে ব্যাটাকে বেশ ইকটু সাধু-সাধু মনে হতেন। গাঁ-বুড়ো হয়ে বংশীর জমিন মেরে খেয়ে জটা-দাড়ি কামিয়ে গেরুয়া ছেড়ে ইখোন ফুল-গিধোড়টা সাইকেল হাঁকাচ্ছেন চন্ননপুরের রাস্তায়। ইজন্যে মধুয়াই দায়ী। মধুয়ার কথায়ই ত উকে কপালিপাড়ার মোড়ল করা হয়েছিলেন।

চায়ের পয়সা দিয়ে বংশী মনে করবার চেষ্টা করে কুইলি আসবার সময় ওকে হাট থেকে কি কি নিয়ে যেতে বলেছিল। জটাকে মারতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে গেছে। হাটে ঘুরে ঘুরে সে চাল, হলুদ, লুন, দিয়াশলাই—এসব কিনলো। হাট অনেকটা পাল্‌টে গেছে। পাল্‌টে গেলেও আগের মতোই রয়েছে। এই তো সেই পাকুড়গাছটা এখনো আছে। এই তো হাটে দাঙ্গার দিন এইখানটায় আন্দুলনের মিটিন হয়েছিলেন। হঁ, উই ত উইখানটায় ছিলেন দনুপালের তামাকের দোকান। দড়িবাঁধা কত বড় কলকেয় সোবার মুখে মুখে তামাক পুড়তেন কত! দনুপালের তামাকের কড়া গন্ধে বাতাসে হাঁপ ধরতেন। ইখোন তার উসোব্ নেই। দোকান উঠে গেছেন। তখনই দনু পাল বলতেন : যে ক'দিন পার, খেয়ে নাও, বাবুরা। এর পর আর দিতে লারব। বড্ড মাগ্‌গি গোণ্ডার দিন আসছে গ সামনে। ঠিক। ভীষণ মাগ্‌গি গোণ্ডার দিন এসে পড়লো। আকাল শুরু হয়ে গেল। জিনিসপত্রের দাম সেই যে বাড়তে শুরু করেছিল আর কমে নি। বেড়েই চলেছে—

বড় রাস্তায় পড়ে বংশী দ্যাখে, জটা দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে খোকন বক্সির সেই পাঞ্জাবী দরোয়ানটা। বংশী চলে আসছিল। জটা ডাকে : এই বংশী, ইদিকে আয়—

বংশী বুঝে নিয়েছে, জটা পরাণের মতো আর একটা শয়তান। নিজে মার খেয়ে অন্যকে ডেকে এনেছে ওকে শায়েস্তা করবার জন্যে। বংশী কাছে যেতেই পাঞ্জাবী দারোয়ানটা ওকে ধমকে ওঠে : তু উস্‌কো মারা কাহে ?

কুলি লাইনে অনেক দিন বিহারী কুলিদের পাশাপাশি থেকে আর বিন্দিয়ার সঙ্গে মেলামেশায় বংশী হিন্দি শিখে গিয়েছিল। বলতে না পারলেও বুঝতে পারে।

: মেরেছি, বেশ করেছি। দরকার হলে ফের উকে মারব।

: এ্যাই! ঠিক্‌সে বাত বোল্ না। হামারা নাম জবর সিং। খুদ পাঞ্জাবসে আয়া হ্যায়। মালুম? আবি বক্‌সি সাহাবকা সিকুরি [সিকিওরিটি]। তু নয়া আদমি—

বংশী জবর সিংয়ের মুখভর্তি দাড়ি আর পাগড়ির দিকে তাকায়। বলে: নয়া নয়, নয়া নয়। আমি পুরান লোক আছি— জলশিয়রের বংশী কপালি।

: তো উস্‌কো মারা কাহে?

: তু জানিস না, সর্দার ভাই, উ আমার জমিন গিলে খেয়েছেন। আমার সাত পুরুষের পাঁচ-পাঁচ বিঘে লাখেরাজ জমিন গিলেছেন। উ জমিন-চোর।

জবর সিং জটাকে জিজ্ঞেস করে: সচ্?

জটা বলে: দশ সন উ জমিন আমি চাষ করে আসছি—

: উ হামি জানে।

বংশী জিজ্ঞেস করে: চাষ করছেন বলে উ জমিন উর হয়ে যাবেন? জরিপে ভাগপাট্টা লিখায়ে লিবেন? বর্গা লিখায়ে লিবেন? রক্ষক হয়ে ভক্ষক হবেন—ই কেমন কথা?

জবর সিং জিজ্ঞেস করে: সচ্? তু উ জমিন বর্গা লিখায়েছিস?

জটা কিছু বলে না।

: আমি দশ সন গাঁ-ছাড়া হয়েছিলাম। গাঁয়ের মধুয়া উকে মুখিয়া করে আমার জমিন দেখাশুনা করতি বলেছিলেন। উ কাউকে কিছু না জানিয়ে উ জমিন নিজের নামে বর্গা লিখিয়ে লিয়েছেন। দশ সনের ধান খড় উর কাছে জমা রয়েছেন। আর আমি খাবার জন্যে হাট থিকে কিনা চাল কিনে লিয়ে যাচ্ছি।

: এ্যাই জটা—

জবর সিং ধমকে ওঠে।

বংশী বলে: মধুয়া না বললে উ ই দশ সনের ধান খড়ের হিসাবও দিবেন নি।

জবর সিং জটার দিকে তাকায়।

জটা রাগে ওর কাণ্ডজ্ঞান হারায়। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: ইখোন মধুয়া বললেও দিব নি। উ জমিন ইখোন আমার।

: তোর বাপকেলে জমিন রে, শালা। হিসাব দিবি নি ত? ঠিক?

: না, দিব নি।

: তোর বাপ দিবেন। মেরে তোর লাশ বালিয়াড়ির নিচে পুঁতে দিব রে, শালা। কাকপক্ষীও টের পাবেন নি। শালা সাধু, ভণ্ড, চোর!

: কলকাতা থিকে এসে তুই বিশুবুড়োর মেয়েটাকে লিয়ে আছিস। উর আগে তুই পরাণের বউকে লিয়ে ছিলি। কপালিপাড়ার মানুষজন তোকে ইবার গাঁ-ছাড়া করে ছাড়বেন। দ্যাখ্—

বংশী জটার দিকে তেড়ে যায়। খুন চেপে গেছে ওর মাথায়। ও ছাড়বে না জটাকে। জবর সিং ওকে জাপটে ধরে। জটা ছুটে পালায়। হাটের লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে যায় বংশী আর জবর সিংকে ঘিরে। মনে হলো, জবর সিংও জটার ওপর খুব ক্ষেপে গেছে। বংশীকে ডাকে : ঠিক হ্যায়। তু আয় হামারা সাথ্।

বংশী ভাবে, জবর সিং ওকে বোধ হয় খোকন বক্‌সির কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সে বলে : আমি যাব নি খোকন বক্‌সির কাছে। উ শালা আর-এক হারামী আছে। উ-ও এক জমিন-চোর।

: আরে নেহি। তু হামারা সাথ্ আয়—

জবর সিংয়ের সঙ্গে বংশী কিছুদূর যাবার পর বড় রাস্তার ওপরেই একটা পুরনো বকুল গাছ পড়লো। আকাশে আলো নিবে আসছিল তখন। বকুলগাছের নিচে তখন একটু-একটু করে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। জবর সিং বংশীকে নিয়ে সেই আবছা অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ালো।

: পহেলে হামারা মালুম থা, জটা আচ্ছা আদমি হ্যায়। আবি দেখতা হ্যায়, উ বেইমান আছে। বেইমানি করকে ও তেরা জমিন ভাগপাট্টা লিখা লিয়া।

জমিন বংশীর প্রাণ। আগে তার জমিনে সমুদ্দুর তার নোনা জিভ বুলিয়ে দিয়ে যেত। বংশী বাঁধ দিয়ে সমুদ্দুরকে আট্‌কেছে। তারপর গতর ঢেলে বালি সরিয়ে তার পোড়া মাটি কুপিয়ে বহু বছর বাদে ফসল ফলিয়েছে। সেই জমিন কিনা জটা বেমালুম ভাগপাট্টা লিখিয়ে নিয়েছে নিজের নামে? রাগে ফুঁসতে থাকে বংশীর মন।

: সর্দার ভাই, আমি কিস্তক ছাড়ব নি। উ জমিন আমার মায়ের মতন—আমার মা-জননী। জটা উকে কব্‌জা করে লিয়েছে। আমি ছাড়ব নি ই গিধোড় বেইমানটাকে।

জবর সিং ওর কাঁধে হাত রাখে।

: উস্‌কো মার ডালে গা? খুন করে গা? উস্‌মে কুছ ফয়দা নেহি হোগা। উ সোব্ ছোড় দো। তু বিষ্টুপুর চিহ্‌নতা হ্যায়? বিষ্টুপুর?

: হাঁ চিনি। গড় বাসলির পরে।

: ঠিক। বিষ্টুপুরমে তু চলা যায়ে গা। হুঁয়া তু জগৎ সরদারকা তালাশ করেগা। সম্‌ঝা? দশ রুপেয়া দে গা উন্‌কো। ও উকিল, হ্যায়। জমিন কা বাত সোব্ কুছ বোলে গা উন্‌কো। জগৎ উকিল যো কুছ বোলে গা, তু কর্ না। সম্‌ঝা?

জবর সিংকে কেমন যেন খুব ভালো মানুষ মনে হয় বংশীর। যেন খুব আপন জন। কোথায় যেন সে ওকে দেখেছে, ঠিক মালুম করে উঠতে পারছে না। জীবনে অনেক গুলো সন বাইরে বাইরে সে কাটিয়েছে। কোথাও সে জবরসিংকে দেখে থাকবে। সে ভালো করে জবর সিংয়ের মুখখানা দ্যাখে। জমে-উঠতে-থাকা অন্ধকারে বড়ো অস্পষ্ট লাগে ওর মুখটা।

: আচ্ছা সর্দার ভাই, তুই কি কুনোদিন আঁদুলে গেছিলি?

: নেহি।

: তা'লে কুথায় তোকে দেখেছি, বল্‌ত?

: ও হাম কৈসে বোলে গা?

অচেনা মানুষকে দেখেও অনেক সময় ও রকম মনে হয়। বংশী ভাবে। সে জবর সিংয়ের কব্‌জিটা চেপে ধরে।

: জমিন আমি ফিরত পাব ত, সর্দার ভাই?

ওর কাঁধে হাত রাখে জবর সিং। বলে : তেরা জমিন তেরা রহে গা। লেকিন—

বংশী জবর সিংয়ের দাড়িভর্তি অস্পষ্ট মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

: খোকন বক্‌সি তোকে বন্দুক দিয়েছেন নি?

: হাঁ বন্দুকমে ক্যা হোগা রে?

: সর্দার ভাই, তুই বন্দুক চালাতে পারিস?

: বন্দুকমে তেরা দরকার ক্যা রে?

: দরকার আছেন।

: হামারা নোকরি ত বন্দুক চালানে কা।

: সত্যি?

জবর সিং হেসে মাথা নাড়ে।

বংশী আনন্দে ছুটতে থাকে জলশিয়রের রাস্তাটা ধরবার জন্যে।

রাত হলেই অন্ধকারে বাতাস কাঁদে। বংশী সেই কান্না স্পষ্ট শুনতে পায়। বাতাস কি কাঁদে? নাকি সমুদ্দুরটা কাঁদে? নাকি তার বুকফাটা জমিন? নাকি তার বুকের ভেতরের সব-হারানো আর-একটা বংশী কপালি? সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু কান্নাটা সে ঠিক শুনতে পায়।

দাওয়ার ধারে খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে বসেছিল। ঘরের ভেতর কুপিটা জ্বলছে। তার আলোর আভাসে দরজাটা যে খোলা আছে, বোঝা যায়। সেই মিয়োনো আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দাওয়ার ধারে বসে কুইলি তার পিঠের চুলের ঢল বুকের ওপর এনে ওতে চিরুনি চালাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, বংশীর মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে ও উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে আছে ওর বুকের কাছটাতে। ওর যেন বলার মতো কোন কথা নেই। যা বলার, বংশীই বলবে। আগে সময় পেলে স্নান করতে গিয়ে তালবাঁধে মাছ ধরে আনতো সে। এখন তালবাঁধ খোকন বক্‌সি কিনে নিয়েছে। পাহারা বসিয়ে দিয়েছে ওখানে। মাছ ধরার উপায় নেই। তাই আজ সকালে কুইলি পুকুরের জলে নেমে বুক ডুবিয়ে খালি হাতে একটা বানমাছ ধরেছে। তেঁতুল দিয়ে অম্বল রেঁধে ওবেলা খানিকটা দিয়েছে বংশীকে। মাটির হাঁড়িতে রাতের জন্যে রেখে দিয়েছে বাকিটা। ওটা যেন কুইলির ভালোবাসা।

আবার আড়মোড়া ভাঙে। আমার শরীলের খুনের ভিতর আজ বহুদিন পর দুখু কপালি লাঠি ঘোরাচ্ছেন রে! দুখু কপালির লাঠি ত লাঠি ছিলেন নি, যেন কুমোরের চাক। বন্দুকের গুলিও হার মানতেন। হুঁ—

বেলা হেলে পড়েছে আকাশে। আঙরার মতো ঠাঠা রোদ্দুর মাথার ওপর। তালবাঁধের কাছে পৌঁছে হঠাৎ মেঠোপথে বাঁ দিকে বাঁক নেয় বংশী। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। বিশ্বের খিদে যেন তার পেটের ভেতর এক দঙ্গল ক্ষুধার্ত বিড়ালের মতো মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে। খিদা মিটাবার কথা পরে ভাবা যাবেন। এখন জমিন। শুধু তার বাপকেলে লাখেরাজ জমিন। তার সমস্ত জীবনটাই জুড়ে পড়ে আছে তার জমিনের বালি, মাটি আর মাঠভরা ফসলের স্বপ্ন। আলের ওপরের সেই খেজুরগাছ। আকাশের দিকে শীর্ণ সরু সরু আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জমিনের মাটিতে ওর ছায়া পড়েছে—ভীষণ কিপ্‌টে। সেই ছায়ায় বংশী দাঁড়ালো নিজেকে খুব গুটিয়ে শুটিয়ে নিয়ে। নত মাথায় তার জমিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। এই জমিনে ওর মায়ের সাঁজালের ছাই মিশে আছে। এই জমিনই তার মা জননী। এই জমিনে গতর ঢেলেছে তার বাপ। এই জমিনে গতর ঢেলেছে সে আর—

নাহ্। সে এখন পরাণের সঙ্গে ঘর করছে। সে এখন পরাণের বউ। আগে সে ছিল পরাণের বউ, এখনও সে সেই পরাণেরই বউ। মাঝখানে ক'বছর সে ছিল তার সঙ্গে সুখে সুখী আর দুঃখে দুঃখী হয়ে। সে যতই বাতাসীকে তার পরিবার বলুক, বাতাসী কোনদিনই তার পরিবার ছিল না। বাতাসী কি সত্যি কুনোদিন বংশী কপালির পরিবার ছিলেন নি? ই জমিন, ই আলবাঁধ, আলবাঁধের উপরের ই খেজুরগাছ, সামনের বালিয়াড়ি এনাদের পুছ কর্, এনারা সাক্ষী আছেন—এনারা কি বলেন, শুনতি পায়েন নি কেউ?

বুকের ভিতরের দিকে তাকায় বংশী। বালিয়াড়ির ওপারে সমুদ্দুর ঢেউ ভাঙেন। বুক-নিঙড়ানো একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

: পিসি খেতি ডাকছেন। খাবি চল্—

চট্‌কা ভেঙে বংশী পেছন ফিরে তাকায়। সিমলি। রঘুর বড় মেয়ে।

খুব খিদে পেয়েছিল বংশীর। আকালের সনের মতো। গব্‌গব্ করে সান্‌কির ভাতগুলো নিঃশেষ করে সে তাকালো কুইলির মুখের দিকে।

: কি? আর লাগবেন ভাত?

: না। কাল তোকে কি বলিছিলাম। মনে নেই?

: আছেন। সকড়ি সান্‌কি তুলতে তুলতে কুইলি বলে: না এলে রাঁধাবাড়ি কে করি দিতেন? খিদের সময় খেতিস কি?

: আমার খাবার কথা আর তোকে ভাবতে হবেন নি। আমি রেঁধে নিতে জানি।

: রাঁধতি জানলিই কি খাওয়া হয়েন ?

কুইলি সান্‌কিটা ধুতে চলে যায় ডোবার ঘাটে। বংশী গোটা-দুই কুলকুচি করে আঁচিয়ে নিয়ে দাওয়ায় বসে। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে জলশিয়রের টিটিক্কার মাঠখানা নিঃশব্দে হেসে ওঠে। বংশী মাঠখানার দিকে চেয়ে বসে থাকে। এই মাঠের শেষ সীমানায় ওর জমিন বুকে কান্না চেপে পড়ে আছে।

সানকিটা ধুয়ে নিয়ে কুইলি ফিরে আসে।

বংশী ডাকে : কুইলি—

কুইলি তাকায়।

: আর বেশিদিন তোকে আমার জন্যে কষ্ট করতি হবেন নি রে—

কুইলি কোন কথা না বলে ঘরের মধ্যে চলে যায়।

বংশী নিজের মনে বলতে থাকে : ঠিক করিছিলাম, ঘরের দেয়ালে একটু মাটি দিব, চালে একটু খড় দিব। বলদ দুটা মরে গেছেন। দুটা বলদ কিনব, উদের জন্যে ইকটা চালা বানাব, হাল-লাঙল কিনব, সময় হলি ইকটা গাড়িও বানিয়ে লিব। কিন্তু হলেন নি। গাঁ ছেড়ে উই আমাকে চলি যেতেই হবেন।

: ক্যানে ?

কুইলি দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। এক ঝট্‌কায় বেরিয়ে এলো।

: শালা জটা আমার জমিনটা এক্কেবারে গিলে লিয়েছেন। আজ জগৎ সরদারের কাছে গিয়েছিলাম। উ বললেন, কিছু করা যাবেন নি। জটা জমিনটা নিজের নামে বর্গা লিখিয়ে লিয়েছেন।

কুইলি ঝাঁঝিয়ে ওঠে : বর্গা লিখিয়ে নিলেই হলেন। উর কুনো বিহিত নেই। সরকারের আইন নেই ? গাঁয়ের জন-মনিষ্যি নেই ?

বংশী হাসে।

: সরকার ? আইন ? গাঁয়ের জন-মনিষ্যি ?

: তোর বাপকেলে হকের জমিন তা বলি অন্যজনের হবেন ?

: হচ্ছেন ত। জগৎ সরদার বলে দিলেন, উ জমিনের আশা নিই। শুধু-শুধু দশ-দশটা টাকা গুনাগার গেলেন।

ওদের কথাবার্তার মাঝখান দিয়ে সমুদ্দুর আর টিটিক্কার মাঠের দীর্ঘশ্বাস হু-হু করে বয়ে যায়। কুইলি কিছু ভাবছে যেন। ওর ভরাট মুখখানাকে ভীষণ শক্ত দেখায়।

: জটা উইরকম কিছু-ইকটা ভেবেছেন, মনে হয়েন।

: কি করে বুঝলি।

: উর ঘর পাকা হয়ে গেলে উ নাকি আর-ইকটা বে করবেন। সিমলির ওপর নজর পড়েছিলেন উর। রঘুভাইকে কথাটা বলতি গিয়েছিলেন। শ্যামা বৌ উকে ঝাঁটা মারতি বাকি রেখেছেন শুধু।

: উ ত বে করেছেন। দুটা বিটিও আছেন।

: দুটা নয়, তিনটা। ইখন বিটার জন্যে বে করতি সাধ—

: বড় সাধু সেজেছিলেন যে রে জটা। গেরুয়া পরতেন—

: সব ঝুটা। আসলে, উ ইকটা পিচাশ—

আবার ওদের কথাবার্তার মাঝখান দিয়ে দক্ষিণের একটা হাওয়া ক্রুদ্ধ নিশ্বাসের মতো বয়ে যায়।

: মধুয়ার বউ কিছু বলেন না ? মধুয়া ইখোন কুথায় ? উ আসেন না রাতেভিতে ?

: শুনেছি, মাঝেসাঝে আসেন।

: তা উ কি বলেন ?

: উ জটাভাইকে বুঝে লিয়েছেন।

: বুঝেই বা কি হবেন ? জটাকে উ আর কি করবেন ?

: মধুয়াভাই যখন বুঝে লিয়েছেন, তখন ইকটা বেবস্থা হবেন।

: বেবস্থা আর কি হবেন ? জগৎ সরদার ত আজ রাখঢাক না করে বলে দিয়েছেন।

: কি বলে দিয়েছেন ?

: কুনো আশা নেই। জটা ব্যাটা আমার জমিন উর নামে বর্গা লিখিয়ে লিয়েছেন। উর পেট থিকে উটা আর বের করা যাবেন নি।

কথাটা শুনে কুইলি থম্ মেরে বসে থাকে। বংশী ভেবেছিল থম মেরে থাকার পর কুইলি হয়তো একটা ঝড়ের মতো ফেটে পড়বে। কিন্তু কুইলি তেমন কিছু করলো না। সে দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে যেমন বসেছিল, তেমনি বসে রইলো। বংশী ডাকে : কুইলি—

বংশীর গলায় কেমন একটা গরগর আওয়াজ। কুইলি চমকে তাকায়। বংশী এভাবে ডাকলে ওর বুকের রক্তে কেমন একটা ঝাঁকি লাগে।

: কুইলি, আমি ইকটা সার কথা বুঝে লিয়েছি—

কুইলি খুব গভীর চোখে ওকে দেখতে থাকে। কোন কথা বলতে ভরসা হয় না।

: ই পিরথিবিতে আশা-ভরসার এক কানাকড়িও দাম নেই রে। জনমনিষ্যি বলেন, ই করি দিব, উই করি দিব। কিন্তু সব ভুয়া, বুঝলি নি, সব ঝুটা। পিরথিবিতে যা করতি হয়েন, সব একলা মনিষ্যিকে করতি হয়েন। দল দিয়ে কিছু হয়েন না। আমি আর কারো উপর আশা-ভরসা রাখব নি। যা করবার একলাই করব। ইবার দেখব, কে আমাকে রুখেন।

বংশী গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধের গামছাটা কোমরে জড়ায়। উঠোনের একধারে দুটো খালি কলসী পড়েছিল। মাটিতে লাথি মারতে মারতে সে কলসী দুটো তুলে নিয়ে ডোবার ঘাটের দিকে চলে যায়। ভাত খেয়ে মুখ ধুতে গিয়ে

ও দেখেছে, কুইলির তৈরি-করা সব্‌জির ক্ষেতটা জল না পেয়ে একেবারে ঝামলে পড়েছে। গাছগুলোর গোড়ায় জল দেওয়া দরকার। নইলে ধুঁকতে ধুঁকতে গাছগুলো মরে যাবে।

কুইলি বংশীকে ওভাবে উঠে যেতে দেখলো। হঠাৎ তারও শরীলের রক্ত কেমন টগবগিয়ে ফুটতে লাগলো। সেও ডোবার ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। দু'হাতে দুটো ভরা কলসী নিয়ে ঘাটের গুঁড়িগুলোর ওপর পা ফেলে উঠতে গিয়ে বংশী ওপরের দিকে তাকায়। কুইলির কালো ভরাট মুখে বিকেলের কমলা রং সরাসরি পড়েছে। এখন ওকে কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে। যেন ও কপালিপাড়ার কুইলি নয়, অন্য কেউ। আসমানের ওপারে দেব্‌তারা যেখানে থাকে, ওখান থেকে যেন এইমাত্র সে নেমে এসেছে। গায়ে এখনো ওখানকার আলো লেগে আছে। সে তার পুরুষ্টু হাতখানা বংশীর সামনে এগিয়ে ধরে বলে : আমার হাতে দে—

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বংশীর চোখে ঘুম এলো না। ঘরের ভেতরে চাপ-চাপ অন্ধকার। জানলার বাইরে হাহা জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে শরীলের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে ওঠে। খোলা বুকে দক্ষিণের প্রথম হাওয়া লাগলে যেমন হয় কিংবা অতল জলের দিকে বেশিক্ষন চেয়ে থাকলে। খালি বিছানাটা বড়ো বেশি খালি মনে হয়। অনেকক্ষণ বংশী বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলো। তবু খালি বিছানা খালিই থেকে গেল। তবে কি বংশী কুইলিকে বিয়ে করে ফেলবে? কুইলিকে বিয়ে করতে তার কোন বাধা নেই। কুইলিরও না। একমাত্র বাধা বাতাসী। বাতাসী যদি ফিরে আসে। বংশী বিছানায় উঠে বসলো। ওধারে চোখের সামনে সেই ঢিঢি জ্যোৎস্না। আজ জ্যোৎস্নার কী হয়েছে? কোথাও যেন তার আড়াল-আব্‌ডাল নেই। বংশীর মনে পড়লো, বাতাসীর চলে যাবার আগের দিনও এমনি জ্যোৎস্না ছিল। এই জ্যোৎস্নাকে বিশ্বাস করা যায় না। কখন কি হতে কী হয়ে যায়। বংশীর কেমন ভয় হয়। বুকের ভেতরে একটা আগুনের কণা দপ দপ করে ইতিউতি হাঁটাহাঁটি করে।

বংশী জানলায় ঝাঁপ ফেলে দেয়। এবার জ্যোৎস্নার সঙ্গে আড়ি। মাথার কাছে বালিশের পাশে হাত বুলোতেই একটা দেশলাই উঠে এলো তার থাবায়। দেশলাইয়ের কাঠি ঠোকার শব্দ। কুপির আলো। জ্যোৎস্নার সঙ্গে আড়ি সম্পূর্ণ।

বংশী উঠে গিয়ে ঘরের কোণে মুখ-গুঁজে-পড়ে-থাকা পুঁটুলিটা থেকে তার টাকার থলেটা বের করে এনে বিছানার ওপর ঢাললো। সামান্য কিছু টাকা। দীর্ঘ দশ বছরের সঞ্চয়। এ টাকা পুরোপুরি তার মেহনতের। এতে বাতাসীর কোন ভাগ নেই। ট্যাঁকের গেঁজেতে কিছু টাকা পুরে নিয়ে বাকিটা থলেয় পুরে পুঁটুলিতে লুকিয়ে রাখলো। রাত নিঝুম মেরে আছে। জানলার ঝাঁপটা সরিয়ে দিয়ে বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ে সে।

পরের দিন সকালে কুইলি যখন আসে, তখন রোদ্দুর উঠে গেছে। তালবাঁধের মাথায় আলো ভুঁই ভাঙার আগেই সে উঠে আজ বুড়োবটতলা সাফ করতে লেগেছিল। এটা পাতা ঝরার সময়। অনেকদিন ঝাঁট পড়ে নি। তাই কয়েক প্রস্ত শুকনো পাতা পুরু হয়ে জমে উঠেছিল বুড়োবটতলায়। সব সাফসুফ করে আসতে আজ একটু দেরি হয়ে গেল। দরজার সামনে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। দরজায় শেকল তোলা। এমন তো কুনোদিন হয়েন না। কুইলি ডোবার ঘাটে, সব্জির ক্ষেতে, ইতিউতি খুঁজে দেখলো। কোথাও বংশী নেই। তাহলে কি বংশী কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ গাঁ ছেড়ে আবার চলে গেল? ঠিক আগের বারের মতো? ওর জমিন নেই—জটা নিজের নামে বর্গা লিখিয়ে নিয়েছে, বাতাসীও নেই। গাঁয়ে ওর আর কুনো টান নেই। কুইলি অনেক চেষ্টা করেছে, যা কেউ কুনোদিন করে না, তবু ওর মনটাকে বাঁধতে পারে নি। কাল শেষ বিকেলে কুইলির সঙ্গে বংশী সব্জির ক্ষেতে জল দিয়েছে। সন্ধ্যেয় দাওয়ায় বসে দু'একটা কথাও বলেছে। অন্যদিনের চেয়ে কাল ওকে যেন বেশ টান-টান মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ভেতরে-ভেতরে সে আবার টগবগিয়ে ফুটতে শুরু করেছে। হয়তো উ কিছু ইকটা করতি চায়, হয়তো ইবার উ কিছু একটা করবেন। হঠাৎ কি ভেবে উ মধুয়াভাইর কথা উকে পুছ করে বসলেন: আচ্ছা কুইলি, মধুয়ার কি খবর বল দি'নি। মধুয়ার বউ তোকে উর সম্পোক্কে কুনোকথা বলেন-টলেন?

কুইলি পিঠের এক ঢল চুল সামনে নিয়ে একটা গিঁট ফেরাচ্ছিল। বললো: সোবার কথা উ বলেন, বলেন না শুধু নিজের কথা। খুব আঁটসাঁট মেয়েমনিষ্যি—

: নিজের কথা না বলুন, মধুয়ার কথা?

: বলছিলেন, মামলা চলছেন, পুলিশও খুঁজছেন, ইবার নিকি ইকটা ফয়সালা হয়ে যাবেন।

বংশী গরগর করে ওঠে: বলছিলেন, ফয়সালা হয়ে যাবেন?

: উ ত খুন-টুন করেন নি। ঝুটা মামলা আর কতদিন চলবেন? উও ত পোনর-বিশ সন হতি চললেন। কবে থেকে শুনে আসছি, মধুয়া ভাই ডাকাত, খুনের ফেরারী আসামী। ই কথা পেত্যয় হয়েন?

বংশী নিরুত্তর। হঠাৎ সে মেঝের মাটিতে একটা ঘুষি মারে।

: মধুয়া যিদিন মামলা ফয়সালা হয়ে কপালিপাড়ায় ফিরে আসবেন, উদিন আমি শালা লাঠি খেলবো। লাঠির দু' মাথায় থাকবেন দাউদাউ দুটা মশালের আগুন।

বাস্। তারপর আর কোন কথা নয়। শুধু নিঝ্‌ঝুম রাত। কুইলি নিঃশব্দে উঠোনের জ্যোৎস্না পেরিয়ে চলে আসে। তখন তো কুইলির একবারও মনে হয় নি, বংশীভাই গাঁ ছেড়ে চলি যাবেন। বরং সে মনে মনে খুশি হয়েছে, বংশী আবার আগেকার বংশী কপালি হয়েছেন ভেবে। বংশী কপালির ঠাকুরবাপ ডাকাতের

দলকে ইকবার কাবু করেছিলেন। উকথা কপালিপাড়া ক্যানে, ইখানকার সোব্ গাঁয়ের জন-মনিষ্যি জানেন। উর লাঠি ঘুরতেন যেন কুমোরের চাক।

কুইলি দাওয়ার ধারটাতে পা দুলিয়ে বসলো। বসে ভাবতে লাগলো। উঠোনে রোদ পড়েছে গা এলিয়ে। বোশেখের চড়া রোদ। কুইলি সেইদিকে চেয়ে বসে রইলো। পায়ে রোদ্দুর লাগছিল। একসময় ওর হুঁশ হলো, রোদ্দুরটা কখন সরে গেছে। এখন মনে পড়লো, ওর আজ অনেক কাজ। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যেতে হবে আজ। কাল সকালে সে সবাইকে বলে এসেছে যদিও, তবু আজ ফের একবার যাওয়া চাই। বুড়োবটতলায় আজ সন্ধ্যেয় মিটিন্ হবেন। অনেকদিন বুড়োবটতলায় মিটিন্ হয় নি। জটাভাই মিটিনের নামে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যান। ইবার উকে হাজির করতি হবেন। ঘনুকাকা বলেছেন, ইবার উ জটাভাইকে যিভাবে হোক, হাজির করবেন।

কুইলি উঠতে যাবে, দেখে, ছেলে কোলে নিয়ে পুলি আসছে, আগড় খুলে সরু রাস্তার বাঁকটা ঘুরে। কুইলির ওঠা হলো না।

: শুনেছিস কুইলি, জটা নিকি ফের ইকটা বে করেছেন। চাঁপাবনির পাঁচু কপালির বউ মঙ্গিকে। গাঁয়ের জনমনিষ্যির জন্যে নিকি ঘরে আনতি ডর পাচ্ছেন।

পুলির কথায় কুইলি একটুও অবাক হলো না। আগেই কথাটা তার কানে এসেছিল। যা রটে, তার কিছুটা ত বটেন। বেশি বয়েসে বে করলি বা বয়েস বাড়লি মেয়েমনিষ্যির শরীলের দিকে পুরুষমনিষ্যির লালচ বাড়েন। একদিন জটা গেরুয়া পরে সাধু সেজেছিল, ওকে সাধু বলেই কপালিপাড়ার সব্বাই মান্য করতো। তারপর মধুয়ার কথায় ও গাঁয়ের কাজে নেমে পড়লো। সব্বাই ওকে আরো বেশি করে মান্য করতে লাগলো। খুনের আসামী মধুয়া ফেরারী। ঘর ছেড়ে গাঁ ছেড়ে নানাখানে ওকে ঘুরে বেড়াতে হয় দলের কাজে। জটাভাইর আর কুনো ভয়-ডর থাকলেন নি। উর কথা সোব্বাই হেঁট মাথায় মেনে নিতে লাগলেন। আন্দুলনের মিটিন্ হলেন গাঁয়ে। জটাভাই হলেন প্রধান মুখিয়া। উর কথাই শেষ কথা। উটাই উর কাল হলেন। জটাভাই তাপ্পর থিকেই ধীরে ধীরে পালটে যেতে লাগলেন। পাল্টাতি পাল্টাতি উ ইখোন সম্পূর্ণ ভেন্ন রকম হয়ে গেছেন।

কুইলি বলে: জটাভাই আর ইকটা বে করবেন, ই আর লতুন কথা কি? বংশীভাইর বাপকেলে পাঁচ বিঘে লাখেরাজ উকে দেখাশুনা করতি বলা হয়েছিলেন। দেখাশুনার নামে উ কপালিপাড়ার কাউকে কিছু না জানিয়ে জমিটা নিজের নামে বর্গা লিখিয়ে লিয়েছেন। উই জন্যে আজ উর অনেক টাকা। পাকা কোঠাঘর তুলছেন, সাইকেল চড়ছেন। ইখোন ত' উ আর ইকটা ক্যানে অনেক গুলান 'বে' করলিও কেউ উকে কিছু বলবেন নি। জটার দাপটও ইখোন খুব বেড়ে গেছেন। শ্যালের মতন ধূর্ত হয়ে উঠেছেন।

: তুই তালে, দেখছি, সোব্ জানিস।

পুলি আজ ভেবেছিল, জটার নতুন বিয়ের কথা বলে কুইলিকে তাক লাগিয়ে দেবে সে। কিন্তু তা হলো না। কুইলি আগে থেকেই সব জেনে বসে আছে। পুলি বুঝতে পারলো, কুইলি বাতাসী নয়। কুইলি গাঁয়ের সব খবরই রাখে। তাকে পাড়ার কোন খবর দিয়ে তাক লাগানো যায় না।

: আচ্ছা বউ, মধুয়াভাই কবে আসবেন রে?

: ক্যানে? বংশীভাইর কি হলেন?

: তুই যে বললি, মামলার ফয়সালা হলি ইবার থিকে উ গাঁয়ে এসে থাকবেন?

: মামলাটা আগে ফয়সালা হোক।

: কবে হবেন?

: দেরি হবেন নি বেশি।

কথাটায় কুইলিকে খুব আশ্বস্ত মনে হলো না। ওকে পুলি বুঝে উঠতে পারে না। শুধু পুলি কেন, গাঁয়ের কেউ, এমন কি, শ্যামা বউ বিজলি বউও ওকে বুঝতে পারে না।

: দ্যাখ্ না বউ, কাল রাতে বংশীভাই মধুয়াভাইর কথা আমাকে পুছ করলেন। আজ সোকাল থিকে উ নিপাত্তা। দরজায় আগের বারের মতন শিকলি তোলা।

: কুথায় আর যাবেন? হয় চন্নপুরে, লয়—

: না বউ, চন্নপুরে লয়। আমি ত ভোর রাত থিকে বুড়োবটতলায়। উ বাতাসীকে ভুলতি লারছেন কিনা। মনে হচ্ছেন—

: বাতাসীকে উ কুনোদিনই ভুলতে লারবেন। পরথম তালের পিঠার সোয়াদ কি সহজে ভোলা যায়েন রে, কুইলি?

: থাম্ বউ। আমি আর বংশীভাইর ঘরদোর দেখাশুনা করতি ল'রবো। ইবার আমাকে তোরা ছুটি দে—

: ছুটি? ছুটি নিয়ে কুথায় যাবি, শুনি? উ রাস্তা তোর কবে বন্ধ হয়ে গেছেন। তোর মধুয়া ভাই না হলি তোকে ছুটি দেবেন কে? জটা?

পুলির ছেলে দুধ খাবার জন্যে বুকের কাপড় খাবলে ধরে টানাটানি করতে শুরু করে দেয়। পুলি বুকের কাপড় ঈষৎ সরিয়ে ওর ঠোঁটে তার স্তনের বোঁটাটি ধরিয়ে দিলে সে একটু শান্ত হয়। তারপর পুলি বলে: শিকলি খুলে চল্ দেখি ঘরের ভেতর। ব্যাপারটা কি হয়েছেন, দেখি—

পুলি নিজেই শেকল খুলে ঘরে ঢোকে। কুইলিও। জানলায় ঝাপ সরানো। বাইরের মানকচুর পাতা থেকে আলো ছিটকে এসে জানলা গলে লাফিয়ে পড়েছে ঘরের মেঝের ওপর। তবু ঘরের ভেতরের জিনিসপত্তরগুলো চোখে পড়তে সময় লাগে। ঘরের কোণের দিকে আঙুল তুলে সে জিজ্ঞেস করে: ওগুলো কি?

সন্ধ্যের একটু আগেই বুড়ো বটতলায় 'মিটিন' বসলো। অনেক দিন পরে।

গাঁয়ের সবাই মিটিনে এসেছে, এমন কি ছেলে-কোলে মধুয়ার বউ পুলিও, আসে নি শুধু জটা। আগে, সবার আগে হাজির হতো সে, বসতো একেবারে সামনের দিকে। আজ সে মিটিনে আসতে ভয় পায়। মুখে সে যতই বলুক, আমি জটাধারী, জটাধর কপালি। কাউকে ডর পাই না। মনে মনে সে ডর পায়। এমনিতে আজকাল সে সবাইকে এড়িয়ে চলে। সবাইকে দেখায় সে ভীষণ ব্যস্ত। ব্যস্ত সে সব সময়ই, শুধু নিজেকে নিয়েই।

কুইলি আজ মহাব্যস্ত। কাল থেকে সে সবার ঘরে ঘরে গেছে। জনে জনে বলেছে মিটিনে আসার কথা। আজ সকালে বংশীর ঘরের দরজায় শেকল তোলা দেখে সে মনে মনে একটু মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘরের কোণে ওর বড়ো পোঁটলাটা পড়ে থাকতে দেখে সে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছে।

আগে যেখানে বিশুখুড়ো বসতো, আজ সেখানে ঘনু এসে বসেছে। জটা থাকলেও সে ওখানটায় বসে। জটা তার এই বিনয়টুকুর বদলে পেয়েছে অকল্পনীয় অনেক কিছু। কাল কুইলি বলে আসার পর ঘনু গিয়ে ওকে আসতে বলে এসেছে। আজ সন্ধ্যে হয়-হয়। তবু জটা এলো না। কুইলি গিয়ে ঘনুর কানে কানে কী বললো। ঘনু এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে যেন নিমপাতা মুখে পুরে গায়ের আড়মোড়া ভেঙে উঠে গেল। কুইলি জানে, 'গোদাকে পবনা বললি যোজন দূর যায়েন।' ঘনুকে কুইলি আজ সেই 'ইলাজ' দিয়েছে।

জটা আজকাল গাঁয়ের মনিষ্যিজনকে মনিষ্যি বলে গেরাহ্যই করে না। কিন্তু ঘনুর কথা শোনে। বিশুখুড়ো মারা যাওয়ার পর ঘনুরই তো ছিল গাঁ-বুড়ো হবার কথা। কিন্তু মধুয়ার কথায় জটাকে গাঁ-বুড়ো করা হয়। তাতে ঘনু মনে মনে ভীষণ রকমের চটে গিয়েছিল। জটা জানে, কোন্ দেবতাকে কোন্ মন্তরে বশ করতে হয়। সে নিজে ঘনুকে গাঁ-বুড়োর মতো মান্য করে তলে তলে নিজের কাম হাসিল করতে থাকে। এখন ঘনু বুঝেছে সে কথা। কিন্তু করার কিছুই নেই ওর। ঘনুর মধ্যে কি যেন নেই— মধুয়া সেটা জানে।

একটু পরে জটা এলো। ঘনুর সঙ্গে। এসেই সবার পেছনে বসে পড়লো। আজ নিজেকে সে একটু লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সবাই তাকে সামনে আসতে বললো। নিরুপায় জটা সামনে এসে বসে। অনেকটা অপরাধীর মতো।

সঙ্গে সঙ্গে 'মিটিন' শুরু হয়ে গেল।

ঘনুই প্রথমে কথাটা পাড়লো।

: জটা, আমাকে বাদ দিয়ে তোকে উদিন গাঁ-বুড়ো করা হয়েছিলেন। উতে আমর রাগ হবারই কথা। কেননা, উমরের দিক থেকে আমিই হলাম গিয়ে সোব্‌বার বুড়ো। কি রে জটা, ঠিক লয়?

জটা তড়াক করে দাঁড়িয়ে ওঠে।

: আমি আর গাঁ-বুড়ো থাকব নি।

: আমাকে বলতি দে। দাঁড়িয়ে রলি ক্যানে? বস্—

না: আমি আর গাঁ বুড়ো থাকব নি। তোরা যাকে খুশি গাঁ-বুড়ো কর।

: উ কথা পরে হবেন। এ্যাখোন তোকে বসে সোব্বার সোব্ কথা শুনতি হবেন।

: আমি শুনতি লারব। আমার 'টায়েন' নেই।

কুইলি সামনের দিকেই বসেছিল। সে এতক্ষণ জটার কথায় ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল। হঠাৎ সে বারুদের মতো ফেটে পড়লো।

: বড় ভদ্দরলোকের মতো কথা বলতি শিখেসিল যে! 'টায়েন' নেই। তোর 'টায়েন' থাকুন আর না থাকুন, আমাদের কথা তোকে শুনতি হবেন। আমরা কুনো কথা শুনব নি।

: আমি ইখানে থাকব নি। চলি যাচ্ছি। দেখি, তোরা কি করতি পারিস।

চলে যাবার জন্যে জটা পা বাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে কুইলি ওর সামনে পথ আগলে দাঁড়ায়। রঘু, মেঘু, গগন, রাখু, ঝড়ু, আর জগা ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সবাই দেখলো, শীতের বাতাসে বটগাছের পাতার মতো জটার আপাদমস্তক কাঁপছে। সাংঘাতিক বিপদের আঁচ করে জটা সেইখানেই বসে পড়লো।

: ঠিক আছেন? কি বলছিস, তোরা বল্। আমি শুনছি।

ঘনু বলে: উভাবে লয়, জটা। সামনে এসে বস্। উখানে বসলি কথা হবেন নি।

রাখু ওকে ধরে সামনে এনে বসায়।

ঘনু সোজা হয়ে বসে। ডাকে: জটা।

: বল্—

: তোর বিরুদ্ধে বিচার আছেন?

: বিচার? আমার বিরুদ্ধে? কে বিচার দিয়েছেন? উই পরপুরুষের সাথে ঘর করছেন যে পালাহড়কি মেয়েমনিষ্যিটা, উ বিচার দিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে?

: ধনুকের বাণের মতো লাফিয়ে উঠে মেঘু কোমরের লুঙ্গিটা ছোট করে গুটিয়ে ফ্যালে।

: মুখ সামলে ঠিকমতো কথা বল্, জটা। না'লে গলায় পা দিয়ে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

মধুয়ার বউর কোলের ছেলেটা ভয়ে মায়ের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। মধুয়ার বউর সেদিকে খেয়াল নেই। সে বলে: তুই কার সম্পোক্কে ই কথা বললি, জটাভাই?

: কারো সম্পোক্কে বলি নি।

রঘু হেঁকে ওঠে: আলবাৎ বলেছিস—

ঘনু শান্ত গলায় বলে: গাঁয়ের মেয়েমনিষ্যি সম্পোক্কে ত বলেছিস। গাঁয়ের

নোকে ইকথারও বিচার করবেন। আগে আসল বিচারটা হোক। আসল বিচার কে দিবেন?

পুলি বলে: আমি বিচার দিব।

সবাই পুলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

: জটাভাই আমাদের গাঁ-বুড়ো। উকে বংশীভাইর জমিন দেখাশুনা করতি বলা হয়েছিলেন। কিন্তুক উ রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়েছেন। গাঁয়ে যে জরিপ আইছিলেন, উতে উ বংশীভাইর জমিন নিজের নামে বর্গা লিখিয়ে লিয়েছেন।

খ্যাপা জন্তুর মতো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জটা বলে: হঁ। বংশীর জমিন আমি বর্গা লিখিয়ে লিয়েছি। ক্যানে বর্গা লিখিয়ে নিয়েছি, শুন্। বংশী গাঁয়ে ছিলেন নি। আমি উর জমিন ভাগে চাষ করি ভাগচাষীর মতো। আমার নামে বর্গা লিখিয়ে কুনো অন্যায্য কাম ত করি নি।

রঘু চেঁচিয়ে ওঠে: আলবাৎ করেছিস।

পুলি বলে: জটাভাই, তোকে বংশীভাইর জমিন দেখাশুনা করতি কে বলেছিলেন?

জটা চুপ।

ঘনু বলে: জটা, মধুয়ার বউর কথার জবাব দে। কে তোকে বংশীর জমিন দেখাশুনা করতি বলেছিলেন?

জটা মাথা নুইয়ে বলে: গাঁয়ের নোক।

: তা'লে তুই যে জমিনটা তোর নামে বর্গা লিখিয়ে নিলি, গাঁয়ের নোক জানেন? বলেছিলি গাঁয়ের নোককে?

জটা আবার চুপ।

: কামটা তুই ঠিক করিস নি, জটা। বংশী গাঁয়ে ফিরে এসেছেন। উর জমিন উকে ফিরিয়ে দে।

কুইলি বলে: আর দশ সনের ধান বিচালির হিসাব? উগুলান কি উর পেটে যাবেন?

ঠিক তখনই বুড়োবটগাছের পেছনে রাস্তায় সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ শোনা গেল। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাতেই তালবাঁধের তালের সারির মাথায় চন্দনের বাঁকা টিপের মতো বাঁকা চাঁদটা চোখে পড়লো। সবার অলক্ষ্যে কখন চাঁদ উঠে গেছে, কেউ টের পায় নি। সাইকেলটা বটগাছের ঝুরিতে হেলান দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে আসে বুধিয়া— বুধন কপালি। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে, তোরা সোব্বাই ইখানে আছিস? তালে শুন। জোর খবর আছেন—

সবাই চুপ। বুধিয়ার মুখে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

মামলা খতম। মধুয়াকাকা খালাস।

সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো। হৈ-হৈ আর থামে না। কুইলি বুধিয়ার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে সামনে। জোর করে তাকে ঘনুর পাশে বসিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে : সত্যি ? সত্যি বলছিস তুই ?

: সত্যি লয় ত কি ? চন্নপুরের বাবুরা বলাবলি করছিলেন। মামলা খতম। সোব্ আসামী খালাস। পর্মাণ হয়ে গেছেন। সোঁদরবনের্ জোতদার জাল মামলা করেছিলেন। উর জেল হয়েছেন।

মধুয়ার ছেলেটার ততক্ষণে কান্না থেমে গেছে। সে মায়ের বুকের ভেতর থেকে তার মুখ বের করে ড্যাব ড্যাব করে দেখছে বুধনকে। পুলি আনন্দে ওর মুখে চুমু খেল বার-দুই। সবাই চেয়ে দেখলো। ওর দুচোখ থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এসে বুকের কাপড়টা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

সেই ফাঁকে রঘু আর মেঘু ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল ভিড়ের ভেতর থেকে। বাঁধভাঙা উল্লাসের চিৎকারে গাঁয়ের ঝিঁঝিডাকা নিঝ্ঝুম রাস্তাটাকে খেপিয়ে তোলে ওরা দুভাই : মধুয়াভাই ছাড়া পেয়েছেন, মধুয়াভাই ছাড়া পেয়েছেন, সত্যের জয় আছেন—

জটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। সে উঠে দাঁড়ালো।

: আমি তা'লে যাই। মধুয়া যখন আসছেন, উ এলে সোব্ ফয়সালা হবেন।

ঘনু বলে : জটা, কামটা ভাল করিস নি তুই।

নিমেষে জটার চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে, লাল-লাল দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে। মুখ খিঁচিয়ে সে বলে : যা করেছি, ঠিক কাম করেছি। জমিন চাষ করেছি, বর্গাও লিখায়েছি। উতে মন্দটা হলেন কুথায় ? আমি পাকা কোঠা করেছি, তোদের হিংসা হয়েছেন। উ আমি জানি না ? আমি কারো মেরে নিয়ে পাকা কোঠা করি নি রে।

ঝড়ু চেঁচিয়ে ওঠে। ফাটা বাঁশের মতো গলায় বলে : আলবাৎ মেরে নিয়ে কোঠা ঘর বানিয়েছিস। তোর গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি। বংশীর জমিন তুই মেরে লিস নি ?

: না। মেরে লিই নি। লাঙল যার, জমিন তার। আমার লাঙল, জমিনও আমার। উতে বে-আইনি কিছু নেই।

ঘনু বলে : চোখ বড়ো বড়ো করে আমাকে আইন দেখাতি আসিস নি, জটা। আইন আমার ঢের জানা আছেন। লাঙল তোর থাকতি পারেন। তুই জমিদারের জমিন চায করলি বর্গা লিখাতে পারিস। যার জমিন বলতি এক মাত্তর জমিন, দুসরা কুনো জমিন নেই, উটা তুই বর্গা লিখালি উ বর্গা টিকবেন নি, জটা। আমাকে বর্গা আইন দেখাতি আসিস নি।

: ঠিক আছেন। তালে বংশীর জমিনের বর্গা হিম্মৎ থাকলি কাটিয়ে লে—

জটা ভিড় ঠেলে গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে যায়।

বহুদিন অসাড়-হয়ে-পড়ে-থাকা গাঁয়ের রাস্তা আর শুকনো-বুক ডোবার

পাড়গুলোকে সচকিত করে মাদল বাজাতে বাজাতে ছুটে এলো রঘু আর মেঘু। ওদের ঘিরে গলার পুঁতির মালার মতো ঘিরে দাঁড়ালো মেয়েমনিষ্যি ও পুরুষমনিষ্যির দল। মাদলের বোলের সঙ্গে সবার পায়ে বেজে উঠলো পরিচিত তাল, সমবেত গলায় উঠলো কপালিপাড়ার আনন্দ-গান :

উঠান ভরি জোছনা ঝলমল ঝলমল করেন গ
অনেক দিন পরে গ
কুটুম আসেন ঘরে—।
কুটুম পাখি ডাকিলেন
ঝিঙাফুল ফুটিলেন
বুকটা আমার টলমল টলমল করেন—।

কপালিপাড়ার বহু পুরনো গান। অনেকদিন এ-গান কেউ গায় নি। সবাই বোধহয় ভুলেই গিয়েছিল গানটা। বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে আজ হঠাৎ গানটা বেজে উঠলো ওদের মর্মতলে। সুর হয়তো ঠিক লাগলো না, পা হয়তো তালে পড়লো না। ওতে কিছু এসে গেল না। কপালিপাড়ার আনন্দ জ্যোৎস্নায় বিলি কাটতে লাগলো অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

বুধিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল দৃশ্যটা। হঠাৎ গায়ের জামায় টান পড়ায় সে পেছন ফিরে দেখলো, সিমলি। ইশারায় ওকে ডাক দিঁয়ে সিমলি ছুটে বুড়োবটগাছের ঝুড়ির আড়ালে হারিয়ে যায়। বুধিয়া বুড়োবটগাছের পেছনে গিয়ে দেখলো, সে ওর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের ওপর পিঠ এবং দুটো কনুই দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুব উদ্দেশ্যমূলকভাবে। বুধিয়া ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে : ইমন অসময়ে ডাকলি যে ?

সিমলি ওর আঁচলটা বুকের ওপর দিয়ে টান-টান করে ফিরিয়ে নিয়ে কোমরে জড়িয়েছে বেশ আঁটোসাঁটো করে। ওখানে জ্যোৎস্না যেন একটু বেশি পুরু। একটু বাড়তি আলো ঝিলিক মারছে তার যৌবনের স্থাপিত অংশগুলিতে। তাতে সিমলিকে আরো আকর্ষণীয় লাগছে। ওকে এখন জ্যোৎস্নায় ঠিক একটি পরীর মতো মনে হচ্ছে বুধিয়ার। সে যেন এখন এই কপালিপাড়ার কেউ নয়, এই পিরথিবির কেউ নয়। সে সিমলি, শুধুই সিমলি, জ্যোৎস্না দিয়ে বোনা তার শাড়ি, ছায়া দিয়ে গড়া ওর শরীল, আর ভালোবাসা দিয়ে তৈরী ওর হৃদয়।

: কি ? ই নাচগানের মাঝখানে আমাকে ডেকে আনলি যে ?

সিমলি কিছু বলে না। শুধু বুধিয়ার চোখ দুটোর দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। তার দু' চোখে জ্যোৎস্নার বিদ্যুৎ। হাসতে হাসতে এক সময় সে তার চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলে।

বুড়োবটগাছের ওধারে আনন্দভরা নাচগানের জোয়ার ঢেউ ভাঙছে। ঘনু

একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে জটার কথা । আজ স্পষ্ট বোঝা গেল, জটা বংশীর জমিন বোধহয় সহজে ছাড়বে না।

কপালিপাড়ার ঘুম ভাঙতে আজ একটু দেরি হচ্ছে। দেরি যে হবে, ওটা কালই জানা গিয়েছিল। রাত যখন গড়াতে গড়াতে নিশুতি, সমুদ্দুরের বুকের ছোঁয়ায় ভিজে হাওয়া যখন সামনের মাঠে জ্যোৎস্নার সঙ্গে হুল্লোড়ে মত্ত, তখন বুড়োবটতলার মাদলের বোল, পায়ের তাল আর গলার গানে লেগেছিল বেশ একটা নেশার ঘোর। কলসী-কলসী হাঁড়িয়া উড়ে গেছে। এমনিতে কপালিপাড়ার কপালিরা একটু-আধটু হাঁড়িয়া মাঝে-মধ্যে খায়। কিন্তু কোন আনন্দ-ফূর্তির ছুতো পেলে ওরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তখন সবাই বেসামাল। তা বিয়েই হোক আর ধানকাটাই হোক, কোন একটা ছুতো পেলেই হলো।

মধুয়া ছাড় পাবে, গাঁয়ে ফিরে আসবে—কপালিপাড়ার কাছে এটা নিশ্চয়ই একটা খবর। মধুয়া যে গাঁয়ে বহুদিন আসেনি, তা নয়। সে মাঝেমধ্যেই গাঁয়ে এসেছে ঘুমে নিসাড় নিশুতি রাতে। সে কথা জানে গাঁযের একজন। সে মধুয়ার বউ। আগে-আগে জটাও জানতে পারতো। আজকাল আর জানে না। গাঁয়ের লোকে চোখে না দেখলেও জানে, মধুয়া আসমানের তারাদের চোখকেও ফাঁকি দিয়ে মাঝেমধ্যে ঘরে আসে। বউর কাছ থেকে গাঁয়ের খবরাখবর সব নিয়ে যায়। মধুয়ার বউ, সবাই জানে, গাঁয়ের সমস্ত খবরের জিম্মাদার।

কপালিপাড়ার কাছে মধুয়ার ফিরে আসার খবর তেমন কোন বিরাট ব্যাপার নয়। মধুয়া যে ডাকাত নয় আর সেজন্যে ওর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন চলতে-থাকা মামলাটা যে মিথ্যে, তা প্রমাণিত হয়ে যাওয়া —ওটাই আসল ব্যাপার । মধুয়ার জন্যে যে ওরা ভেতরে ভেতরে এতটা পাগল, তা কারো জানা ছিল না। মধুয়াকে ওরা গাঁয়ে কদিনই বা দেখতে পেয়েছে ? দেখার চেয়ে শুনেছে বেশি। তাতেই মধুয়াকে ওরা বেশি করে পেয়েছে মনের ভেতর। গাঁয়ে থাকলে হয়তো এতটা পেত না। তাতেও কাল এতটা ওদের মেতে ওঠা হয়তো হতো না। মনে হয়, কাল রাতের নাচগান আর হাঁড়িয়ায় মাতাল বিভোর ফূর্তিটাই ছিল আসল। মধুয়া নয়।

কুইলিও কাল একটু হাঁড়িয়া খেয়েছিল। শেষ রাতে ঘরে এসে একটু ঘুমিয়েও পড়েছিল। কিন্তু ভোর না হতেই রোজকার মতো ওর ঘুম ভেঙে গেছে। বুড়োবটতলা সাফসুফ করে বংশীর ঘরে এসে দেখে, ঘরের কপাটে যথারীতি শেকল তোলা। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, কাল সে-ই গাঁয়ে ছিল না। কুইলির কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকে। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। তাহলে মনের দুঃখ মনে চেপে কাউকে কিছু না বলে বংশী গাঁ ছেড়ে চলে গেছে।

এ-সব ভাবতে ভাবতে কুইলির নিজেকে কেমন যেন ক্লান্ত মনে হয়। সে মনটাকে শক্ত করে ঘনুর ঘরে যায়। উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকে: ঘনুকাকা—

ঘনুকাকা নাকি ঘরেই ফেরেনি। আশ্চর্য! কোথায় গেল ঘনুকাকা? কাল জটার সঙ্গে সবারই কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। ওর সঙ্গেও হয়েছে, ঘনুকাকার সঙ্গেও হয়েছে। তবে ঘনুকাকার সঙ্গে ওর একটা পুরনো কাজিয়া থেকে গেছে। সে ওই গাঁ-বুড়ো নিয়ে। কাল ওদের কথা-কাটাকাটির ফাঁকে সেই পুরনো কাজিয়াটা বারে-বারে ফাঁস হয়ে পড়েছিল।

কাল মিটিন ছেড়ে চলে আসার আগে জটা ঘনুকাকাকে শাসিয়ে এসেছিল। বংশী গাঁয়ে ফিরে আসার পর থেকেই জমিন হারাবার ভয়ে সে হয়ে গেছে একেবারে একটা পাগলা কুকুর। কপাল-ভর্তি ভাঁজে, কোটরে-ঢোকা চোখে, পানের ছোপ-লাগা লাল-লাল বড়ো-বড়ো দাঁতে ওকে এখন ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয়। মনে হয়, ও যেন এখন সব করতে পারে। তাহলে জটা ঘনুকাকার কিছু ক্ষতি করলো না তো? এটা ঠিক, ও নিজে হাতে কিছু করবে না। কিছু করবার হলে কাউকে দিয়ে করাবে। তাহলে কি সে এখন একবার জটার কাছে যাবে? কি হবে গিয়ে? সে ওকে কী পুছ করবে? জটা এখন কিছুতেই সত্যি কথা বলবে না। এই জটা একদিন গেরুয়া পরে গাঁয়ের সবাইকে ধোঁকা দিয়ে খুব সাধুগিরি ফলাতো। ভণ্ড সাধুর ডগমগানি বেশি।

তারপর পুলির ঘর। পুলিকেও কাল নাচতে হয়েছে, সবার কথায় হাঁড়িয়াও খেতে হয়েছে। এখন তো ওর বেহুঁশ হয়ে শুয়ে থাকার কথা। কিন্তু কুইলি ওর ঘরে গিয়ে দেখলো, উঠোনে ওর ভিজে শাড়িটা শুকোচ্ছে। আর পুলি এই সাত সকালে চুলা ধরিয়ে হাঁড়িতে ভাত চাপিয়ে দিয়েছে। কুইলিকে দেখে সে বলে: একটা মাছ ধরে দিবি, কুইলি? উ যদি আজ আসেন, উকে ভাত দিব কি নিয়ে?

কুইলি হেসে একটু মস্করা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারলো না। ওর বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করে উঠলো। মধুয়াভাই আজ আসবেন, তাই তার খাওয়ার ভাবনায় ওকে পেয়ে বসেছেন। কিন্তু যদি সে আজ না আসেন? পুলিকে যে তখন তার মনের 'বেথা' চোখের জলে ধুতি হবেন। পুলি বলে: তুই ভাবিস নি বউ, আমি মধুয়াভাইর জন্যে ঠিক মাছ ধরি দিব। কিন্তুক ইদিকে ঘনুকাকা কাল মিটিন থিকে ঘরে ফেরেন নি। বংশীভাইও পরশু রাত থিকে কুথায় গেছেন, আজও দেখা নেই। মনের দুঃখে ফের কুথাও চলি-টলি গেলেন নি ত? যে রকম মাথা-গরম মনিষ্যি!

: কাল মিটিনে বংশীভাই ছিলেন নি, একদিক থিকে ভালই হয়েছেন। থাকলি ইকটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেতেন।

: কিন্তুক গেলেন কুথায় মনিষাটা? গাঁ ছেড়ে ফের কুথাও চলি গেলেন নি ত?

: কি জানি, উকে বুঝা যায়েন নি।

: তাই ত ডর লাগেন, বউ—

: ডর করিস নি, কুইলি। উ ঠিক এসে যাবেন। ঘরের কোণে আমি ওর বোঁচকা-বুঁচকি সোব্ পড়ে থাকতি দেখেছি।

কুইলি মনে মনে বলে: জমিন হারিয়ে যার মুখে দেবার মতো একদানা চাল ঘরে নেই, উর কাছে বোঁচকা বুঁচকির দাম কি?

পুলির ছেলে ঘুমোচ্ছিল মেঝের বিছানায়। ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠলো। পুলি ছেলের কাছে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। কুইলি বলে: আমি যাচ্ছি, মাছ ধরে আনছি, বউ—

সিমলির আজ কি হয়েছে, কে জানে। ঘুম ভাঙছে না কিছুতেই। ঘরে শ্যামা ঘুম ভাঙিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিল পিসির কাছে। এখানে সে এসে ঢুলছে দাওয়ার ধারে বসে। কুইলি মাছ ধরে পুলিকে দিয়ে এলো। ভিজে কাপড় গায়ে লেপ্‌টে বসেছে ওর। শরীলের বিশেষ বিশেষ অংশের বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে সিমলিকে ম ডেঙ্ক জিজ্ঞেস করে: কাল তুই কত হাঁড়িয়া খেয়েছিলি?

সিমলি চোখ দুটো আচ্ছা কযে রগড়ায়। আরামে হাই তোলে।

: একটুও খাইনি, পিসি—

: তা'লে ঝিমোচ্ছিস ক্যানে?

: উ কি আমি জানি? খালি ঘুম পাচ্ছেন আমার।

আবার হাই তোলে সিমলি।

: তোকে কি কেউ নিদালি বাণ মেরেছেন নি কিরে?

: কি করি জানব, পিসি।

: মিছাকথা বলিস নি, সিমলি। কাল তুই খুব হাঁড়িয়া খেয়েছিস।

: সত্যি বলছি, পিসি, কাল আমি ইকটুও হাঁড়িয়া খাই নি।

: কাল লাচের সময়ও ত তোকে দেখি নি।

: বারে, তোর সামনেই ত লাচছিলুম।

: লাচছিলি নি কি?

সিমলি কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বলা হলো না। রাস্তায় কী একটা শব্দ হলো। কারা যেন কথা বলছে। সিমলিব ঘুম-ঘুম ভাব কেটে যায়। সে কুইলির পাশ দিয়ে রাস্তার দিকে ছুটে যায়। ওখান থেকেই ডাক: পিসি, শিগ্‌গির—

: ক্যানে রে?

: দেখবি আয়—

কুইলি উঠোন পেরিয়ে বাঁক ঘুরে দেখে, একটা গোরুর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। আর তা থেকে ঘনুকাকা নেমে ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। অবাক চোখে সে দেখলো, গোরুর গাড়িটা আগড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। কুইলি গিয়ে আগড় খুলে দেয়।

বংশী বলদ দুটোকে গাড়ি থেকে খুলে কুইলিকে বলে : উদের ভিতরে লিয়ে গিয়ে বাঁধ্।

গাড়িটাকে ঠেলে ভেতরে নিয়ে যেতে গিয়ে বংশী দেখলো, গাড়িটা ঢুকছে না। আগড়টা বড় করতে হবে।

আগড় বড় করতে হবে— বললেই বড় করা যায় না। ওর আবার ঝামেলা অনেক। দু'দিকের বেড়া ঝোপঝাড় কাটতে হবে, খুঁটি তুলতে হবে, নতুন করে খুঁটি পুঁততে হবে, নতুন আগড় বাঁধতে হবে। তার জন্যে শাবল, কাটারি, দড়িদড়া চাই। কুইলি আর সিমলি ওসব মধুয়ার বউর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এলো। ভর দুপুরের সেই খর রোদ্দুর মাথায় নিয়ে বংশী নতুন আগড় বানালো। গাড়িটাকে ঠেলে ভেতরে নিয়ে গেল। ছই-লাগানো গাড়িটাকে ঘরের পেছনে রাখলো সাবধানে। গাড়িটা মাটিতে কপাল ছুঁয়ে পড়ে রইলো প্রণামের মুদ্রায়। গাড়ি থেকে দেয়ালের গাঁ ঘেষে নামিয়ে রাখলো নতুন একটা লাঙল, একটা জোয়াল, আর একটা মই।

: কুইলি—

বংশী কুইলিকে ডাকে।

: বলদ দুটার মুখে ইকটু খড়জল দিতে হবেন যে—

সিমলি কাছেই ছিল। বলে : পিসি খড় আনতি গেছেন—

ঘরে বলদ দুটোর মুখে দেবার মতো একআঁটি খড় নেই, বিচাল্লিও নেই। ওর জমিন থাকতেও ও-সব নেই। তাও চাইতে যেতে হয়, পুলির কাছে। বংশী আগে ভাবেনি ওকথা।

পরশু বিকেলেই বংশী মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল হাল বলদ আর একটা গাড়ি কেনার কথা। হাল বলদ না থাকলি চাষীর কিছুই থাকেন নি। লাঁঙল যার, জমিন তার। জটার কাছ থিকে জমিন ফিরে পেতে হলি হাল বলদ চাই। আসমানের উপারে ভগমান আছেন। ইখোনো চাঁদ-সূরয উঠেন। উনি ঠিক বিচার করবেন। আম্মো লড়ে দেখে লিব, জটা কতদিন আমার জমিন বর্গা লিখিয়ে রাখেন। জটার আরো জমিন আছেন, আমার ইটুকু ছাড়া আর জমিন নেই। ইটুকুনও সমুদ্দুরের গেরাস থিকে লড়াই করে আমি ছিনিয়ে এনেছিলাম একদিন। ই আসমান সাক্ষী আছেন, আসমানের উপারে ভগমান সাক্ষী আছেন।

বংশী মনে মনে কথাগুলো দুনিয়াকে শোনায়, দেশের সরকারকে শোনায়, কপালিপাড়াকে শোনায়, আর শোনায় জমিন-চোর জটাকে।

আজ যদি বাতাসী থাকতেন, লতুন হালবলদ আর নতুন গাড়ি দেখে খুব আনন্দ করতেন। আজ বাতাসীও নেই, জমিনও নেই। সোব্ বেইমান! ইখোন বাতাসী পরাণের ঘর সামলাচ্ছেন আর উর জমিনও হাতছাড়া হয়ে খামার ভরছেন জটার। শালা বংশী কপালির কপালটাই মন্দ!

গজগজ করতে করতে বংশী ডোবার দিকে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার

দেখে নেয়, বলদ দুটো জল খেয়ে খড় চিবোচ্ছে। চেয়ে দেখলো, পায়ের তলা থেকে ছায়া সরে যাচ্ছে পুবমুখো। বেলা অনেক হয়েছে।

সেদিন রাতে সে ঘরে শেকল দিয়ে চলে যায় নসীগঞ্জের হাটে। নসীগঞ্জের হাট কি এখানে? প্রায় একদিনের পথ। গড়বাসলি, বিষ্টুপুর ছাড়িয়ে ফতেপুর, কুকড়োহাটি, চাঁদকুড়ার পর দু'তিন ঘন্টা হাঁটলে তবে গিয়ে পড়ে নসীগঞ্জের হাট। নসীগঞ্জের হাটে হালবদল, ছাগলভেড়া, মুরগী থেকে শুরু করে দা-কাস্তে-কুড়ুল সব পাওয়া যায়। হাটের ওপরেই আছে অনেকগুলো কামারশালা। ওখানে নতুন-পুরনো গোরুর গাড়িও দরদাম করে বিক্রি হয়। সব কিনে-কেটে গাড়িতে বলদ জুড়ে দিয়ে হাট থেকে বেরোতেই বিকেল। চাঁদকুড়া পৌঁছবার আগেই রাস্তার ধারের জঙ্গলগুলো থেকে প্রহর ডেকে উঠলো রাতজাগা শেয়ালেরা। চাঁদকুড়ায় রাতটা কাটিয়ে সে ভোরবেলায় গাড়ি ছেড়েছে। তাতেও ঘরে ফিরতে বেলা দুপুর। রাস্তায় দেখা হলো ঘনুকাকার সঙ্গে। কোথায় যেন গিয়েছিল কাজে। ঠাঠা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরছিল মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে।

: গাড়িটা কিনলি নি কি রে, বংশী।

: হঁ। কুথায় যাবি তুই, ঘনুকাকা?

: ঘরে।

: তা'লে রোদ্দুরে হাঁটবি ক্যানে? গাড়িতে উঠে ছই-এর ভেতর ঢুকে পড়।

ছই-এর ছায়ার আরামে বসতে না বসতেই ঘনুকাকা কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়ল। কাল রাতের কথা ঘনু ওকে আর বলতে পারে নি।

খুব খিদে পেয়েছে বংশীর। ডোবায় একটা ডুব দিয়ে এসে কুইলিকে বলে: ভাত দে। বড্ড ভুখ্ লেগেছেন রে।

কুইলি বংশীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সে আজ বংশীর জন্যে ভাত রাঁধে নি। সে কোথায় গেছে, ফিরবে কিনা—কিছু ঠাহর করতে না পেরে ভাত বসাতে পারে নি। আর তাছাড়া একটা কথা সে কিছুতেই বংশীকে বলতে পারছে না, আজ ঘরে চাল বাড়ন্ত।

: ভাত রাঁধিস নি?

কুইলি কিছু না বলে মুখ নিচু করে উঠোনের রোদ্দুরের ওপারে রাস্তার দিকে চলে যায়। তার পেছনে উধাও হয়ে যায় সিমলিও। বংশী কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কুইলি তাহলে আজ ভাত রাঁধে নি। কেন? ও কি জানতো না, সে আজ হালবলদ গাড়ি কিনে ফিরে এসে ভাত চাইবে? বাতাসী হলে ওর জন্যে ঠিক ভাত রেঁধে রাখতো। বংশীর মনে হলো, কুইলি ঠিক যেন বাতাসীর মতো নয়। কুইলি কুইলি! খিদের মুখেই তার এমনটা মনে হলো, বোধ হয়। কিছু করবার না পেয়ে সে ঘরের ভেতর গিয়ে চালের কলসীতে হাত ঢুকিয়ে দেখলো চাল নেই, খালি। ঘরে চাল নেই— কথাটা আগে জানাবে তো কুইলি? নাহ্

সত্যি, কুইলি ঠিক বাতাসীর মতো নয়। কুইলি বাতাসীর মতো হবেই বা কেন? ও তো বংশীর কেউ নয়। ও কেন ওর জন্যে অতশত করবে? কুইলি ওর জন্যে কি করেছে এবং এখানে কি করছে তার সবটা বংশী জানে না। বাতাসী ওর সঙ্গে ওর জমিনে যে গত ঢেলেছে, তা বংশী ভুলতে পারবে না কোনদিন। তাছাড়াও ওর কাছে বাতাসী স্বতন্ত্র। সে যে তার জীবনের প্রথম বর্ষার কালো কাজল মেঘ।

সে চলে গেছে। ওর পরনের শাড়িটা ঘরের কোণের দড়িতে এখনো পাট করে ঝোলানো রয়েছে। কুইলিই কি ভেবে ঝুলিয়ে রেখেছে। ওটা নিয়ে ওর মনে কি কখনো কিছু ভাব হয় না? ক্রোধ বা ঈর্ষা? বড়ো চাপা মেয়েমনিষ্যি কুইলি। কিছুতেই ওকে বোঝা যায় না। বাতাসীর শাড়িতে ধুলো জমেছে, ঝুলও লেগে আছে এক রাশ। তা যেন বাতাসীর স্মৃতির ওপর ধুলো আর মাকড়সার ঝুলের নীরব আস্তরণ।

বাতাসী থাকলে এতক্ষণে তার সামনে গরম ভাতের সান্‌কি ঠিক চলে আসতো। বংশী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাওয়ায় বসে বলদগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। ওরা খেজুর আর বাবলা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুকনো খড়গুলো খুব অলসভাবে চিবোচ্ছে।

পায়ের শব্দে সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো, ভাতের সানকি হাতে কুইলি তার দিকে আসছে। তার পেছনে তরকারির বাটি হাতে মধুয়ার বউ পুলি। তার পেছনে সিমলি। ওর কোলে মধুয়ার বছর খানেক বয়েসের ছেলেটা। কী সুন্দর মিষ্টি তার মুখ!

: বউ মধুয়া ভাইর জন্যে আজ ভাত-তরকারি রেঁধেছিলেন। তাই খেতে পেলি। না হলি তোকে—

বংশী ভুরু কুঁচকে কুইলির মুখের দিকে তাকায়।

: মধুয়া? মধুয়া ফিরেছেন নি কি?

: ইখোনো ফিরেন নি। মনে হয়নে, যে কুনোদিন ফিরতে পারেন। মামলা খতম হয়ে গেছেন।

আনন্দে, উত্তেজনায় বংশী উঠে দাঁড়ায়। কি করবে, সে খুঁজে পায় না।

: সত্যি বলছিস, কুইলি, মামলা খতম হয়ে গেছেন। মধুয়া আর ফেরার থাকবেন নি? যে-কুনোদিন ঘরে ফিরে আসবেন? মধুয়ার বউ, তুই উইকথা বলছিস? ঠিক শুনেছিস? কুনো ভুল হয়েন নি ত?

বংশীর একবার মনে হলো, সে কুইলির চুলের মুঠি ধরে ওকে তার চওড়া বুকের মধ্যে টেনে এনে একবারে পিষে মেরে ফেলে, একবার মনে হলো, কুইলির ভাতের সানকিটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাহা করে হেসে ওঠে পাগলের মতো একবার মনে হলো, সিমলির কোল থেকে মধুয়ার ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে আকাশের অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মনের খুশিতে ওকে

নিয়ে লোফালুফি খেলে আর চুমায় চুমায় ভরে দেয় দুধের গন্ধমাখা তার কচিকাঁচা মুখখানা।

: ই উঠানের রোদ্দুর, শুন্, মধুয়া ফিরে আসছেন।... ই-দু'পর বেলার হাওয়া, শুন্, মধুয়া ফিরে আসছেন। আমি বংশী কপালি। আমি শালা আর কাউকে ডর পাই না। ইবার আমি ই দুনিয়াটাকে উথাল-পাথাল করি ছাড়ি দিব।

বংশীর এই খ্যাপামি পুলি, কুইলি বা সিমলি কখনো দ্যাখে নি। ওরা ভয়ে দাওয়ার এক পাশে সরে যায়। বংশী একলাফে উঠোন পার হয়ে ছুটতে ছুটতে রাস্তাটাকে বিস্মিত করে এলোমেলো হাতে আগড় খুলি বেরিয়ে যায়। তারপর তার ভারি ভারি পায়ে রাস্তাটাকে লাথি মারতে মারতে সে ছুটতে থাকে একটা অশান্ত বেপরোয়া জানোয়ারের মতো। ওকে দেখে রাস্তার গোরু-ছাগলগুলো ভয়ে ছুটে পালাতে থাকে। ডোবার ধারের ব্যাঙগুলো তুড়িলাফ্ মেরে জলে ডুব দেয়। গাঁয়ের সন্ত্রস্ত মুরগীগুলো ভয়ার্ত আওয়াজ তুলে ঘরের ভেতর যায় সেঁধিয়ে।

বংশী জটার ডোবার পাড়ে পৌঁছে হাঁকার মেরে ডাকে: জটা, জটা, এ্যাই শালা জটা। ঘর থিকে বেরিয়ে আয়। মধুয়া আসছেন। এ্যাদ্দিন তোর যা হয়েন নি, ইবার তোর তা হবেন। হিম্মৎ থাকেন ত বেরিয়ে আয়। দেখবো, শালা তুই কেমন মরদের বাচ্চা।

মুখে আওয়াজ তুলে রাস্তা থু থু করে থুথু ফ্যালে বংশী।

জটার বউ ডোবার ঘাটে বেরিয়ে এসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

:উ ত ঘরে নেই।

:ঘরে নেই? কুথায় গেছে শালা গিধোড়?

: উ আর ইকটা 'বে' করতি গেছেন।

জটার বউ ভুল বলে নি। জটা আর একটা 'বে' করতেই গিয়েছিল। এবং বউকে জানিয়েই। কারণ অবিশ্যি একটি সে দেখিয়েছিল। জটা এই একটা ব্যাপার বেশ ভালোভাবেই পারে। যে-কোন কাজই সে করুক, ভালো কিংবা মন্দ; সব সময় তার একটা কারণ রেখে দিতে পারে ও। কি বংশীর জমিনের ব্যাপারে, কি নিজের দ্বিতীয়বার 'বে'-র ব্যাপারে। ইকটা হাবাগোবা মেয়েমনিষ্যি উর বউ। ভাঙাচোরা একটা কুঁড়েঘরই ছিল তার যথেষ্ট, সে আজ কোঠাঘরে বাস করছে। কোন অভাবই নেই ওর। জটা উকে কম সুখে রাখেন নি। কিন্তু জটা যা চেয়েছে ওর কাছ থেকে, সে তাকে তা দিতে পারে নি। মিত্যুর পর মনিষ্যির নরকে ঠাঁই হয়েন। নরকের যন্তন্না, উহ্ অসহ্য যন্তন্না। ছেল্যে না হলি উই যন্তন্না থিকে বাঁচার কুনো উপায় নেই। পরথমে জটা 'বে'-ই করতি চায়েন নি। বংশীর জমি চাষ করে যখন অবস্থা ভাল হতি থাকলেন, হাতে পয়সা হলেন কিছু, তখন উর 'বে' করবার বাসনা হলেন। উ গেরুয়া ছাড়লেন, মাথার জটাকে বিদায় দিলেন।

একদিন কপালিপাড়াকে বলে-কয়ে চাঁদকুসুমীর সদাকপালির সেজো মেয়েটাকে পসন্দ করে 'বে' করি নিয়ে এলেন। তারপর সাত বছর কেটেছেন। রুগ্ণ কালো বউটা এই সাত বছরে চার বার বিইয়েছেন। চারটিই মেয়্যে। শেষেরটি জন্মের পরই মরেছেন। ইখোন জটা তিন-তিনটি মেয়্যের বাপ। কিন্তু সদা কপালির মেয়ে উকে ইকটাও ছেল্যে দিতে পারেন নি। ছেল্যে না হলি উকে নরক থিকে বাঁচাবেন কে?

বউ বলেছিল: গাছ থাকলি ফল হবেন, তুই আর 'বে' করিস নি।

কিন্তু জটা কোনদিন কারো কথা শোনে নি। সে চাঁপাবনির নেশুড়ে পাঁচু কপালির বউকে ফুসলে হাঁসপুকুরের শেতলামায়ের থানে নিয়ে গিয়ে 'বে' করে ঘরে এনে তুলেছে। রুগ্ণ বউটা অনেক কান্নাকাটি করেছিল, বারণ করেছিল। কিন্তু জটা ওর কথা শোনে নি। চাঁপাবনির পাঁচু কপালি দিনরাত হাঁড়িয়া খায়। নেশার ঘোরে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বউকে 'পেহার' করেন। কাজকাম করে রুজিরোজগারে মন নেই। রাতদিন কেবল লিশা আর লিশা। ভাত দিতে পারেন না ছেলে বউকে। যেদিন পাঁচু নেশাভাঙ করতো না, ভালো থাকতো, জনমজুর খাটতে আসতো জলশিয়রের কপালিপাড়ায়। বংশীর জমিন হাতে আসায় জটার চাষের জমিন এখন বেড়ে গেছে। জটার জমিনে 'জন' খাটতো পাঁচু। কিন্তু সে একদিন কি দু'দিন। তারপরই কয়েক দিন পাঁচু হাঁড়িয়া খেয়ে বেহঁশ হয়ে পড়ে থাকতো ঘরের দাওয়ায়। বউ কেঁদে-ককিয়ে জটার কাছ থেকে নিয়ে যেত দুটো টাকা কিংবা এক কিলো চাল। জটা পাঁচুর বউকে সেই পরথম দেখে। গত মরশুমে পাঁচু ব্যামোয় পড়ায় ওর বউ শরীলভরা যৌবন নিয়ে খাটতে এসেছিল জটার জমিনে। জটা ওর চোখে শুধু ভাত-কাপড় নয়, গয়না আর কোঠাঘরের স্বপ্ন এঁকে দেয়। শেষে অবস্থা এমন হলো, পাঁচুর বউর দুঃখে রাতে জটার চোখে ঘুমই আসে না। বউকে সে বোঝায়: পাঁচুর বউ তোর ঘরে থেকে গায়ে গতরে খাটবেন, ধর্, তোর ইকটা নোকরানি, কত সুবিধা হবেন তোর — ভাব্ দি নি।

জটার বউ কেঁদে বলেছে: অনেক ভেবেছি গ। আমার অত সুবিধায় কাম নেই। ঘরের যা কাজকাম, 'উ' আমিই সোব্ করে দিব। তুই অন্য কুনো মেয়েমনিষ্যিকে ঘরে আনিস নি। জটা জানিয়ে দেয়, 'বে' উকে করতিই হবেন।

: আমার কথা না শুনে যদি ফের 'বে' করিস, তালে ঘরে ফিরে এসে তুই আমার মরা মুখ দেখবি।

জটা পাঁচুর বউকে 'বে' করে ঘরে এনে তুলেছে। তাকে তার বউর মরামুখও দেখতে হয়নি। জটা পাঁচুর বউকে হাঁসপুকুরের শেতলা মায়ের থানে নিয়ে গিয়ে নতুন করে 'বে' করে ওকে সরাসরি ঘরে তুলতে পারে নি। পরথম দিন-কয়েক উকে লিয়ে উ নানাখানে লুকিয়ে বেড়িয়েছেন। তারপর একদিন রাতের আন্ধারে উকে ঘরে লিয়ে এলেন।

ঘরে নিয়ে এলে কি হবে, জটার বউ দরজার খিল এঁটে বসে রইলো সারারাত।

: যেখানে খুশি লিয়ে যা উকে, আমি ঘরে ঢুকতে দিব নি তোর উই নোকরানিকে।

জটা অনেক কাকুতি মিনতি করতে থাকে। তাতেও যখন কাজ হলো না, তখন শাসাতে থাকে। শেষ রাতের দিকে কি হলো, ঠিক বোঝা গেল না, জটার বউ দরজা খুলে দিল।

: ঠিক আছেন। তুই তোর ইল পোকরানিকে লিয়ে ঘরে থাক্। আমি ঘর থিকে চলি যাব। তার আগে আমি গাঁয়ের কাছে বিচার দিব। দেখব, তুই কি করে উকে লিয়ে গাঁয়ে থাকিস।

চোখমুখ পাকিয়ে জটা বলে: গাঁয়ের কাছে বিচার দিবি? দে না, দে। যত পারিস, বিচার দে। মনে রাখিস, তা'লে ই ঘরে তোর আর থাকা চলবেন নি। আমার নামে মামলা করবি, ফের আমার ঘরে বাস করবি, উটি হবেন নি। বুঝলি?

জটার বউ দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলে: তোর ঘরেও থাকব নি, তোকেও উকে লিয়ে ঘরে থাকতি দিব নি।

জটা বউকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে রাখার চেষ্টা করে। বলে: শুধু ইকটা ছেল্যের জন্যে, বুঝলি, শুধু ইকটা ছেল্যের জন্যে। না'লে কি আমি ফের 'বে' করি। তোর শেষেরটা যদি ছেল্যে হতেন আর বেঁচে থাকতেন—

বউ বুঝতে চায় না। কিছুতেই কিছু বোঝানো গেল না ওকে। অন্য কোন মেয়েমনিষ্যি ওর সোয়ামিকে নিয়ে ঘর করবে, তাও আবার একই ঘরের ভেতর, ও কিছুতেই তা সইতে পারবে না। বলে: উ সোব্ তোর মন-ভুলানো কথা। উই কুচনী মেয়েমনিষ্যিটার শরীল তোকে লিশা ধরিয়ে দিয়েছেন। আমি বোকা-সোকা বলে কি উসোব্ বুঝিনি, লয়? আর আমাতে তোর মন নেই। ঠিক আছেন। আমাকে যখন তোর মন চায়েন না, আমি আর থাকব নি তোর ঘরে। তুই উই ঘর-পোড়ানি ডাইনিটাকে লিয়ে ঘর কর্। আমি মেয়েগুলানকে লিয়ে চলে যাচ্ছি।

: কুথায় যাবি? বাপের বাড়ি?

: জেনে তোর কাম কি? আমি যেখানে খুশি যাব। আর তোর সাথে আমার কুনো সম্পোক্ক নেই।

সত্যি, জটার বউর মুখটা ভারী বোকা-বোকা। মনে হয়, কোন ব্যাপারের প্রতি ওর কোন আগ্রহই নেই। কোন ব্যাপারই ওর মাথায় ঢোকে না। শুধু বেঁচে থাকতে হয়, তাই বাঁচা। সোয়ামির সোহাগ — উ ত দুগুণের পেয়োজন। পেয়োজন ফুরুলি যে-কে-সেই। কেউ কারো লয়। তাপ্পর বাঁচার জন্যেই নুন-ভাত যা হোক দুটি খেয়ে বেঁচে থাকতি হয়েন।

কিন্তু জটা যখন আর একটা মেয়েমনিষ্যিকে 'বে' করতে চাইলো, তখন সে বুঝতে পারলো, দুনিয়াটাকে সে যত সহজ মনে করে, ঠিক তত সহজ নয়। ওর ভেতর থেকে তখন যেন আর একটা মেয়েমনিষ্যি বেরিয়ে এসে রুখে দাঁড়ালো:

না। ই 'বে' আমি হতি দিব নি। তুই ইলকি-বিলকি বলে আমাকে যতই ভুলাবার চেষ্টা কর, আমি কিছুতেই ভুলব নি। তোর মনের বাসনা আমি ঠিক ধরে ফেলেছি।

মেয়েমনিষ্যির জাত যে ব্যাপারটা খুব সহজে বুঝতে পারে, জটার বউ তা শুরুতেই ধরতে পেরেছিল। আর ধরতে পেরেছিল বলেই গোড়া থেকেই সে বেঁকে বসেছিল।

জটা হাত নেড়ে হেঁকে বলেছিল : যা না, যা। যেখানে খুশি চলি যা।

: যাব নি ত কি তোর কাছে থাকব? যেখানে খুশি চলি যাব।

জটা ভেবেছিল, বউ মুখে যা-ই বলুক, হাবাগোবা মেয়েমনিষ্যিটা শেষ পর্যন্ত কোথাও যাবে না। তার এই 'বে' ওকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু ভোরের কাক ডাকবার আগেই জটার বউ মেয়েগুলোকে ঘুম থেকে টেনে তুলে যখন ঘর থেকে সত্যিসত্যিই বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, একটা অজানা আশঙ্কায় জটার মনটা কেমন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল।

সে বউর সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে খুব নরম নরম গলায় বলে : বউ, ইকটা ভুল করে ফেলেছি, আমাকে তুই মাজ্জনা কর্। ভুল করলি কি উর মাজ্জনা হয়েন না?

বউকে নিয়ে জটা এতদিন ঘর করেছে, কিন্তু ওকে চিনতে পারে নি। আসলে, মেয়েমনিষ্যি সম্পর্কে জটা কিছুই জানে না। যেটুকু জানে, আজ বুঝতে পারলো, তা ভুল। শুধু ভাতকাপড়েই মেয়েমনিষ্যি ঘর করতে পারে না, তার ঘর করার জন্যে প্রয়োজন অন্য কিছু, যা বোঝার সাধ্য জটার নেই।

শেষ পর্যন্ত জটা বউকে আটকাতে পারে নি। বউ ওর চোখের সামনে মেয়েগুলোকে এক দঙ্গল পশুশবকের মতো তাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

এ-বছর কালবোশেখীর ঝড় বেশ দেরিতে উঠলো। একেবারে বোশেখের শেষে। ফাল্গুনে একবার সামান্য ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর পুরো চোত-বোশেখ গেছে খরায়। আজ বিকেলের মুখে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে হাঁড়িচাঁছা কালো মেঘ একেবারে দিগন্ত জুড়ে ঠোঁটে রোদ্দুরের হাসি নিয়ে মাথা তুলে জটলা পাকাতে লাগলো। ঝড় উঠবে আঁচ করে কুইলি আগেভাগে বলদ দুটোকে নতুন-তৈরি চালার নিচে বেঁধে রেখে এসেছিল। আগের চালাটা ছিল না। বংশী আগের জায়গাতেই খড় কিনে নতুন চালা বেঁধে দিয়েছে বলদ দুটোর জন্যে। গত সপ্তাহে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল রতন সরকারের দু'শো নারকেল ললাটের হাটে পৌঁছিয়ে দিতে। ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আজ কুইলি মাছ-ভাত রেঁধে রেখেছিল।

ডোবায় একটা ডুব দিয়ে এসে খেতে বসে যায় বংশী। কুইলি দরজার কাছে বসেছিল। খেতে খেতে মুখ না তুলেই বংশী ওকে জিজ্ঞেস করে : মধুয়া এলেন?

: না—

: মধুয়ার বউ কি বলেন ?

: উ আর কি বলবেন ? রোজ উর জন্যে ভাত-মাছ রেঁধে রাখেন ?

: ছাড়া পেয়েছেন দিন-পনেরো হলেন। তাই লয় ?

: হঁ, তা পনেরো দিন ত হবেন।

কিছুক্ষণ চুপ। দূর আকাশে মেঘ ডাকলো গুড়গুড় গুড়গুড়। বংশী মুখ তুলে উঠোনের রোদ্দুরের দিকে তাকালো। রোদ্দুরের রঙে যেন ন্যাবা লেগেছে। বংশী বলে : ঘরে যা। ঝড় উঠবেন।

কুইলি দরজার কাছে বসেছিল। বসেই রইলো। যেন ওর কোন তাড়া নেই। হাওয়া দিচ্ছিল একটু। এবার তাও মরে গেল। ডোবার ধারে ব্যাঙ ডেকে উঠলো।

: কুইলি—

: উঁ ?

: বলদ দুটোর চালা উড়ে যাবেন নি ত ?

কুইলি নতুন চালার দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। বলদ দুটো চোখ বড়ো-বড়ো করে খড় চিবোচ্ছে।

: ঘরের চালেও লতুন খড় দিয়েছি—

কুইলি নীরব।

: বিষ্টিও দরকার। বোশেখ শেষ হতি চললেন—

বদনার জল গলায় ঢকঢক করে ঢেলে দিয়ে বংশী মুখ ধুতে উঠে যায়। বলতে বলতে যায় : একটু 'বতর' হলেই হাল নামিয়ে দিব জমিনে—

আকাশের রং হয়ে আসছে ঘোর আঁধার বর্ণ। ভাঁজে ভাঁজে মেঘ [illegible] পাকাচ্ছে। যেন থেকে থেকে কাঁটা দিচ্ছে আকাশের গা। ভুরু-কোঁচকানো হাঁড়িচাঁছা মেঘ আকাশের অনেকদূর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসেছে। এবার তা যেন সূর্যকে কালো কম্বলে মুড়িয়ে দিল। দাওয়ার দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে বংশী একটা বিড়ি ধরালো। সমুদ্দুরের ঢেউয়ের মাত্‌লামির আওয়াজ শোনা যায়। আকাশে মেঘ দেখলে সমুদ্দুরের ঢেউগুলো বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে ওঠে। যার যা স্বভাব। সেই ছোটবেলা থেকে বংশী শুনে আসছে কথাটা। মাছ কেন উজান ঠেলে ছুটে চলে ?... সমুদ্দুরের ঢেউ কেন মেঘ দেখলে আসমানের দিকে উলসে উঠে ?... মাটি কেন চায় আসমানের পানি ? ই সোবের ইকটাই জবাব। যার যা স্বভা[illegible]। গাছের পাতা ঝরেন, ফের লতুন পাতা ধরেন। মনিষ্যিরও বয়েস বাড়েন। কিন্তুক স্বভাব বদলায় না। উই বাপ-ঠাকুরবাপের কালে যেমনটা ছিলেন, তেমনটাই আছেন। এমন যে এমন সামনের খেজুরগাছের পাতাটাকে দ্যাখ্! মেঘ দেখে ঠিক উদিনের মতোই নাচ্‌তি লেগেছেন। ভগমানের কী কল!

: ঘরে গেলি নি ? দেখছিস নি ঝড় উঠবেন ?

কুইলি তার বড়ো-বড়ো কালো-কালো চোখ তুলে বংশীর দিকে তাকালো। চোখ নামিয়ে বাইরের পিরথিবির মতো থম মেরে বসে রইলো দোরগোড়ায়।

: কি রে? খাওয়া-দাওয়া করবি নি?

উহ্, আমার খাওয়া-দাওয়ার ভাবনায় উর পেটের ভাত যেন চাল হয়ে যাচ্ছেন! আদিখ্যেতা!

: আজ তা'লে তুই ইখানেই খেয়ে নে।

কুইলির মনে মনে একটা চাপা হাসি হিলহিলিয়ে বিলি কেটে কোন্ গভীরে মিলিয়ে যায়।

: ঢাকা খুলে হাঁড়ির তলানিটা দেখেছিস ইকবার? কুথাও ইকটাও দানা পড়ে নেই।

আসমান আঁধার করে ঝড় উঠলো। যেন ডাকাত পড়লো পিরথিবিতে। উ কিছু লয়। মিলনের আগে আসমানের খ্যাপামি। আহা, কতদিন পরে পিরথিবিতে বিষ্টি হবেন গ। বসুমাতার শরীল শীতল হবেন। চারদিকের গাছগাছালির ডালপালাগুলো পাগলামি শুরু করে দিল। যেন কাঁটা দিল বসুমাতার শরীলে। ঘরের চাল ককিয়ে কেঁদে উঠলো ভয়ে। বলদ দুটো চোখ গোল-গোল করে গায়ে-গা লাগিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে। ওদের ওপরের চালটা বার বার নাচতে লাগলো অবোধ পাগলের মতো। দক্ষিণের দাওয়ার ধারের মানকচুর পাতায় শব্দ করে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আসমান-জমিন ফালা-ফালা করে বিদ্যুৎ চমকালো। কাছেই কোথাও বাজ পড়লো, ত্রিভুবন কাঁপিয়ে।

কুইলির হঠাৎ মনে পড়লো, বংশীর এঁটো সান্‌কিটা ধোওয়া হয়নি। সে ঘরের ভেতর থেকে সান্‌কিটা নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘাটের দিকে চলে গেল। বংশী দেখলো। এখনই কি সান্‌কি ধুতে ঘাটে না গেলে চলত নি? কুইলিকে উকথা বলে কুনো কাম হবেন নি। উ বংশীর কুনো কথা কুনোদিন শুনেছেন যে, শুনবেন? উ ইকটা পাথর মেয়েমনিষ্যি। পাথরের মতন শক্ত উর শরীল, পাথরের মতন কঠিন উর মন। কুইলি বাতাসীর মতন লয়। কুইলি কুইলি, বাতাসী বাতাসী।

বেশ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। উঠোন বেয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। বুদ্‌বুদে বুদ্‌বুদে বসুমাতার তৃপ্তির দুর্লভ সোয়াদ।

বৃষ্টিতে ভিজে সপ্‌সপে শড়িতে ধোওয়া সান্‌কি হাতে ঘাট থেকে কতক্ষণ পরে ফিরে এলো কুইলি। ওর দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারে না বংশী। কুইলিও বংশীর দিকে চেয়ে থাকে। ওরও চোখে পলক পড়ে না। কুইলি ওর শরীল নিয়ে কখনো লজ্জা পায় না। উ অন্য মেয়েমনিষ্যির মতন লয়। উর লজ্জা-সরম ইকটু কম। ভিজা কাপড়ের স্বভাবটা ভারী মন্দ। উ মেয়েমনিষ্যির শরীলটা ইকটুও রাখঢাক না করে একেরে ফাঁস করে দেয়। বংশী ডাকে: কুইলি—

ওর গলায় কেমন যেন বৃষ্টির নেশা।

: দাঁড়া। কাপড়টা ছেড়ে আসি।

কুইলি ঘরের ভেতর নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। বংশীর চোখ দরজার দিকে বারে বারে গিয়ে ফিরে আসে। কুইলি বেরোয় না। তার আসতে দেরি হচ্ছে। কুইলি ইতো আসতি দেরি করেন ক্যানে?

শুক্‌নো শাড়ি শরীলে ভালো করে পেঁচিয়ে পরে কুইলি বেরিয়ে আসে। বংশী আগাপাশতলা ওকে দ্যাখে। কুইলি সামনে এসে দাঁড়ায়। পাথরের মেয়েমনিষ্যির ইকটা মজবুত শরীল। উর শরীলে কি কুনো আকুতি নেই। সবটাই পাথর?

: কি বলছিস?

: ঘরে কুনো লিশা-টিশা নেই রে, কুইলি? বংশী কুন্ লিশার কথা বলছেন? কুইলি একটু থেমে বলে : না। নেই—

স্পষ্টতই বংশী ওর জবাবে খুশী হতে পারলো না। নেশা সে সচরাচর করে না। কিন্তু খুশিতে মনটা যখন উল্‌সে ওঠে, তখন ইক্‌টু লিশার জন্যে মনটা বড়ো উশ্‌খুস্ করেন। মনের কুনো দোষ নেই। বাইরের চারদিক এমন সব কাণ্ড বাধিয়ে দেন—হাওয়ার ছোঁয়াচ লেগে মাঠের ঘাসগুলান যেমন শিউরে-শিউরে ওঠেন, মনের ভেতরটার তেমনি কাঁটা দিয়ে ওঠেন। তখন ইকটু লিশা করবার বাসনা হয়েন।

কুইলির পিঠের ওপর লুটিয়ে-পড়া ভিজে চুলের একটা গন্ধ আছে। ভিজে চুল ওর ভারী পাছা ছাপিয়ে নেমে এসেছে। বংশী ওর ভিজে চুলের সেইগন্ধ পায়। গন্ধ পায় শুকনো কাপড়ের নিচে ওর ভিজে শরীলেরও। কুইলি ওর ঘোর-লাগা চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যায়। দাওয়ার খুঁটিতে পিঠ দিয়ে দূরের মাঠের দিকে চেয়ে বসে। একবার বিদ্যুৎ চম্‌কালো, কুইলির মুখে লাগলো আলোর খুশির ছোঁয়া। কুইলিকে ঠিক কুইলির মতো নয়, একটু অন্য রকম লাগলো বংশীর। বৃষ্টি পড়ছে। তারই মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আলো এসে পড়ছে ওর মুখে। মুখের একপাশে বিজলির আলো, অন্যপাশে অন্ধকার। কুইলির মুখখানা কেমন যেন বড়ো রহস্যময় মনে হয় বংশীর। ওর মনে হয়, কুইলি যেন ঠিক কপালিপাড়ার কেউ নয়, বোধ হয়, এ পিরথিবিরও কেউ নয়; হয়তো আসমানের কেউ কিংবা আসমানের ওপারে যে দেশ আছে, সেই দেশের। বংশী মাঝে মাঝে কুইলির মুখের দিকে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি-ঘেরা মাঠের দিকে, মাঝে মাঝে উঠোনের সরে-সরে-যাওয়া জলের দিকে তাকায়। হঠাৎ ডাকে : কুইলি—

কুইলি চমকে তাকায়।

: আচ্ছা, মধুয়ার কি হলেন, বল্ দি নি। মামলা খতম হয়ে গেছেন। উর ত আসতি আর কুনো বাধা নেই। তালে এ্যাদ্দিন আসছেন নি ক্যানে?

সেদিন দুপুরে মধুয়া আসছে শোনামাত্র তার জমিন ফিরে পাবার সহজ সম্ভাবনায়

তার বুকের ভেতরে কেমন একটা খুনের নেশা জেগে উঠেছিল। উত্তেজনার মাথার সে পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল। জটা উদিন ঘরে ছিলেন নি, কপাল ভাল, না'লে উদিন ইকটা খুনাখুনিহ্ হয়ে যেতেন।

জমিন বলতে আমার ত উইটুকুই মাত্তর পাঁচ বিঘে লাখেরাজ। সমুদ্দুরের গেরাস থিকে কেড়ে এনে উতে ফসল ফলাতি কত সন লেগে গেছেন, কত গতর ঢালতি হয়েছেন। মা-বাপ-ঠাকুর বাপের গতর মিশে আছেন উতে। উই জমিন টুকুনের সাথে আমার যে পেরানের সম্পোক্ক। আমার বুকের কল্জে। উই জমিন জটা 'লাঙল যার জমিন তার' আন্দুলণের ফাঁকে ভিতরে-ভিতরে নিজের কব্জা করি লিবেন আর উকে গাঁ থিকে উৎখাত করি ছাড়বেন—উ হবেন নি। আমি শালা বংশী কপালি। শরীলের খুনের শেষ বিন্দু তক লড়ব। ছাড়ব নি। হুঁ— কুইলি একটু দূরে খুঁটিতে পিঠ দিয়ে বসে আছে। যেন মেয়েমনিষ্যির একটা পাথরের মূর্তি। এর একটা গালে, কপালের একদিকে বিদ্যুতের ঝলক পিছলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কুইলি খুঁটিতে পিঠ দিয়ে বসে বৃষ্টি দেখছে। বছরের প্রথম বৃষ্টি। বংশীর কথাগুলো সে শুনতে পেয়েছে কিনা, বোঝা গেল না।

: কুইলি—

কুইলি ওর মুখের তাকায়।

: মধুয়ার আসতে দেরি হচ্ছেন ক্যানে, বল্ দি' নি। মধুয়ার বউ তোকে কিছু বলেন না ?

: হুঁ।

বংশী সোজা হয়ে বসে।

: বলেন ? কি বলেন ? মধুয়া কবে আসবেন ?

: মধুয়াভাইর কথা বউ কিছু বলেন না। কবে আসবেন, উকথাও উ জানেন না। রোজ উ ভাতের হাঁড়ি লিয়ে বসে থাকেন।

আকাশটা আবার আঁধার করে এলো। আরো বৃষ্টি হবে, মনে হয়। মেঘের রং দেখে তখনই মনে হয়েছিল, আজ ডোবাবে। মাঠে জল দাঁড়িয়ে গেছে। হাওয়ার তোড় অবশ্য কমেছে একটু। বংশী আবার দেয়ালে পিঠটা এলিয়ে দেয়।

কুইলি বংশীর দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়লো। তবু কুইলি চোখ নামায় না।

:কিছু বলবি ?

আকাশে বিদ্যুৎ চম্কালো। একটা বাজ পড়বে। বিদ্যুতের ঝলকে কুইলির মুখটাকে ভীষন কঠিন দেখায়। বেশ জোরে বাজ পড়লো একটা। তালবাঁধের কোন তালগাছে পড়লো কি না কে জানে।

: ধর্, মধুয়া ভাই এলেন নি। তা'লে তোর জমিন কি চিরদিন জটার কবজায় পড়ে থাকবেন। কুনোদিন ফেরত হবেন নি ?

বংশীর গলায় তার কথাগুলো যেন একটু জড়িয়ে যায়। বলে : মধুয়াই উকে দেখতি বলে ছিলেন। আজ জটা যদি ফেরত না দেন, মধুয়াকেই আগে বলতি হবেন নি ?

: বেশ। তুই মধুয়াভাইকে বললি, জটা আমার জমিন ফিরত দিচ্ছেন নি। তোর কথামতো মধুয়াভাই জটাকে বললেন, উর জমিন উকে ছেড়ে দে। ধর, জটা মধুয়া ভাইর কথা শুনলেন নি। তখন কি করবি তুই ?

: আমার জমিনের বেবস্থা মধুয়াই করবেন।

: ক্যানে ? তার কুনো হিম্মৎ নেই ?

বিদ্যুতের ঝলায় আকাশটা যেন ফালা-ফালা হয়ে গেল। বাজের শব্দে মাটি কেঁপে উঠলো। বংশী শিরদাঁড়া সোজা করে বসলো। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো মানকচুর পাতায়, খড়ের চালে, উঠোনে, সামনের মাঠে। বংশীর মনে হলো, তার বুকের ভেতর একটা লাল গনগনে আগুনের গোলা যেন বিষম ক্রোধে ফুঁসছে। ঝড়ের হাওয়া লেগে এখুনি বুঝি তার লাল লক্‌লকে জিভ দিয়ে তার কল্‌জেটা পুড়িয়ে দেবে।

বংশী দেশলাই জ্বেলে একটা বিড়ি ধরালো। বললো : ঠিক আছেন।

: কি ঠিক আছেন ?

: মধুয়া আসুক বা না অসুক আমার জমিন আমি চাষ করব। মধুয়ার পথ চেয়ে আমি আর বসে থাকব নি। দেখি, কে আমাকে রুখেন ?

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে তার গলা দিয়ে কেমন একটা গরগর আওয়াজ বেরিয়ে এলো। নিজেই সে চমকে উঠলো তার গলার ওই আওয়াজে। গলার এই আওয়াজ সে শোনে নি অনেক দিন। আগে যখন ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইতো ওব বুকটা, এমনি একটা আওয়াজ গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতো। হিং‌স্র জানোয়ারেরা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে এমনি করে নখ দিয়ে পায়ের তলার মাটি আঁচড়ায়। ডাঙায় শুয়ে কুমীর শিকার ধরবার লক্ষ্যে জলে নামবার আগে লেজ আছড়ায় এমনি করে। হিম্মৎ ? বংশীকপালির হিম্মৎ নেই ?

উপরের আসমানকে পুছ কর্, জমিনের মাটিকে পুছ কর্, সামনের বালিয়াড়িকে পুছ কর। বংশী কপালি খেপলি মাটি কাঁপেন, মেঘ ডাকেন আসমানে। কুইলি উকথা জানেন না, বাতাসী জানতেন। জটা ইক্‌টুকুন্‌টাক্ জানেন, উদিন চন্নপুরের রাস্তায় দেখেছেন, সোব্‌টা জানেন না।

বংশীকপালি খেপলি ইকটা জানোয়ার হয়ে যায়েন। বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ সরে গিয়ে একটু আলো ফুটছে। হঠাৎ বংশী কুইলিকে জিজ্ঞেস করে : জটাকে দেখছি নি ক'দিন।

কুইলি এখন ঘরে যাবার কথা ভাবছে, বোধ হয়। সে বংশীর কথাটা যেন শুনতে পায় নি।

: উদিন উর বউ বললেন, জটা নি কি ফের ইকটা 'বে' করতি গেছেন।

: উ ফের ইকটা 'বে' করেছেন। চাঁপাবনির পাঁচু কপালির বউকে।

: শালা গিধোড়। হাতে পয়সা পেয়ে নসীগঞ্জের হাট থিকে গোরু-ছাগল কেনার মতন উ ইখোন বউ কিনতি লেগেছেন নি কি রে?

: বউ গাঁয়ের কাছে বিচার দিয়েছেন। তিনদিন হলেন মেয়্যেগুলান লিয়ে উ ঘনু কাকার ঘরে আছেন। আজ সন্ঝা বিলা ঘনুকাকার দাওয়ায় উর বিচার হবেন।

আজ দশ সন হলো, জটাই গাঁ-বুড়ো রয়েছে। সেই বিশুকাকা মারা যাবার পর থেকে। আজকাল জটা গাঁ-বুড়োর কোন কাজই করে না। কপালিপাড়ার কেউ ওকে গাঁ-বুড়ো বলে আর মানেও না। ঘনুকাকা গাঁ-বুড়ো নয়। তবু বয়েসে কপালিপাড়ায় সবার বড়ো বলে ইদানীং গাঁ-বুড়োর সব কাজ ওকেই করতে হয়। ওর কথা সবাই মানেও।

সন্ধ্যের আগে থেকেই এক-এক করে কপালিপাড়ার সবাই জমতে থাকে ঘনুকাকার দাওয়ায়। সন্ধ্যের মধ্যেই সবাই এসে গেল। আসে নি শুধু জটা আর বংশী। বংশী না এলেও চলবে। কিন্তু জটার তো আসা চাই। বিচার তো ওকে নিয়েই। একটা বউ থাকতে ও আর একটা 'বে' করেছে। তাও ভিন গাঁয়ের অন্য জনের বউ। তার আবার সোয়ামি বেঁচে। সোয়ামি ওকে ছেড়ে চলে যায় নি, তাড়িয়েও দেয় নি। চাঁপাবনির পাঁচু কপালি জটার জমিনে কাম করতে আসতো চাষের সময়। যেদিন পাঁচু আসতো না, সেদিন ওর বদলে আসতো ওর বউ। কোনদিন কাম করতে, কোনদিন মজুরি নিতে। বউটা তখনই চোখে পড়ে যায় জটার। জটা ক'দিন আগে ওকে নিয়ে পালিয়ে এসে হাঁসপুকুরের শেতলার থানে 'বে' করে ঘরে এনে তুলেছে। তিন-তিনটে মেয়্যে নিয়ে বউটা ঘর থেকে বেরিয়ে ঘনুকাকার ঘরে এসে উঠেছে। সবাই ভেবেছে, জটা বউকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিন-তিনটে মেয়্যে হয়েছে, ছেল্যে হয়নি একটাও—এই তার অপরাধ।

ছেল্যে হওয়া বা মেয়্যে হওয়া—উ কি মনিষ্যির হাত? ই কথা কি জটা বুঝেন না? ঠিক বুঝেন। আসল কথা ভেন্ন। পাঁচু কপালির বউর শরীলের লচক উর চোখে লিশা ধরিয়েছেন। বয়েস কম হয়েন নি জটার। দু'কুড়ির ঘর ছাড়িয়ে আড়াই কুড়ি ছুঁই-ছুঁই। ই বয়েসে মেয়্যে মনিষ্যির শরীলের দিকে পুরুষ মনিষ্যির ঝোঁক ইকটু বেড়েই যায়েন। গেরুয়া-পরা সাধুপুরুষ কপালিপাড়ার জটাধারী বাবার আজ কী দুগ্গতি হয়েছেন গ। বিল্লি খুঁজেন মাছের জিম্মাদারি। না'লে সুবিধার হবেন ক্যানে? মধুয়া উকে চিনতি লারলেন, চাঁপাবনির পাঁচু কপালিও উকে চিনতি লারলেন। মধুয়া উকে দিলেন বংশী কপালির জমিনের জিম্মাদারি আর পাঁচু কপালি নিজের বউকে উর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন পয়সা কামাতি। জমিন আর মেয়্যেমনিষ্যির

স্বভাব ইক। হাত বদ্‌লে চলি যান ইক হাত থিকে ভেন্ন হাতে। সাধুর গেরুয়া অঙ্গ থিকে লিশার তোড়ে উড়ি যায়েন।

ঘনুর দাওয়ার মাঝ-বরাবর হ্যারিকেন জ্বলছে একটা। একপাশে কপালিপাড়ার পুরুষ মনিষ্যিরা বসেছে। সবার আগে বয়োজ্যেষ্ঠ ঘনু কপালি। দোরের সামনেটা ফাঁকা। ওধারে বসেছে কুইলি, পুলি, রাখু কপালির বউ, ঝড়ু কপালির বউ। আর একেবারে দেয়ালের গা ঘেঁষে বসেছে জটার বউ আর ভয়ার্ত তার তিনটি মেয়ে। ধাড়ি জননীর গা ঘেঁষে যেন তিনটি পশুশাবক, যাঁরা জানে না ওদের কপালে কি আছে।

: জটা ত এলেন নি।

হতাশভাবে ঘনু বলে।

মেঘু বলে : বোধয় জানতি পেরেছেন, উর আজ্ঞ বিচার হবেন।

ঝড়ু বলে : বোধয় ক্যানে? উর দোষের কথা উ ভালভাবেই জানেন। উ যে আসবেন নি, উ ত জানা কথা।

: তা'লে কি করে উর বিচার হবেন?

ঘনু বলে। সঙ্গে সঙ্গে চড়া গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে মেঘু : তা'লি কি উর বিচার হবেন নি?

উঠোনের ওদিকটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে উৎসুক কৌতূহলের সঙ্গে লোকটাকে চিনবার চেষ্টা করে। একটু পরে আলোর পরিধির মধ্যে এসে দাঁড়ালো বংশী। বংশীকে কেউ এখানে প্রত্যাশা করে নি। ওকে 'মিটিনে' আজ্ঞ ডাকাও হয় নি। কুইলিও বংশীকে আসতে বলে নি। তবু সে এসে হাজির। বংশীকে আজ্ঞ এখানে দেখে সে মনে মনে বিপদ গনলো।

: এই-যে বংশী, আয়, বোস্—

ঘনু ডাকে।

কোন কথা না বলে বংশী মেঘুব পাশে বসে পড়ে।

ঝড়ু বংশীকে লক্ষ্য করে বলে : শুন্ বংশী; জটা চাঁপাবনির পাঁচু কপালির বউকে ফুস্‌লিয়ে লিয়ে পালিয়ে এসেছেন। শুনা যায়েন, উ নাকি বউটাকে ফের 'বে' করেছেন। ঘরের বউটাকে আর উর মেয়্যেগুলাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বউ তার মেয়্যেগুলকে নিয়ে ঘনুকাকার ঘরে এসে উঠেছেন। বউ বিচার দিয়েছেন। বিচারে জটা আসেন নি। উ যে আসবেন নি—উ ত জানা কথা। ঠিক লয়?

বংশী ঘনুর মুখের দিকে তাকায়। ঘনু বলে : না এলে উর বিচার কেমন করে হবেন?

: তা'লে কি উর বিচার হবেন নি?

মেঘুর সেই এক কথা। কোন নড়চড় নেই। পুলি এতক্ষণ কোন কথা বলে

নি। জটার বউ আর ওর মেয়েগুলোকে দেখছিল। বলে : বউটা আর মেয়্যেগুলানের গতিক কি হবেন তা'লে?

রঘু বসেছিল চুপচাপ। উঠে দাঁড়ায়।

: উকে ধরে লিয়ে আসতি হবেন। আয়, আমার সাথে কে যাবি আয়।

মেঘু বলে : আমি যাচ্ছি—

ঝড়ু বলে : আম্মো যাচ্ছি—

বংশী উঠে দাঁড়ায়। বলে : আম্মো—

ঘনু এবার বাধা দেয় : না না। বংশীর যাওয়া ঠিক হবেন নি। বংশী তুই শান্ত হয়ে বস্—

ওরা তিনজন জটাকে নিয়ে আসতে গেল। বংশী অনিচ্ছায় বসে পড়লো। কুইলি সব দেখলো, কানে কানে কি যেন বললো পুলিকে। জটার বউ চুপচাপ বসেছিল এতক্ষণ। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো। সবাই ওর দিকে তাকায়। ও চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘনুকে ডাকে : ঘনুকাকা—

: কি বলছিস, বল্? কাঁদছিস ক্যানে?

: উদের বলে দে, উরা যেন উকে মারধর না করেন।

সবাই এ-ওর মুখ-চাওয়াচাউই করতে লাগলো।

: না না। তুই কুনো ভাবিস নি। উরা জটার গায়ে হাত দিবেন্ নি।

ঘনুর কথার সবটা থাকে নি। জটাকে ওরা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো। নিয়ে তো এলো। কিন্তু জটা কিছুতেই দাওয়ায় উঠলো না। উঠোনে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘনু বললো : উ হয়েন না, জটা। উভাবে বিচার হবেন নি। তোকে দাওয়ায় উঠে সোবার সাথে বসতি হবেন। একঘরে হলি তখন লঁয় দাওয়ায় উঠবি নি।

সবাই সবাইর মুখের দিকে তাকায়। ঘনুর মনে কি আছেন? উ কি আগেই ঠিক করে ফেলেছেন, জটাকে একঘরে করে কড়া সাজা দিবেন?

ঘনুর মুখের দিকে চেয়ে বসে ছিল সবাই। সবাই আজ দেখবে, ঘনু কিভাবে জটার বিচার শুরু করে। কিন্তু ঘনুকে জটা সে সুযোগ দিল না। সে আগেই ঘনুর দিকে ছুঁড়ে দিল তার রুক্ষ গলার প্রশ্ন : বল্, আমাকে ইভাবে উরা ধরে লিয়ে এলেন ক্যানে?

: আজ তোর বিচার হবেন। উ কথা জেনেও তুই আসিস নি ক্যানে?

ঘনু শান্তগলায় বলে। জটা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় : উ আমার মরজি।

জটার বউ ঝড়ুর মাসতুতো বোন। ও চড়া গলায় বলে : বিচারে আসামী যদি না আসেন, তা'লে উকে ইভাবেই ধরে লিয়ে আসতি হয়েন।

: কে আসামী?

জটা এবার ঝড়ুর মুখের দিকে তাকায়।

: ঝড়ু! খুব ত বিচার করতি শিখেছিস! আমি তা'লে তোদের বিচারের আসামী! তা'লে বল্ তোরা, আমার দোষটা কী।

: দোষ?

মেঘু বলে : দোষটা কী, উই যে দোরের উধারে বসে আছেন যে মেয়্যেমনিষ্যিটা পাশে তিনতিনটা বাচ্চা মেয়্যে লিয়ে উকে পুছ্ কর।

জটার উকে কুনো কথা পুছ্ করার হিম্মৎ নেই। জটার বউও লজ্জায় কুনো কথা বলতি লারলেন।

ঝড়ু বলে; তোর বউ থাকতি তুই চাঁপাবনর পাঁচুর বউকে ঘর থিকে কেড়ে লিয়ে এসে 'বে' করেছিস।

: হঁ। করেছি। উ আমার নিজস্ব বেপার। হিম্মৎ থাকে ত—

জগা হঠাৎ সবাইকে ঠেলে উঠোনের কাদার মধ্যে নেমে যায়। ক্ষিপ্ত গলায় বলে: হিম্মৎ? হিম্মৎ দেখাচ্ছিস? নিজস্ব বেপার? তা'লে নেমে আয়! নেমে আয় শালা, দেখি তোর কত হিম্মৎ! শালা পরের বউকে কেড়ে লিয়ে এসে বলছিস কিনা নিজস্ব বেপার!

গজা শিবু নাড়ু জগাকে ধবে নিয়ে দাওয়ায় বসায়। ঘনু শান্ত গলায় বলে: জটা, তুই গাঁ-বুড়ো হয়ে কামটা ভাল করিস নি—

: ক্যানে? গাঁয়ে কি আগে এমন কাম কেউ করেন নি নিকি? জটা তার চোখ দুটো বড়ো-বড়ো করে ঘনুর দিকে তাকায।

: গাঁয়ে এমন কাম কেউ কুনোদিন করেন নি, তুই যা করেছিস।

: আলবাৎ করেছেন। বংশী পরাণের বউকে লিয়ে ঘর করেন নি?

: এ্যাই!

বংশীর হাত দু'টো শক্ত হয়ে সমুদ্দুরের কাঁকড়ার দুটো দাড়ার মতো জটার গলার দিকে এগোতে থাকে।

: বংশী ভাই!

কুইলি শাসিয়ে ওঠে।

: বংশী!

ঘনু শাসিয়ে ওঠে।

জটা থামে না। সে আরো প্রমাণ দেবে। সে তারপর কুইলির দিকে আঙুল তুলে বলে: ই যে কুইলি, উ কে? উ সোয়ামির ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসেন নি? উ ইখোন বংশীর-ঘরে থাকেন কিনা?

বংশী যেন কী বলতে যাচ্ছিল। কুইলি ওকে থামিয়ে দেয়: তুই থাম্, বংশীভাই, আমাকে বলতি দে—

কুইলি একটু এগিয়ে আসে। পিঠের এক ঢল চুল বাঁহাতের মুঠোয় পুরে মাথার ওপরে নিয়ে বেশ শক্ত করে একটা গিঁট দেয়।

: জটা ভাই আমার সম্পর্কে যা বললি, উকথা কপালিপাড়ার ইকমাত্র তুই-ই বল্‌তি পারিস। ক্যানে বললি, উকথা আমি জানি, তুইও জানিস। কিন্তুক তুই জানিস না, আমি বংশীভাইর ঘরে থাকি না। হঁ, থাকতাম, বংশীভাই যখন আসেন নি। থাকতাম, মধুয়া ভাই আমাকে থাকতি বলেছিলেন।

জটা তার দাঁতগুলো বের করে বিশ্রীভাবে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে : বাজে কথা বল্‌ছিস ! মধুয়া অনেকদিন নিপাত্তা।

: হঁ, নিপাত্তা। কিন্তুক মধুয়াভাইর বউ জানেন, উ ঘরে আসেন, গাঁয়ের সোব্ খবর লিয়ে যান। বউকে পুছ্ কর, মধুয়াভাই আমাকে বংশীভাইর ঘরে থাকতি বলে গিয়েছেন কিনা। ক্যানে বলে গিয়েছেন জানিস ? না'লে তুই বংশীভাইর ঘরটাও উর জমিনের মতন গিলে খেতিস। খাঁটি কথা বলি দিলাম।

জটা কী বলতে যাচ্ছিল। কুইলি ওকে এক ধমক লাগায়। কুইলির ধমকে সবাই চমকে ওঠে। বংশীও একবার কুইলির মুখের দিকে তাকায়। কুইলি বলে চলে : জরিপের সময় আমি বংশীভাইর ঘর-বাস্তুভিটা বর্গা লিখাই নি, তুই যেমন ওর জমিন বেইমানি করে লিখায়ে লিয়েছিস।

জটা বিড়বিড় করে বলে : উ ভেন্ন কথা।

: ফের ভেন্ন কথা ! ভেন্ন কথা লয়। সোব্ই ইক কথা। বংশী ভাইর জমিন কব্জা করে তুই গেরুয়া ছেড়ে মাথার জটা কেটে বে-সাদি করেছিস, কোঠাবাড়ি বানিয়েছিস আর পাঁচু কপালির বউকে যে তুই ফুসলে লিয়ে এসেছিস, উও বংশীভাইর জমিনেরই ফল।

: ঠিক লয়। কী কথায় কী কথা ! তোর মাথাটা নিঘ্ঘাত খারাপ হয়েছেন।

: আমার লয়, তোর। শুন্ জটাভাই, তোকে শেষকথাটা বলি। আমি সোয়ামির ঘর ক্যানে ছেড়েছি, উ কথা সোব্বাই জানেন। শুনে রাখ্, আমার দোষ দিয়ে তোর নিজের দোষ ঢাকা যাবেন নি।

কুইলি ঘনুকে ডাকে : ঘনুকাকা—

ঘনু মুখ তুলে ওর দিকে তাকায়।

: তোরা ইবার জটাভাইর বিচার কর। উর বউ আর মেয়্যেগুলানের কি হবেন ?

ঘনু এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই জটা জবাব দিয়ে দেয় : আমার বউ, আমার মেয়্যে আমার ঘরেই থাকবেন।

কুইলি জটার বউকে জিজ্ঞেস করে : কি রে, বউ, শুন্‌লিত ? ইবার তা'লে ঘরে যা !

জটার বউ কি বললো শোনা গেলনা। ঘনু বলে : জোরে বল্, কি বল্‌ছিস—

: অন্য মেয়্যেমানিষ্যি ঘরে থাকলি আমি উঘরে যাব নি।

খেঁকিয়ে ওঠে জটা : তা'লে কুথায় যাবি ? কোন্ চুলায় ?

: তোর চুলায় যাব নি।

জটার বউ কাঁদতে থাকে। ওর কান্না সমস্ত দাওয়া, সামনের উঠোন ছাপিয়ে সমুদ্দুরের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশে দূর আসমানের তারাগুলোর আঙিনাকেও যেন ভিজিয়ে দিয়ে আসে।

ঘনু বলে : কামটা তুই ভাল করিস নি রে, জটা। পাঁচু কপালির বউ, কি যেন উর নাম ?

ঝড়ু বলে : মঙ্গি—

: হঁ। মঙ্গিকে তুই ছেড়ে দে। সোয়ামির কাছে ফিরে যাক উ। তা'লেই সোব্ দিক শান্তি হবেন।

জটা মুখ নামিয়ে বলে : উকে আমি বে করেছি। ছাড়তি লারব।

ঝড়ু তেড়ে ওঠে : ধুৎ তোর 'বে' ! অমন 'বে' ভাদ্দর মাসের শ্যাল-কুকুরেও করেন।

: মাঙ্গি তোর বুন লয় ?

: হঁ বুন। তুই উকে ফুসলিয়ে লিযে এসেছিস ক্যানে ? তোর গেরুয়া কুথায় গেলেন, মাথার জটা কুথায় গেলেন ? শালা গুয়ের পোকা হয়ে সাধুগিরি মারাচ্ছিলি এ্যাদ্দিন !

ঘনু আবার বলে : মঙ্গিকে ছেড়ে দে, উ পাঁচুর কাছে ফিরে যাক। তোর বউকে তুই ফিরিয়ে লিয়ে যা।

মধুয়ার বউর কান খুব টনটনে। কোথায় যেন একটা হল্লা হচ্ছে, সে শুনতে পায়। কান খাড়া করে বেশ ভালো করে সে শোনার চেষ্টা করে। বলে : থাম্। কাবা দূরে কথা বলছেন।

সবাই চুপ করে শোনার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে মধুয়ার বউ। কোথাও একটা ঝগড়া বেধেছে। হাওয়া নেই। তাই কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মেঘু রঘু উঠোনে নেমে শোনার চেষ্টা করে। ঝড়ু জগা রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

জটা বলে : তা'লে আমি চলি যাই—-

ঘনু বলে : আর তোর বউ ?

ঝড়ু আর জগা রাস্তা থেকে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে।

: জটার ঘরে কারা যেন হামলা করছেন।

জটা যা ভেবেছিল, তাই। এই ভয়ই সে করছিল। এটা যে হবে, সে জানতো। তাই সে অনেক দিন মঙ্গিকে নিয়ে এখানে-ওখানে লুকিয়ে বেড়িয়েছে।

কিন্তু কতদিনই বা হা-ঘরের মতো ঘুরে বেড়ানো যায় ? ঘরে তো তাকে ফিরতেই হবে। ওখানে সে এবছর কোঠাঘর বানিয়েছে। তাছাড়া ধান আছে, ধানের গোলা আছে, প্রকাণ্ড দুটো খড়ের গাদা আছে, গোয়ালে ছ'ছটা গোরু আছে। এসব

ছেড়ে কোথাও তার পালানোর উপায় নেই, পাঙ্গিয়ে বেড়ানোও যায় না।

অগত্যা ঘরেই ফিরে আসতে হয় তাকে।

ঘরে ফিরে দেখা গেল নতুন অশান্তি। তার বউ মঙ্গিকে ঘরেই ঢুকতে দেবে না। রুগ্ণ ছোটখাটো মেয়্যেমনিষ্যি তার বউ। তার যে এত তেজ, জটা জানতো না। শেষ রাত্তিরে যদি-বা সে দোর খুললো, কিন্তু ঘরে রাখা গেল না ওকে। 'সতা' লিয়ে কি ঘর করেন না কুনো মেয়্যেমনিষ্যি? ভগবতী করেন না? ভগবতী যদি পারেন গঙ্গা সতা লিয়ে ঘর করতি, তা'লে আমার বউ লারবেন ক্যানে? জটা ভেবেছিল, বউ ঠিক মেনে লিবেন ব্যাপারটা। কুনো গড়বড় হবেন নি। কিন্তুক উর উই রোগা-পট্‌কা চেহারার মধ্যে এমন ইকটা তেজি মেয়্যেমনিষ্যি লুকিয়েছিলেন, উকথা আগে কে জানতেন? যেন শুক্‌নো বিচালির আগুন। কুনো কথা উ শুনলেন নি? ফুট্‌স্‌ করে ঘর থিকে বেরিয়ে গেলেন, আর ভুস্‌ করে গাঁয়ে বিচার দিয়ে দিলেন। জটা এতটা ভাবেন নি। ভাববার মতন মনের অবস্থাও ছিলেন নি। মঙ্গির শরীলভরা যৌবন উর মনে ইকটা ঘোর লিশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। উ লিশা ইখোনো কাটেন নি—সহজে কাটবার লয়।

জটা আর একটা ভুল করেছিল। সে ওই লিশাখোর চিমসেপোড়া পাঁচু কপালিকে নিয়ে। তাড়ি আর হাঁড়িয়া পেলে ও আর কিছু চায় না। পেটে ভাত না-থাকুক, লিশা ওর চাই। বউ বাচ্চা সংসার ভেসে যদি যায়, যাক্‌। একদিন খাটে তো তিন দিন বেহুঁশ। বউকে তাই গা-গতরে খেটে রোজগার করতে বেরোতে হয়। গতর যখন বিক্রি করা চলে, তখন পেটের ভাতের জন্য শরীলটা আর একটু খাটালে দোষ কী? আর ঘরের মনিষ্যি যখন লিশায় বেঘোর, বউ-বাচ্চাকে ভাত দিতে পারেন না সোব দিন, তখন মেয়্যেমনিষ্যির আর ওই ঘরে মন থাকেন না। মঙ্গি যখন পাঁচুর হয়ে জটার জমিনে বর্দলি খাটতে আসতো, তখন থেকে জটা ভেবে নিয়েছিল, মঙ্গিকে খুব সহজেই পাওয়া যাবে। এ পর্যন্ত ওর হিসেবে কোন ভুল হয় নি। খুব একটা কাঠখড় না-পুড়িয়েই সে মঙ্গিকে পেয়ে গেল। মঙ্গি একদিন, কি করে যেন ঘাটের কাতলা মাছের মতো হাতে উঠে এলো নির্বিরোধে। কিন্তু তারপর থেকেই জটার হিসেবে ভুল হতে লাগলো। গাঁয়ের ভয়ে, সমাজের ভয়ে সে মঙ্গিকে সরাসরি ঘরে এনে তুলতে পারলো না। যদি-বা শেষ পর্যন্ত তুললো, বউ গেল বিগড়ে, গাঁয়ে শুরু হয়ে গেল হুলুস্থুল্‌স। আর পাঁচু কপালির যখন তাড়ির লিশা কেটে গেল, দেখলো, সে দাওয়ায় পড়ে আছে, ঘরে বউ নেই—পালিয়েছে, বাচ্চাগুলো পাড়ার পড়শিদের দাওয়ায় বসে খিদেয় কাঁদছে, তখন বউকে খুঁজতে বেরিয়ে জানলো, জটা মঙ্গিকে নিয়ে ভেগেছে, তখন শুধু তার প্রাণেই ঘা লাগলো না, মানেও লাগলো। সেই সঙ্গে চাঁপাবনির কপালিপাড়ার মানেও। চাঁপাবনির কপালিরা পাঁচুকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সোজা জটার ঘর ঘিরে ফেললো। ঘরে কেউ ছিল না—ছিল একা মঙ্গি। ঘনুর ঘরের দাওয়ায় তখন

বিচার চলছিল জটার। জটা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, সে মঙ্গিকে ছাড়তে পারবে না। ওকে সে 'বে' করেছে। তার বউও ঘরে থাকবে, মঙ্গিও থাকবে। তখন শুধু ওর বউই নয়, জলশিয়রের কপালিপাড়াও তা মেনে নিতে পারলো না।

এমন সময় জটা শুনলো, চাঁপাবনির মানুষজন তার ঘর ঘিরে ফেলেছে। বুকের ভেতরে কোথায় যেন খুব জোরে একটা ঝাঁকি লাগলো। প্রথমে সে কি করবে, কোনদিকে পালাবে, নাকি ঘরের দিকে যাবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলো না। পরে হঠাৎ কি ভেবে ঘরের দিকে যেতে পা বাড়ালো। পায়ে কেমন তার এখন যেন কোন জোর নেই। না গিয়ে উপায় নেই, তাই সে যাচ্ছে।

তাকে এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিল পুলি। সে বলে দেয় : না, জটাভাই, তুই যাবি নি।

জটা ফিরে আসে, ঘনুর সামনে বসে পড়ে একেবারে বিধ্বস্তের মতো। পুলি ডাকে : ঝড়ুভাই—

: ক্যানে? কি বলছিস?

ঝড়ুর চোখে-মুখে একটা চাপা উত্তেজনা।

: মঙ্গি ত তোর বুন। তোর মাসতুতো বুন। তা'লে তুই যা, পাঁচুকে ইখানে ডেকে লিয়ে আয়।

: আর চাঁপাবনির লোকজনদের?

: তাদেরও ডেকে লিয়ে আয়।

: যদি না আসেন?

: তুই চলে আসবি।

ঝড়ু চলে গেলে ঘনু বলে : আমার ইখানে উদের ডাকাটা ঠিক হবে নি।

: ক্যানে?

পুলি শুধোয়।

: আমার ইখানে ফের ইকটা ঝামালি হবেন—

: হলি আর কি করবি তুই, ঘনুকাকা? উ ত একটু সামাল দিতে হবেন।

সবাই শুনছে, খুব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। কোনকথা না বলে সবাই ঝড়ুর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে চাঁপাবনির কপালিদের ডেকে নিয়ে এলে এখানেই যা হোক একটা মিটমাট হয়ে যাবে। কিন্তু যেভাবে হৈ-হল্লা হচ্ছে, মনে হচ্ছে, ওরা কিছু একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না।

মেঘু বলে ঘনুকাকা, জটাভাইকে তুই ইখান থিকে কুথাও পাচার করে দে—

: কুথায় পাচার করব উকে। উ কি মেয়্যেমনিষ্যি না কি ইকটা বিচালির আঁটি?

রঘু ফোড়ন কাটে : বিচালির আঁটি হলি বলদের মুখে দেওয়া যেতেন। উ ত বদ্ দোষের আঁটি। বলদের মুখে দিলেও বলদ ছোঁবেন নি।

অন্ধকারে কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। কেউ আর রঘুর কথায় হাসতে

পারলো না। ঝড়ু ফিরে এসেছে। শিবু ডোবার পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও ঝড়ুর সঙ্গে ফিরে এসেছে।

: কি হলেন ?

: উরা আসবেন নি। জটাকেই খুঁজছেন। না পেলে জটার ঘর ধানের গোলা খড়ের গাদা—সোব্ জ্বালিয়ে দিবেন। হাতে মশাল লিয়ে এসেছেন।

ভয়ার্ত পশুর মতো জটা ঘনুর মুখের দিকে তাকায়।

চিন্তার আঁচড় ফুটে উঠলো ঘনুর মুখে। ডাকে : জটা—

জটা ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। মুখে কোন আওয়াজ নেই।

: কি করবি ইখোন ?

: আমার ঘর পুড়বেন আর তোরা দাঁড়িয়ে দেখবি ?

: উপায় কী ? তুই যে অপকম্ম করেছিস, উর ত কুনো আর উপায় দেখছি নি।

কুইলি চড়া গলায় বলে : ক্যানে ? মঙ্গিকে ছেড়ে দিলে উপায় হয়েন নি ?

সবাই চুপ।

ঘনু জটার দিকে তাকায়।

: কি রে জটা ?

জটা মুখ নামিয়ে বসে রইলো। ফের হল্লা শোনা যাচ্ছে। আরো জোরে। হাওয়া মরে গেছে। তাই রাত নিশুতি হবার সঙ্গে সঙ্গে হল্লাটাকে আরো ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে।

: জটা—

: ঠিক আছেন। তাই হবেন।

: কি ঠিক আছেন ?

: মঙ্গিকে ছেড়ে দিব।

: আর তোর বউ ?

জটা মুখ তুলে তাকায়। পেছনে অন্ধকার উঠোন। মনে হলো, উঠোন দিয়ে ভারী পা ফেলে কে যেন আসছে। কে আবার আসবে। গাঁয়ে সবাই তো এখানে বসে, না হয় দাঁড়িয়ে। আসবার তো কেউ বাকি নেই গাঁয়ের। তাহলে কে আসছে ? অন্ধকারে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। চাঁপাবনির কেউ নয় তো ? নেশুড়ে পাঁচু কপালি ? নাকি, চাঁপাবনির কোন জোয়ান ?

: খবরদার, কোই গড়বড় হোনেসে গোলিমে মার ডালে গা—

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো, খোকন বক্‌সির পাঞ্জাবী দারোয়ান—জবর সিং। এত রাত্তিরে জলশিয়রের কপালিপাড়ায় খোকন বক্‌সির দারোয়ান জবর সিং কেন ?

নিশ্চয়ই কোন খারাপ খবর আছে।

জলশিয়রের জমিনগুলোর ওপর খোকন বক্‌সির শনির নজর। সবাই জানে,

দাওয়ার ধারে বসলে পুবের আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। তারাগুলো আকাশের কতদূর উঠলো, তা দেখে রাত ঠাহর করা যায়। সাতভাইরা অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে, চোখে পড়লো।

: কুইলি—

বংশী ডাকে।

ভরা কলসীর জল যেমন একটু নাড়া পেলেই ছলকে ওঠে, কুইলির বুকের রক্তে যেন তেমনি একটা ঝাঁকি লাগে। মুখে কিছু বলে না। শুধু একটু নড়ে বসে।

: রাত হলেন, কুইলি, ঘরে যা—

: তোকে ভাত দি ?

বোঝা গেল, সে তার চুলের ঢল পিঠের ওপর ছুঁড়ে দিল।

: না, থাক্। আমি নিজে লিয়ে খেতে পারব।

আজ নিয়ে মাসখানেক হলো, বংশী এসেছে। এমন কথা কুনোদিন বলেননি সে। আজ হঠাৎ ইমোন কথা সে বললেন ক্যানে ? কুইলি ভাবলো কিছুক্ষণ।

: তালে তোর ভাতটা বেড়ে দিয়ে যাই ?

: না থাক্। উ আমি বেড়ে লিব।

কুইলি নেমে নিঃশব্দে উঠোন পেরিয়ে ধীরে পায়ে চলে যেতে থাকে।

: শুন্!

বংশী ডাকে। কুইলি থেমে যায়।

: কাল থিকে আব আসিস্ নি।

কুইলি কিছু বুঝে উঠতে পারে না। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

: ক্যানে ?

: যখন আমি আসি নি, ঘর আগ্‌লাবার জন্যে তুই আসতিস। কিছু বলার ছিল নি। ইখোন ত আমি এসে গেছি। আর তোর আসবার কুনো দরকার নেই।

কুইলি থম হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বংশীর কাটা-কাটা কথাগুলো ওব বুকের ভেতর কেটে-কেটে বসতে থাকে : আর তোর আসবার কুনো দরকার নেই। কুইলি অন্ধকারে একবার বংশীর দিকে ফিরে তাকালো। বংশী ওর চোখ দেখতে পায় নি। ওর চোখে কি ছিল, সে বুঝতে পারলো না। কুইলিও বংশীর চোখ দেখতে পায় নি। বুঝতে পারলো না, ওর চোখে কি কথা লুকোনো ছিল। বললো : আচ্ছা—

কুইলির পা দুটো থমথমে অন্ধকার উঠোনের মাঝখান দিয়ে চলতে লাগলো। মনে হলো, একটু যেন দ্রুত। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অন্ধকার উঠোনের ওধারে চোখের আড়ালে হারিয়ে যায়।

উঠোনে ঝাঁটার আওয়াজে সকালে ঘুম ভেঙে গেল বংশীর। দোর খুলে বেরিয়ে

এসে সে দেখতে পেল ডুরে শাড়িপরা বছর পনেরো-ষোলোর একটি কিশোরী মেয়েকে। সে-ই উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। বংশী কপাল কুঁচকোলো।

: তুই কে ?

: আমি সিমলি। পিসি পাঠিয়ে দিলেন।

: তুই মেঘুর বিটি ?

: না।

: তা'লে তুই রঘুর বিটি ?

: হঁ।

: পিসিকে গিয়ে বল্, কাউকে আমার উঠান ঝাঁট দিতে হবেন নি।

সিমলি ঝাঁটাহাতে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কাল চোখে কাজল পরেছিল। দু'চোখের কাজল জেব্‌ড়ে গিয়ে কালো চোখ দুটোকে আরো কালো দেখাচ্ছে। মাথার চুল আলুথালু। ঘুমভরা দু'চোখ।

বংশী দাঁড়ায় না। দুম দুম শব্দে মাটিতে ভারি-ভারি পা ফেলে সে বেরিয়ে যায়। উঠান থেকে ঝাঁটার আওয়াজ আবার শোনা যায়। মেয়েটাকে বংশী কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ে না। হয়তো দেখে থাকবে, খেয়াল করে নি। তখন খুবই ছোট ছিল, হয়তো চোখে পড়ার মতো ছিল না। দশ বছরে কত বদলে গেছে কপালিপাড়া।

আগড়ের কাছে সাইকেলে বসে আছে একটি ছেলে। মাটির একটা ঢিবিতে ছুঁয়ে আছে তার একটি পা। বংশী ছেলেটিকে দেখলো একবার ভালো করে। চিনতে পারলো না।

: কে তুই ?

ছেলেটি হেসে উঠলো।

: আমাকে তুই চিনতে নারলি বংশীকাকা ? আমি বুধন।

: বুধিয়া—

বংশী চমকে যায়। ছোটবেলায় খুব অসুখে ভুগতো বুধিয়া। ওর মা মারা যাবার পর সে তার মামার বাড়ি চলে যায়। মামারা ওকে তাড়িয়ে দেয়। পাশের গাঁ বিষ্টুপুরের একটি বৃদ্ধ, তার কোন ছেলেপুলে ছিল না, সে বুধিয়াকে পুষ্যি করে নিয়েছিল। ওখানে সে পড়ালিখা শিখে ইস্কুলে একটা পাশ দিয়ে চাকরি খুঁজছে। ওর চেহারা আগের মতো রোগা পাতলা। কিন্তু দেখলে ভদ্দরলোক মনে হয়েন।

: তা তুই ইখানে ক্যানে ? এই সোক্‌কালে—

বুধিয়া কি বলবে, খুঁজে পায় না।

: ইদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম, ইকটু ঘুরে যাই—

: অ—

দু'পা চলে যায় বংশী। ঘুরে দাঁড়ায়।

: বিষ্টুপুরে না কোথায় থাকতিস নি ?

: হঁ। উখানেই আছি।

বংশীর আর দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। সময়ও নেই। সে আজ বিষ্টুপুরে জগৎ সরদারের বাড়ি যাবে। খোকন বক্সির বাড়ির দারোয়ান জবর-সিং ওকে বলছে বিষ্টুপুরের উকিল জগৎ সরদারের সঙ্গে দেখা করে ওকে সব কথা খুলে বলতে। কি জানি, লোকটার পেটে কি আছে। জবর সিং লোকটাকেও তো ভালোই মনে হয়। কিন্তু কেমন যেন 'সন্ধ' হয়েন তার। জীবনে সে একটা লোকের তালাশ পায় নি, যাকে বলা যায় খাঁটি। ঘোষবাবুর নায়েব এমন যে হরিদা, তার বিছানায়ও সে মাঝরাতে বিন্দিয়াকে দেখেছে। আর বিন্দিয়া ? সেও তো রাত্তিরে অফিসের তাবু থেকে টাকার বাক্স সরিয়েছিল। জটা, বাতাসী— কেউ খাঁটি লয়। সব ভেজাল। ভেজালে ভরে গেছে দুনিয়াটা। জবর সিং যে খাঁটি হবেন, তারই বা ভরসা কি ? সে একটা দারোয়ান। আবার খোকন বক্সির দারোয়ান। তবু তো মনিষ্যির ওপর ভরসা করতি হয়েন। না'লে চলেন নি। বংশী কোনদিন মানুষের ওপর ভরসা রাখে নি। সে নিজেকে, নিজের গতরকে বোঝে। আর সব ভেজাল। সে কোনদিন জটাকে বিশ্বাস করে নি। মাঝে ক'দিন সে খুব সাধু সেজেছিল। এখন সে রক্ষক হয়ে ভক্ষক।

রাস্তা থেকে ডোবার জলের কিনারায় নেমে যায় বংশী। জল অনেক নেমে গেছে। আকাশে অনেক দিন বৃষ্টি নেই। হাতে কশিতে জল নিয়ে চোখে মুখে দেয়। রাস্তায় উঠে সে দেখে, বুধিয়া রঘুর বিটি সিমলির সঙ্গে কথা বলছে। কী কথা বলে ওরা ? কী এমন কথা যা বলার জন্যে সাত সোকালে [illegible] যাকে বিষ্টুপুর থিকে ছুটে আসতি হয়েন ? বংশী পিরথিবির অনেক কিছুই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না।

বাঁকটা ঘুরতেই বুড়োবটগাছের ডালপালাগুলো ওর চোখের সামনে হিজিবিজি কেটে দেয়। ওর কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। ক'দিন আগেও ওর ডালে পাতা ছিল। এখন একটাও পাতা নেই। সব একে একে হলুদ হয়ে ঝরে গেছে। ডালের গায়ে এরই মধ্যে কচিপাতা উঁকি মারতে শুরু করে দিয়েছে। যেন গাঁয়ের বুড়োবটগাছ এক বছরের বাসি কাপড় ছেড়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে নতুন কাপড় পরবে বলে। বুড়ো বটগাছের তলায় শুকনো পাতা ঝাঁট দিচ্ছে কুইলি। বস্তা বোঝাই করে ঘরে নিয়ে যাবে। জ্বালানি হবে চুলার। বুড়ো বটগাছতলাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে সেই সঙ্গে। কুইলি ওর পায়ের আওয়াজ চেনে। ওর পায়ের আওয়াজে সে ঝাঁট-দেওয়া বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় একটি বলিষ্ঠ বিস্ময় চিহ্ন। বংশীও একটু দাঁড়ালো। ওর মনে হলো, কুইলি ওকে কিছু বলবে। কুইলি কিছুই বললো না। মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইলো। বংশী একবার ওর দিকে তাকালো।

এক ঝলক। তারপর রাস্তার ওপর ঠাঁই-ঠাঁই ঝাঁট দিয়ে জড়ো-করে-রাখা শুকনো পাতার স্তূপ এড়িয়ে পথ কেটে অভ্যেস মতো সশব্দে হেঁটে চলে গেল।

কৈবর্তপাড়ার পর চন্নপুরের হাটে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। ওখানে সাইকেলে বেল বাজিয়ে ওর পাশ দিয়ে দ্রুত লয়ে চলে যায় বুধিয়া। ও বোধ হয় বিষ্টুপুরেই ফিরে যাচ্ছে। এখন ও ওখানেই থাকে। রঘুর বিটি সিমলির সঙ্গে কথা বলতে অত ভোরে ও সাইকেলে চেপে বিষ্টুপুর থেকে জলশিয়রে আসে। সিমলির সঙ্গে ওর কী এমন কথা!

দনু পালের ছেলের চায়ের দোকানটা বাস স্ট্যাণ্ডের একেবারে সামনে। বাস আসতে দেরি আছে। এই ফাঁকে একটু চা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। দোকানে খুব ভিড়। চায়ের গেলাস নিয়ে সে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে চা খেতে থাকে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে দেখলো, জটা কোথা থেকে এসে সাইকেল থেকে নামলো রাস্তার ওধারটাতে। বংশীকে সে দেখলো, বংশীও ওকে দেখলো। মনে হলো, বংশীকে সে একটু ভয় পেয়ে গেছে। সাইকেল নিয়ে কিছুক্ষণ সে এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করলো। যেন ওকে সে চোখে চোখে রাখছে। বংশী ওকে দেখছে। ব্যাটা ক'বছর আগে, গেরুয়া কাপড় পরে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াতো। মাথায় জটা, পরণে গেরুয়া থান দেখে সবাই ভাবতো, ব্যাটা সাধুই বুঝিবা। কিন্তু ওর বেঁটে গড়ন, ভাঁজপড়া কপাল, শিরাওঠা হাত আর কোটরের গর্তে ঢোকা ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দেখে বংশীর ওকে ভালো মনে হতো না। তবে সে ওকে তালবাঁধের শেষ সীমানায় বাঁধের নিচে কালভার্টের ওপর মধুয়ার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিল তাতেই জটাকে সে একটু বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। এমন-কি, জলশিয়র গাঁ ছেড়ে সে যখন চলে গিয়েছিল, তখন তার বড়ো ভরসা ছিল মধুয়া আর জটা। সেই মধুয়া এখনো নিপাত্তা, আর জটা জটা কামিয়ে বে-সাদি করে এখন একেবারে অন্য মানুষ। আন্দুলনের তোড়ে বংশীর হাত থেকে তার বাপকেলে পাঁচ বিঘে লাখেরাজ ছুটে গেল, আজও সে তা ফিরে পায় নি ; আর সেই মওকায় সাধুর ভেক ধরে জটা সেই পাঁচ বিঘে জমি তার খপ্পরের মধ্যে পেয়ে গেল বানভাসি ধনের মতো। এখন ব্যাটা কুঁড়েঘর ভেঙে কোঠাঘর বানাচ্ছে, বড়ো করে পুকুর কেটেছে, সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চন্নপুরের হাটে।

চন্নপুরের হাটে এখন সবাই জটাকে চেনে। দু'তিনটে লোক দু'দিক থেকে এসে জটার সঙ্গে ভিড়ে গেল। ওদের একজনকে বংশী একবার খোকন বক্সির বাড়িতে দেখেছিল, মনে হয়। ভাঁজখোলা জামা-কাপড় পরা। দুধ-ঘি-খাওয়া-ভদ্দর লোক ভোদ্দর লোক চেহারা। জটাও এখন ভদ্দর লোক হয়ে উঠেছে। চন্নপুরের ভদ্দরলোক বাবুদের সঙ্গে ও এখন ঝাঁক বেঁধেছে।

চন্নপুরে এখন সাইকেলের মেলা। লোক তিনটে সাইকেলে চেপে পা দিয়ে মাটি ছুঁয়ে কি সব কথা বললো জটার সঙ্গে। তারপর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে

চললো খোকন বক্‌সির বাড়ির দিকে। ঠিক খোকন বক্‌সির বাড়ি কিনা, বংশী জানেনা ; তবে খোকন বক্‌সির বাড়ি ওই দিকেই।

খানিক বাদে বাস এলো। বাসের ছাদেও মানুষ। বংশীও মই বেয়ে ছাদে উঠে গেল। একধারে বসে পড়লো হাত-পা গুটিয়ে। বাস চলতে লাগলো। রাস্তার ধারের গাছপালাগুলো যেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। গড় বাসলি। বংশী সোজা হয়ে বসলো। এই গড় বাসলির জমিদার বাড়িতে ডাকাত ঠেঙিয়ে তার ঠাকুরবাপ দুখু কপালি জলশিয়রের পাঁচ বিঘে জমিন শিরোপা পেয়েছিলেন। ভাবতেই তার বুকের ভেতরের লেঠেল রক্ত ছলাৎ করে লাফিয়ে ওঠে। পাশের লোকটার গায়ে কনুইর গুঁতো লাগলো ওর। লোকটা চোখ পাকালো ওর দিকে। বংশী ভ্রূক্ষেপহীন।

: এই—

বংশী তাকালো একবার শুধু। রাগী মোষের মতো লাল ওর চোখ দুটো।

: নামাব না কি ?

বংশী চোয়াল শক্ত করে।

: এই, নামবি নাকি ?

: হুঁ।

: কোথায় নামবি ?

: বিষ্টুপুর।

: এটা গড় বাসলি।

: জানা আছেন।

: তবে এমন করছিস কেন ?

বংশী সরে বসলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর পিঠে খোঁচা মারলো কে। বিরক্ত বংশী ধমকে ওঠে : অ্যাই—

আবার পিঠে খোঁচা। বংশী পেছন ফেরে। একখানা হাত। হাতের মালিককে দেখা গেল না। হাতে একগোছা টিকিট। বংশী সরে বসে। পাশের লোকটা এবার ওকে একটা কনুইর গুঁতো মারে। বংশী ওর রাগী চোখে তাকায়।

: টিকিট কেটেছিস ?

বংশী আড়চোখে তাকায়। কোমরের গেঁজে থেকে পয়সা বের করে গোনে : এক, দুই, তিন—

একটু পরেই ঝাঁকুনি দিয়ে বাস থামলো। কণ্ডাক্টার চেঁচিয়ে উঠলো : বিষ্টুপুর—

জগৎ সরদারের বাড়িটা কাঁচা রাস্তার ধারে—একেবারে বাঁকের মুখে। মাটির পাঁচিলটা রাস্তার গা ছুঁয়ে হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠেছে। মাথায় সযত্নে ছাঁটা খড়ের সরু চাল। পেল্লায় দরজা। খোলা। সামনে টাকপড়া বিরাট একখানা উঠোন। জনমনিষ্যি নেই। কোণ ঘুরতেই দক্ষিণমুখো লাল মেঝের বাঁধানো বারান্দা। বারান্দায়

চেয়ারে বসে আছে একটি মেদহীন আঁটোসাঁটো মানুষ। মাথায় খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা চুল। প্রায় তেমনি কাঁচাপাকা গোঁফ। খালি গা। কোমরে উঁকি মারছে চেক-চেক লুঙ্গি। জন আটদশেক লোক বেঞ্চিতে তিন দিকে ওকে ঘিরে বসে আছে। সামনে একরাশ দলিল পত্তরের আণ্ডিল। বংশী বুঝতে পারলো, লোকটা জগৎ সরদার। সে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই লোকটা খুব নিরাসক্তভাবে জিজ্ঞেস করে : কি চাই?

বংশী উঠোন থেকেই বলে : আজ্ঞা, আমার বাপকেলে পাঁচ বিঘে লাখেরাজ—

: এখন হবে না। সময় নেই।

বংশী হতাশ হয় না। গলা উঁচিয়ে বলে : জলশিয়রের কপলিপাড়ায় আমার ঘর। ঠাকুর-বাপ লেঠেল ছিলেন। জমিদারবাড়িতে ডাকাত ঠেঙিয়েছিলেন।

: তা তুই আমাকে ঠেঙাবি নাকি?

: না, আজ্ঞা—

: তবে আমার কাছে এসেছিস কেন?

জগৎ সরদার টেবিলের ওপর থেকে গোল-গোল একজোড়া চোখ তুলে তাকায়। বংশী তার সেই চোখের ওপর সরাসরি চোখ রাখে।

তুই কোনদিন ডাকাত ঠেঙিয়েছিস?

: না, আজ্ঞা।

: তাহলে কি করেছিস?

বংশী জবাব খুঁজে পায় না। জীবনে সে লাঠি ধরে নি, ডাকাঁত ঠ্যাঙায় নি, কিছুই করে নি। শুধু নিজের ওপর রাগ করে সে তার বাপকেলে জমিন ছেড়ে চলে গেছে আঁদুলের ওখানে সড়ক তৈরির কাজে। দশ-দশটা সন এমনি করেই কেটেছে তার। সত্যি, জীবনে সে কিছুই করে নি।

: আজ্ঞা কিছু করি নি,

: ডাকাতি?

: না, আজ্ঞা।

: তাহলে এসেছিস কেন?

জগৎ সরদার টেবিলের কাগজপত্তরের মধ্যে ওর দুচোখ সেঁধিয়ে দেয়। বংশীর নিজের ওপর খুব রাগ হয়। সে ঠিকমতো নিজের কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারে না কাউকে। অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়। এখন সে ভাববার চেষ্টা করে, জগৎ সরদারকে সে কি বলতে এসেছিল। হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার বাপকেলে হাত ছাড়া জমিনের কথা। গলা চড়িয়ে বলে : আমি জমিন চাষ করিছিলাম, আজ্ঞা—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জগৎ সরদার বিদ্রূপের সুরে বলেন : খুব কাজ করেছিলেন।

এবার বংশীর কানের দু'পাশের রগের শিরা দুটোয় রক্ত চিড়িক মেরে ওঠে। খোকন বক্সি, জগৎ সরদার, চন্নন্‌পুরের বাবুরা, কপালিপাড়ার জটা—সব এক

বিষগাছেরই বিষাক্ত পাতা। এরা ঝরেও ঝরে না, মরেও যায় না। একেবারে পাকা হত্তুকি-খাওয়া ভগবানের মৃত্যুহীন জীব। রাগে সমস্ত শরীল কাঁপতে থাকে বংশীর।

: ই যা-তা জমিন চাষ লয়, আজ্ঞা। খরায় পোড়া, সমুদ্দুরের নোনা জিভ-বোলানো আমার পাঁচবিঘে লাখেরাজ। সমুদ্দুরের সিকস্তি আমার উঁই জমিন বহু সন বাঁজা হয়ে পড়িছিলেন। সমুদ্দুরের বালিয়াড়ির বালি শয়তানি করেছেন। বালি উড়িয়ে জমিন জুড়ে বালিয়াড়ি তৈয়ার করেছেন। আমি আর আমার পরিবার উ বালি সরিয়েছি। বালি ত সরলেন, তাপ্পর রোদে-পোড়া পাতুরে জমিন হাল নিলেন নি। আমি আর আমার পরিবার কুদাল দিয়ে কুপিয়েছি সমস্ত জমিন। অনেক কাঁদাকাটির পর ভগমানের কিপা হলেন। আকাশ বর্ষালেন। তা'পর বীজ বুনে আমি ফসল ফলিয়েছিলাম। সোনার মতন ফসল, আজ্ঞা। কিন্তুক খোকন বক্সি জমিদার থিকে উ জমিন কিনে নিয়েছিলেন। উ জমিনের ধান উঁর খামারে তুলতে হুকুম করলেন। আমি উঁর খামারে ধান তুলি নি। গাঁ ছেড়ে চলি গিয়েছিলাম রাগে, দুঃখে। গাঁয়ের মাথারা জটাকে জমিনের রক্ষক ঠিক করি দিয়েছিলেন। ইখোন রক্ষক হয়েছেন ভক্ষক। জটা আমার দশ সনের বখরা ধান দিচ্ছেন নি, জমিনও ছাড়ছেন নি। জমিন নিজের নামে জমা করি নিয়েছেন।

: কাগজপত্র কিছু আছে?

:না, আজ্ঞা।

: না, আজ্ঞা! তবে আমি কি করবো? কাগজ নেই, পত্র নেই। আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়।

জগৎ সরদার টেবিলের কাগজপত্তরে মন দেয়। বংশী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

রোদ চড়ছে মাথার ওপর চড়চড় করে। সেই রোদ্দুরে মাথার ভেতরে যেন এক ডজন স্টীম রোলার খুব জোরে চলতে থাকে। তবু বংশী গলা নামিয়ে মেজাজ ঠিক রেখে বলে: আপনি তুই উকিল আছিস—

এবার জগৎ সরদার খেঁকিয়ে উঠে: রেকর্ডপত্তর ছাড়া উকিল কি করবে? ঘোড়ার আণ্ডা?

কোন আশা নেই দেখে বংশী ঘুরে দাঁড়ায়। ট্যাঁকের গেঁজে থেকে গুনে গুনে দশটি টাকা বের করে। তারপর বারান্দার ধারে এগিয়ে এসে টাকা কটা টেবিলের ওপর রেখে চলে আসার জন্যে পা বাড়ায়।

: টাকায় কি হবে? আমি কিছু করতে পারবো না।

ঘুরে দাঁড়ায় বংশী।

: আমি উসোব্ কিছু জানি না, আজ্ঞা। জবর সিং আমাকে বলে দিয়েছিলেন তোকে দশ টাকা সেলামি দিতে।

সঙ্গে সঙ্গে জগৎ সরদারের মুখচোখের রং পাল্টে গেল।

: কে পাঠিয়েছে, বললি? জবর সিং? আগে নামটা বলিস নি কেন? তোর নাম কি?

: বংশী কপালি, আজ্ঞা।

: জলশিয়রে ঘর?

: আজ্ঞা।

: তো এতদিন কোথায় ছিলি?

: ইতক্ষণ তোকে কি বললাম তা'লে?

: হবে না। তোর জমিন ওই যে কি নাম বললি, জটা? হ্যাঁ, ওর নামে বর্গা রেকর্ড হয়ে গেছে।

মনের কোণে যেটুকু আশা টিমটিম করছিল, জগৎ সরদারের কথায় এক ঝট্‌কায় নিবে গেল। মনে বাজতে লাগলো একটি মাত্র কথা: লাঙল যার, জমিন তার। চন্নপুরের বাবুদের কথা তাহলে সবই ঝুটা। হাওয়ার কথা হাওয়ায়ই মিলিয়ে গেছে। চন্নপুরের বাবুদের আর দেখা নেই। মধুয়াও বেপাত্তা। সব ভুয়া—ফাঁকি! বংশী এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালো না। মাটিতে দুম্ দুম্ করে পায়ের আছাড় মেরে বেরিয়ে এলো জগৎ সরদারের বাড়ির চৌহদ্দি থেকে।

শত্তুর! সব শালা শত্তুর!

বহু মেহনতের দশ-দশটা টাকা শুধু-শুধু গচ্চা গেল। সেই-যে সেদিন সে একটা ভুল করে ফেলেছিল রাগ করে গাঁ ছেড়ে চলে গিয়ে, আজও সে তার খেসারত দিয়ে চলেছে, আরো কতদিন তা দিয়ে যেতে হবে, কে জানে? সেদিন সে তামাম দুনিয়ার ওপর রাগ করেছিল, সে রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন? সত্যি সত্যি সে কার ওপর রাগ করেছিল? বাতাসীর ওপর? জমিনের ওপর? খোকন বক্‌সির ওপর? নাকি, নিজের ওপর? হাসি পায় তার। সেদিনের কথা মনে পড়লে বংশী কপালিকে ওর কিপা হয়েন। আসমানে ভগমান আছেন, মাটিতে মা বসুমতী। কেউ ওর কথা একটু ভাবেন না। দুনিয়ায় সে একা, বড়ো একা। কেউ নেই তার, কিছু নেই। আছেন শুধু শত্তুর। সব শত্তুর। খোকন বক্‌সি শত্তুর। যাকে সে এতদিন খুব বিশ্বাস করেছিল, সেই জটা আজ ওর পরম শত্তুর। ওর শরীল-নিঙ্ড়ানো ঘামে-ভেজা, তিন পুরুষের মেহনত দিয়ে গড়া যে জমিন, সেই জমিন জটা নিজের নামে বর্গা লিখিয়ে নিয়ে এখন পাকাঘর তুলছে, চন্নপুরের রাস্তায় সাইকেল ছোটাচ্ছে। আর সে একটা চালচুলোহারা ভিখিরির মতো এর দোরে ওর দোরে মাথা কুটে ঘুরে বেড়াচ্ছে: ইকটু কিপা হয়েন, আজ্ঞা, ইকটু কিপা—।

দুশ্ শালা! কিপা? উ কারো কিপার ধার ধারেন না। ইবার শালা বংশী কপালি লাঠি ধরবেন। ওর বাপ মেঘু কপালি লাঠি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইবার উকে লাঠি ধরতি হবেন। উর শরীলের রক্তের মধ্যে অনেক দিন পর দুখু কপালি

জমিনগুলো ও জমিদারের কাছ থেকে অনেকদিন হলো কিনে নিয়েছে। কিন্তু দখল নিতে পারছে না কপালিপাড়ার কপালিদের জন্যে। ওরা শুধু বর্গাই লেখায় নি, বড়ো এককাট্টা হয়ে আছে। খোকন বক্সি কিছুতেই সুবিধে করতে পারছে না।

এবার নিশ্চয়ই নতুন কোন চাল চেলেছে খোকন বক্সি। সবাই জানে, খোকন বক্সি বড়ো সাংঘাতিক মানুষ। কোথায় পিছোতে হবে, সে জানে ; আবার কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তাও তার জানা। কৈবর্তপাড়া পর্যন্ত তার দখলে চলে গেছে। এবার কি কপালিপাড়াও যাবে।

কেউ নড়ে না। সামনের বালিয়াড়ির মতো নিথর চুপচাপ বসে থাকে সবাই। জটার ঘরে হল্লা জোর হচ্ছে। এবার বোধহয় ওরা ওর ঘরে আগুন দেবে। জবর সিং তার বাজখাঁই কড়া গলায় ডাকে : জটা—ঝড়ের রাতে হঠাৎ মেঘের ডাকে যেন জটার বুকের ভেতরটা চমকে উঠলো। তার আগাপাশতলা শিউরে উঠলো একবার। সে ভয়ে ভয়ে তাকালো উঠোনের দিকে। জবর সিংয়ের মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যেন একটা ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি ! তবু বোঝা যাচ্ছে, সে জবর সিং।

: উতার আও—

জটা ঘনুর মুখের দিকে তাকায়। মুখখানা শুকিয়ে একেবারে আম্‌সি।

: আও—

ঘনুর কিছু বলার আর অবসর ছিল না। জটা নেমে যায়। সামনে মৃত্যু ! অবধারিত মৃত্যু ! মরতেই যখন হবে, তখন আর তারা মানা করে কি হবে? জটা একটা কলের পুতুলের মতো উঠোনে নামে যায়। এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে জটার বউ জটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

: না। তুই যাবি নি। উ তোকে খুন করে ফেলবেন। তুই মরে যাবি। আমি থাকতি তোকে মরতে দিব নি।

জটার বউ তারপর জবর সিংয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

: তুই আমাকে মার। উকে মারিস নি। আমার মেয়্যেগুলান তা'লে মরে যাবেন।

জবর সিং বোধহয় এ দৃশ্য কখনও কল্পনা করতে পারে নি। ওর দেশে এ-রকম ঘটে কিনা, ওর জানা নেই। সে প্রথমে একটু ঘাবড়ে যায়। পরে যখন সে বুঝতে পারলো, সে জবর সিং, খুদ পাঞ্জাবী, তখন জটার বউর হাত ধরে একধারে সরিয়ে দিয়ে বলে : তু ঔরৎ হ্যায়, হট্ যা—

তারপর খপ করে জটার একটা হাত মুঠোয় পুরে বলে : এইসা ঔরৎকো ছোড়কে তু দুসরা সাদি কিয়া বে শালা গিধ্‌ধোড়। আয় হামারা সাথ। গোলিমে তেরা বিচার হোগা।

ঘনুকে ডাকে জবর সিং : এই বুঢ্‌ঢা !

ঘনু চমকে ওঠে।

: তু বাত্তি লেকে সামনে চল্—

জটার হাত ধরে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে জবর সিং তার বধ্যভূমিতে। নিরুপায় ঘনু হ্যারিকেন নিয়ে তার পেছনে পেছনে একটা বৃদ্ধ পশুর মতো প্রবল অনিচ্ছায় চলতে থাকে। জটার বউ ছাড়ে না। সে হাউ হাউ করে কেঁদে ককিয়ে কাকুতি মিনতি জানাতে জানাতে ছুটতে থাকে পাশে পাশে। সবাই দেখলো, একটা আলো অন্ধকারে দুলতে দুলতে উঠোন পেরিয়ে ডোবার পাড়ের পথ ধরে জটার কোঠাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরের ভেতর ছিল একা মঙ্গি। কচুর পাতায় যেমন একটা টলটলে জলের ফোঁটা হাওয়ায় কাঁপে, তেমনি ভয়ে কাঁপছিল সে। দরজায় লাথির পর লাথি মারছিল চাঁপাবনির কপালিরা। মঙ্গি দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটা সন্ত্রস্ত পশুর মতো।

চাঁপাবনির কপালিরা ঠিকই করেছে, আজ দরজা ভেঙে তাদের ঘরের বউ মঙ্গিকে ওরা জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। যদি রক্তারক্তি খুনোখুনি হয় তো হোক। গাঁয়ের মান বাঁচাতে ওটুকু করতে ওরা তৈরী।

: আমরা বেঁচে থাকতি আমাদের গাঁয়ের বউকে টাকার লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে লিয়ে যাবেন ইকটা ভিন্ গাঁয়ের মরদ। জান থাকতি উ আমরা হতি দিব নি। টাকা করেছেন বলে কি আমাদের মাথাও কিনে লিয়েছেন। আজ তা'লে ফয়সালা হয়ে যাক্, টাকার জোর বেশি না মানের জোর বেশি।

ডবল উৎসাহে চলতে লাগলো দমাদ্দম আওয়াজ আর রাতকাঁপানো হল্লা।

: খবরদার! না থামলি গোলি মার দেঙ্গে—

সব চুপ! পাতা নড়লেও শব্দ শোনা যাবে। মশাল আর হ্যারিকেনগুলোর কাচের গায়ে বাদুলে পোকার ডানার ফড়ফড়ানি ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

হঠাৎ ওদের ভেতর থেকে একজনের গলায় কথা ফুটলো: আমরা আমাদের ঘরের বউকে কেড়ে লিয়ে যাব।

: এ বাত্ কৌন বোলা রে?

: ক্যানে? আমি বলেছি—

: ইধার আ—

এক জোয়ান এগিয়ে আসে। মুখে তার হাঁড়িয়ার গন্ধ।

: হাঁড়িয়া পিয়া?

: হঁ।

: তব্ হাঁড়িয়া পিয়। কাম মাত্ কর। ঔরৎকো ভাগ্নে দো।

জোয়ান নীরব।

: পাঁচু কপালি!

ভয়ে পাঁচু কপালি এগোচ্ছিল না। ওকে দু'জন জোয়ান ধরে ঠেলে দেয় জবর সিংয়ের সামনে।

: আমি হাঁড়িয়া খাই নি, সর্দারজী। বউ যেদিন পালিয়ে এসেছেন, উদিন থেকে আমি হাঁড়িয়া ছেড়ে দিয়েছি। আর খাই না। খাব নি। কক্খন খাব নি। ই মাটি ছুঁয়ে—

নিচু হয়ে উঠোনের কাদায় হাত ছোঁয়ায় পাঁচু।

জবর সিং ডাকে : জটা!

জটা চমকে ওর মুখের দিকে তাকায়।

: দরওয়াজা খোল্‌নে বোল্‌। নেহি ত, আদ্‌মি লোক দরওয়াজা তোড়কে গাঁওকা ঔরৎকো গাঁওমে জবরদস্তি করকে লে যায়ে গা।

জটা কাঁপতে কাঁপতে দরজার কাছে গিয়ে ডাকে : মঙ্গি—

মঙ্গি ভয়ে সাড়া দেয় না।

: মঙ্গি, দরজা খোল্‌—

: উরা আমাকে মেরে ফেল্‌বেন।

ভেতর থেকে মঙ্গি কাঁদতে কাঁদতে বলে।

: পাঁচু!

জবর সিং ডাকে।

: তু মারেগা তেরা বহুকো?

: মাটি ছুঁয়ে বলছি, মারব নি।

মঙ্গি দরজা খুলে বাইরে আসে। মুখ নিচু করে দাঁড়ায়।

জবর সিং বলে।

: যা। ঘরমে যা—

: চল্‌। ঘঁরে চল্‌—

মঙ্গিকে নিয়ে পাঁচু ঘরের দিকে পা বাড়ায়। চাঁপাবনির অন্যান্য কপালিরাও চলে যায়। জলশিয়রের কপালিপাড়াব কপালিরা কখন জটার উঠোনে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে। ওদের সামনে জটার বউ তার মেয়েগুলানের হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়।

এদিকে সবার সামনেই জবর সিং মধুয়ার বউ পুলি কানে কানে কি বলে। সবাই অবাক হয়ে যায়। যে পরের বউকে এইমাত্র তার সোয়ামির ঘরে পাঠিয়ে দিল, সে নিজে কি করে পরের বউয়ের সঙ্গে সবা'ব সামনে কানাকানি করে? আবার ভিনদেশি মানুষ হয়ে? ভিতরে ভিতরে তালে জবর সিংও জটাধারী কপালি সোব্‌ এক জোয়ালেরই বলদ!

সেদিনের কথা কুইলি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। কেমন যেন সব একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে ঘটে গেল। যত ঘটনা, সব কি মানুষ আর মাটি নিয়ে? আশ্চর্য! আর এতকিছু সব ঘটে গেল মাত্র একদিনেই। মঙ্গি তার

নেশুড়ে সোয়ামি পাঁচু কপালির ঘরে ফিরে গেছে, জটার বউ তার তিনটে বাচ্চা মেয়্যে নিয়ে ফিরে গেছে জটার ঘরে। সব দিক শান্তি! কিন্তু জটার কথা সে ভুলতে পারে না। জন্ম থেকেই সে জটাভাইকে দেঁখে আসছে। এমন তো সে কোনদিন ছিল না। ছোটবেলা থেকেই সে জটাধারী। তা দেখে সবাই মনে করতো, ওর ওপরে ভগমানের কিছু বাড়তি দয়া আছে। একটু বয়েস হলে সে নিজেও তাই ভাবতে শুরু করে। গাঁয়ে কোন কিছু ঘটলে সে এমন সব কথা বলে ফেলতো, সবাই অবাক হয়ে যেত তার কথা শুনে। কেউ তার কথা নির্বিবাদে বিশ্বাস করতো, কেউ বা করতো না। যারা তার কথা বিশ্বাস করতো না, তাদের ওপর সে ভীষণ চটে যেত। তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতো সে। তার ফলে, এক সময় গাঁয়ে সে বড়ো একা হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে বেশি মিল মেঘু কপালির ছেল্যে বংশী কপালির। দুজনেই একটু খ্যাপা। গাঁয়ের মানুষজনের সঙ্গে এই দু'জনের বিশেষ সুসম্পর্ক নেই। নিজেদের বিশ্বাস এবং ভালোমন্দ ভাবনা-চিন্তা নিয়ে দিন কাটতো ওদের। এমন সময় দূর থেকে গাঁয়ে এসে লাগলো তেভাগা আন্দোলনের রেশ : লাঙল যার জমিন তার। বংশী তার লাখেরাজ জমিনের পাট্টা পাবার আশায় বুক বাঁধলো। তার সিকস্তি পাঁচ বিঘে লাখেরাজের মৌরসি পাট্টা হয়ে যাবে। আর ইচ্ছে করলেই কেউ তার জমিন কেড়ে নিতে পারবেনা।

তারপরই গাঁয়ে ফিরে এলো পরাণ। শহর কলকাতার এক ঝলক হাওয়া সে শহর কলকাতা থেকে বয়ে নিয়ে এলো কপালি পাড়ায়। আকালের সনে সে আর তার মা বাতাসীকে ফেলে পালিয়ে যায়। বাতাসী তখন নিরুপায়। সেদিন গাঁ ছাড়ছিল চিরকালের একগুঁয়ে একরোখা বংশী। গাঁয়ের সঙ্গে ওর কোনদিন কোন সুসম্পর্ক ছিল না। বাতাসী কেঁদে-ককিয়ে ওর মন গলিয়ে ধরলো ওর হাত। সুখে দুঃখে বেশ ক'বছর বংশীর সঙ্গে ঘর করার পর পরাণের সঙ্গে পালিয়ে গেল বাতাসী। তখন ওর সাধের জমিন নিয়ে বংশীর সঙ্গে খোকন বক্সির কাজিয়া তুঙ্গে। রাগে অভিমানে গাঁ আর তার জমিনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে লিয়ে বংশী হয়ে যায় নিরুদ্দেশ। তার ফেলে-যাওয়া সদ্য-ফলন্ত জমিনের দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল গাঁ-বুড়ো জটাভাইকে। মধুয়া ভাই জটাকে খুব বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু জটাভাই বংশীভাইর জমিনের ফসলে কয়েক সনের মধ্যেই মনিষ্যির গোদা পায়ের মতন উঠলেন ফুলে ফেঁপে। গেরুয়া ছাড়লেন, মাথার জটা কাটলেন, 'বে' করলেন' আর গাঁয়ের কাউকে জানতে না দিয়ে নিজের নামে বংশীভাইর জমিন 'বর্গা' লিখায়ে নিলেন। দশ সন বাদে বংশীভাই ফিরে এসে দেখলেন, উর জমিন আর উর নেই। ইখোন খোকন বক্সি লয়, জমিন মালিক হয়েছেন কপালিপাড়ার গাঁ-বুড়ো জটা কপালি। জটা কোঠাবাড়ি তুলেছেন। চাঁপাবনির পাঁচু কপালির বউকে ভাগিয়ে লিয়ে এসে 'বে' করেছেন। আর পোড়াকপালি কুইলির হয়েছে যত পেয়াড়। মধুয়াভাই উকে বংশীভাইর ঘরটার দেখাশুনার ভার দিয়ে সেই যে উধাও হয়ে

গেছেন, ইখোনো উ নিপাত্তা। জটাভাই এতদিন সাধু সেজে ছিলেন। ইখোন উর ধরেছেন মেয়্যেমনিষ্যির রোগ। কিছুদিন কুইলির আর সিমলির শরীলের দিকে খুব লজর দিয়েছিলেন উ। কুইলির কাছ থিকে জোর ঝামটা খেয়ে উ পাঁচু কপালির বউ মঙ্গিকে লুকিয়ে 'বে' করে কেলেঙ্কারির একশেষ করে ছাড়লেন। বুধিয়া উদিন খবর লিয়ে এলেন, মধুয়া ভাইর ফেরার থাকার আর পেয়োজন নেই—মামলা খতম হয়ে গেছেন। কুইলির এখন একটাই প্রশ্ন। মধুয়া ভাইর নামে মামলা যদি খতম হয়ে গিয়ে থাকেন, তা'লে উ গাঁয়ে আসছেন নি ক্যানে? ক্যানে দেরি করছেন? মধুয়া ভাই এলে কুইলি মনে ইকটু জোর পেতেন। কুইলি ভাবে, বংশী যদি গাঁ ছেড়ে জমিন ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে না যেত, তাহলে তার জমিনও হাতছাড়া হতো না। জটাও হয়তো মাথার জটা ছাড়তো না, 'বে' করতো না, জলশিয়রের কপালিপাড়ার এত ঘটনাও ঘটতো না। সমস্ত কিছুর মূলে বংশীর জমিন। এই ক'বছর একা একা থেকে সব বিষয় খুব তলিয়ে ভাববার ফলে তার চিন্তাগুলো খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে। যা কেউ বুঝতে পারছে না, ভাবতে পারছে না, ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছে না, খালি হাতে জলের তলার মাছ ধরার মতো সে আজ খুব সহজে সব কিছু বেশ ধরে ফেলতে পারে।

এখন যে বুঝতে পারে, বংশীর ভুলের মাশুল এতদিন ওকে দিয়ে আসতে হয়েছে, এখনো ওকে দিয়ে যেতে হচ্ছে। একথা ঠিক, বংশী ভাবতে পারে নি, বাতাসী কোনদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে। সে নিজের চোখে দেখেছে , বংশী বাতাসীকে কি গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। দেখে মনে হত, বাতাসীও ওকে খুব ভালোবাসে। ওকে হয়তো সত্যিসত্যি গভীর ভালোবেসেছিল ও। তবু পরাণ গাঁয়ে একবার ফেরার পর কী যে হলো বাতাসীব, তার সেই ভালোবাসার ভিত যেন নড়ে গেল। সে একবারও কি ভেবেছিল, পরাণের সঙ্গে ওর 'বে' হলেও পরাণ আর ওর মা ওকে মনিষ্যি বলে গেরাহ্যি না করে অকথ্য নির্যাতন করেছে ওর ওপরে। আকালের সনে ওকে মৃত্যুর হাতে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে নিরাপদ জায়গায়। সেদিন তো বাতাসী মরেও যেতে পারতো। বংশী ওকে মরতে দেয় নি। সুখে-দুঃখে আকালের ভয়ঙ্কর দিনগুলো কাটিয়ে বংশী ওকে নিজের বে-করা বউর মতো সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছে গাঁয়ের মাটি আর জমিনের টানে। গাঁয়ের মনিষ্যিরা সোব্বাই মেনে নিয়েছিল ব্যাপারটা পরাণ গাঁয়ের কাছে বিচার দিয়েছিল। গাঁয়ের সোব্বাই বংশীর পক্ষেই রায় দিয়েছিল পরাণ আর তার মায়ের আচরণ আর আকালের সনের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভেবে। তবু বাতাসী বংশীর সঙ্গে তার এতদিনের বাঁধা ঘর ভেঙে দিয়ে একদিন রাতের অন্ধকারে সেই পরাণের সঙ্গেই গেল পালিয়ে। কুইলি মনে করে, বাতাসী বংশীর সঙ্গে বেইমানি করেছে। খোকন বক্সির জন্যে ওর জমিনও বেইমানি করেছে ওর সঙ্গে। গাঁয়ের মনিষ্যিরা মধুয়ার কথায় ওর জমিন রক্ষা করেছে। কিন্তু বংশী আর ফেরে নি। বাতাসী

শুধু যে ওর ঘর ভেঙে দিয়ে গেছে, তা নয়, ওর নিঃসঙ্গ মন আর চওড়া বুকটাও সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে গেছে। সেই থেকে বংশী বোধ হয় আর ঘরের স্বপ্ন দেখে নি।

কিন্তু কুইলি? কিসের আশায় সে দশ-দশটা সন বংশীর ঘর আগলে বসে আছে? কেন সে জটার 'লালচ' থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে জটার খপ্পর থেকে ওর জমিনটা কেড়ে আনবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে? সে কি বংশীকে ভালোবাসে?

কুইলির বুকের ভেতরটা কেমন যেন টনটন করে ওঠে। বংশীর জন্যে কেন ওর এমনটা হয়? কেন ওর মনের ভেতরটা ঠিক কাপড় নিঙড়োবার মতো এমন দুরন্তভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে। সে কি ওর একগুঁয়ে একরোখা স্বভাবের জন্যে? নাকি ওর উদ্ধত পৌরুষ? ভালোবাসার মরদ হিসেবে বংশীর তুলনা নেই। কুইলি দেখেছে, বংশী কী দুর্দান্ত ভালোবেসেছিল বাতাসীকে! এখনো কি সে বাতাসীকে তেমনি ভালোবাসে? দশ সনের ঝড়-বৃষ্টি ধুলোকাদায় তার সেই ভালোবাসা কি একটুও আব্‌ছা হয়ে যায় নি? এখনো সে কি মনের ভেতব সেদিনের বাতাসীকে সমুদ্দুরের আঠালো তারামাছের মতন আঁকড়ে রয়েছে? মনে হয় না। সমুদ্দুরের চরের বালিতে কোন দাগ, তা যত গভীরেই হোক, বেশিক্ষণ থাকে না। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে নিঃশেষে মুছে নিয়ে যায়। আর কিছুই বাকি থাকে না তার। যেটুকু থাকে, তা শুধু স্মৃতি। তাও বেশিদিন মনিষ্যির মনে ছায়া ফেলে পড়ে থাকে না। তাহলে বংশীর মনে কুইলির জন্যে কি কোন স্থান নেই? সকাল থেকে দুপুর, আবার বিকেল থেকে রাত্তির— সে বংশীর ঘরের দেয়ালের সঙ্গে দেয়াল, দরজার সঙ্গে দরজা হয়ে মিশে থাকে। বংশী ফিরে আসার পরে যেমন, বংশী যখন ছিল না, তখনও। মধুয়াভাই বলে গেছে, তাই। শুধু কি মধুয়া ভাই বলে গেছে বলেই কি সে এত সন সে এই গুরুভার বয়ে নিয়ে চলেছে? গাঁয়ের লোকেরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কত সব বিশ্রী-বিশ্রী মন্তব্য করে, ইঙ্গিত করে কত কুৎসিত ধরনের। কোন কিছুই তোয়াক্কা করে না ও। বংশীর একগুঁয়েমি ওকেও একরকমের একরোখা করে তুলেছে। কারণ সে মনে মনে জানে, বংশী ওকে ভালোবাসে। সে ভেবে আনন্দ পায়, ভালোবাসার কাঙাল একরোখা এই মনিষ্যিটা যেমন ভালোবাসে তার জমিনকে, ঠিক তেমনটা না হলেও অনেকটা সেই রকমই সে ভালোবাসে কুইলিকে।

এখন বংশী তার জমিনের জন্যে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত। জমিন সে একদিন ফিরে পাবেই। জমিন ফিরে পেলে বংশীকে তার কথা ভাবতেই হবে।

আজ খুব ভোরেই বংশী ঘরে শেকল তুলে দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে। সেদিনের মতো। বুড়োবটতলা ঝাঁট দিয়ে সকালে সে এসে দেখে, বংশী ঘরে নেই। খুব ভোরে যখন পুব আকাশে শুকতারা খিলখিল করে ডগমগ খুশিতে হাসতে থাকে,

তখনই সে বুড়োবটতলা ঝাঁট দিতে শুরু করে। বংশীকে দূরে কোথাও যেতে হলে ওই বুড়োবটতলা দিয়েই যেতে হবে। তাহলে তো কুইলির সঙ্গে ওর নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যেত। ওর সঙ্গে যখন দেখা হয় নি, তখন ও নিশ্চয় আরো আগে বেরিয়ে গেছে, তাহলে দূরে কোথাও গেছে। কোথায় যেতে পারে ও ? চন্ননপুরে ? খোকন বক্‌সির কাছে ? নাকি অন্য কোথাও ?

মাঠে জল দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন বেশ ভালো বৃষ্টি হয়েছে। এখনও মাঠের জল সবটা সরেনি। রোদে-পোড়া জমিন সব জল শুষে নিতে পারে নি। মাঠে মাঠে ব্যাঙ ডাকছে সারাক্ষণ। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। সারা বছরের পর এই তাদের একবার মাত্র মিলন। জোরে নিশ্বাস পড়লো তার একটা। যেন বুকের ভেতরটা তার একেবারে খালি হয়ে গেল।

চন্ননপুরের রাস্তাটা তালবাঁধের কাছে বাঁক ঘুরে বড়ো ধীর মন্থর গতিতে কৈবর্তপাড়াব বুকের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কৈবর্তপাড়া বেশ দূরেই। কিন্তু সামনের মাঠটা জলে ভরে গেলেই কৈবর্তপাড়া যেন অনেকটা কাছে সরে আসে। ওর কুঁড়েঘব আর গাছগাছালিগুলানেব ফাঁকে সব সময় মিহিন কুয়াশার মতো একটা ধোঁয়াটে ছায়া জমে থাকে। আজ আবাব কৈবর্তপাড়ার মাথার ওপরে আকাশে একফালি কালো মেঘ লেপ্‌টে আছে। কিছুক্ষণ হলো। সবছে না। একটা বকের সারি ওর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ঠিক একখানা শাদা পুঁতির মালার মতো। ওদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে ওঠে।

কুইলি ওদিকে তাকিযে বেশিক্ষণ দাঁড়িযে থাকতে পারে না। সরে আসে। বুড়োবটতলা থেকে ফিরে চলে। বংশীর জন্যে ভাত রাঁধতে হবে। বেলা অনেক হলো।

গাঁয়ের রাস্তাব বাঁকটা ঘুরলেই দূর থেকে মধুয়াভাইদের ঘরের আগড়টা চোখে পড়ে। ওখানে দাঁড়ালে কৈবর্তপাড়া আর কৈবর্তপাড়াব চেনা রাস্তাটা আরো পরিষ্কার দেখা যায়। পুলি ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৈবর্তপাড়ার রাস্তার দিকে তাকিয়ে। সেও কি জলে -কানাকানি মাঠের ওপাবের কৈবর্তপাড়াকে আড়মোড়া ভেঙে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখছে ? কৈবর্তপাড়ার মাথার ওপরে কালো একখানা অনড় মেঘের ফালি, তার গায়ে গা দিয়ে উড়েযাওয়া শাদা বকের সারি তারও চোখে পড়েছে ? আর, মৃদু মন্থর যে রাস্তাটা কৈবর্তপাড়াটাকে গেঁথে নিয়ে সোজা চলে গেছে চন্ননপুরের হাটের দিকে, পুলি চেয়ে থাকে ওদিকে। রাস্তায় সে ঘরমুখো একটি মনিষ্যির চলমান ছায়াকে খোঁজে। বেশ বড়ো-বড়ো পা ফেলে সে আসবে। সেই চেনা মনিষ্যির পায়ের শব্দে জলশিয়রের কপালিপাড়ার রাস্তাটা একবার শিউরে উঠবে। হঠাৎ-জেগে-ওঠা কৌতূহলী রাস্তাটা তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবে ওই ছোট্ট আগড়টার সামনে।

কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক থাকে। এমন যে এমন মধুয়াভাইর বউ পুলি, ওরও গায়ে

লাগে কলঙ্কের কালি। কেন এমন হয়? কুইলি ভাবতে ভাবতে চলে। শরীল কি কুনো মনিষ্যিকে নিষ্কলঙ্ক থাকতি দিবেন নি?

সেদিন রাতে জটাভাইর উঠোনে দাঁড়িয়ে পুলি ভিন্‌দেশি মরদ জবর সিংয়ের সঙ্গে কানে কানে কী কথা বলছিল? সবাই দেখেছে। সবার ঘরের খবর থাকে পুলির নখের আয়নায়। কিন্তু ওর ঘরের খবর কেউ জানতে পারে না। বাইরে যে এমন খুব হাসিখুশি, হুল্লুড়ে মধুয়ার বউ পাড়ার সবার পেছনে লাগে, রঙ্গ-তামাশা করে, সবাই বলে, মধুয়ার বউর কথা শুনলি মরা মনিষ্যিও হেসে ওঠেন, ভেতরে সেই মধুয়ার বউর মুখে কিন্তু কুলুপ আঁটা। কেউ কোনদিন ওর পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারে নি। মধুয়াভাই আন্দুলন করেন, ফৌজদারি মামলার ফেরারী আসামী, কুথায় কখন থাকেন, কুনো ঠিক নেই। বউ সোব্ জানেন। কিন্তু গাঁয়ের মনিষ্যিরা ক্যানে, পুলিশের ও মধুয়াভাই সম্পোক্কে কুনো কথা উর পেট থেকে বের করতি পেরেছেন? গাঁয়ের সোব্‌বাইকে বোঝা যায়েন, কিন্তুক মধুয়াভাইর বউকে বোঝা যায়েন নি। বড়ো দুজ্জয় মেয়্যেমনিষ্যি পুলি।

: কি রে কুইলি, বংশীভাইকে কুথায় ছেড়ে এলি?

পুলির মুখেচোখে একটা চাপা হাসির ঝিলিক।

: খুব ভোরে কুথায় চলি গেছেন—

: তোকে না জানিয়ে?

মুখে চুকচুক্ শব্দ করে পুলি।

শুনে হেসে ফেলে কুইলি। ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে থাকে। ওর কপালে আলোর ঝিলিক, চোখে আলোর ঝিলিক, হাসিতে আলোর ঝিলিক। ডাকে : বউ—

কুইলি কিছু না বলে ওর মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

: কিরে, ডেকে চুপ মেরে গেলি ক্যানে? কি বলছিস, বল?

: বউ, তালবাঁধের ধারে তালগাছে বাবুই পাখির বাসা ঝুলতি দেখেছিস্? উর দুটো মুখ। ইকটা মুখ বন্ধ, ইকটা মুখ খোলা। ক্যানে বল্ ত, বউ?

পুলি ধরা পড়ে গেছে। অন্তত কুইলি তাকে ধরে ফেলেছে। তাই সে হেসে ওঠে কুলকুল করে। পুলিকে সব সময়ই সুন্দর লাগে। হাসলে আরও সুন্দর লাগে। বলে : তুই জানতি পেরেছিস? ভেবেছিলুম কেউ জানতি লারবেন। তুই জেনেছিস, জেনেছিস। কাউকে কিছু বলিস নি, কুইলি। আমার মাথা ছুঁয়ে বল।

: বলব নি। কিন্তু ইকটা কথা তোকে পুছ্ করি। তুই শেষে কিনা খোকন বক্‌সির দারোয়ান উই জবর সিংয়ের সাথে। ছি ছি। না না, ই আমি মানতে লারব। মধুয়াভাই যদি জানতি পারেন?

: তুই বলিস নি, কুইলি। বুন আমার! তুই যদি না বলিস, উ জানতি লারবেন। আর, তুই যদি বল্লে দিস—

: বল্‌ব নি, কুনোদিন বল্‌ব নি। কিন্তুক বউ, তুই কামটা ঠিক করিস নি। ইকটা ভিন্‌দেশি পরপুরুষের সাথে ইভাবে তোর বাড়াবাড়ি—

: কি করব, বল্‌? উ কি কুনোদিন কুনো কথা শুনেন? উদিন দেখলি নি? সোব্‌বার সামনে কী কাণ্ড করলেন!

: তুই সরে গেলি নি ক্যানে?

: সরে যাব? তা'লে বাঁচতি দিবেন আমাকে? হাতে কত বড় বন্দুক আছেন নি, উর?

: তা বলি সোব্‌বার সামনে তোর সাথে কানে কানে—

: কানে কানে ফের কী বললেন, জানিস?

: বলিস নি। আমার্‌ ভাল লাগেন নি উ সোব্‌ শুন্‌তি—

: বললেন, মাঝরাত্তিরে যাব তোর কাছে—

: এ্যাঁ? সব্বোনাশ!

: হঁ।

পুলি একটু থামে। তারপর বলে: দ্যাখ্‌ কুইলি, আম্মো ত ইকটা মেয়্যেমনিষ্যি। শরীলে যৌবন আছেন। ই যৌবন হচ্ছেন গিয়ে সমুদ্দুরের জোয়ারের ঢেউ। আসেন, আর সকটু থেকে চলি যায়েন। শুকনা চরে পড়ে থাকেন শুধু বালি আর বালি। ইকটু ভোগ করব নি ত ভগমান শরীল দিলেন ক্যানে? জটাকে দ্যাখ্‌, সাধু হয়ে কেমন ভোগ করছেন--

: উ ইকটা মনিষ্যি নি কি?

: জানোয়ারও ভোগ করেন, মনিষ্যিও ভোগ করেন!

: বউ, ই সোব্‌ তুই আজ কি বলছিস?

: সোব্‌ মনিষ্যিই জানোয়ার।

পুলি হাসতে থাকে। কুইলির বিস্মিত মুখ দেখে হাসতেই থাকে।

: আমি যাই রে, বউ। তোর মাথাটা আজ কেমন খারাপ হয়ে গেছেন।

: উ উই দাড়িঅলা পাগাড়িবাঁধা মনিষ্যিটার জন্যে।

কুইলি পুলির মুখখানা ভালো করে জরিপ করে। পুলি হাসছে না। কিন্তু দু' চোখের কোণে যেন অনেক হাসি জমে আছে।

: আচ্ছা বউ, মধুয়া ভাই যদি কুনোদিন জানতে পারেন?

: আমি সোজা ঘর ছেড়ে চলি যাব।

: কুথায়?

: ক্যানে? জবর সিং আমাকে অনেক দূরে কুথায় নিয়ে চলি যাবেন বলেছেন।

: তুই লারবি চলি যেতে।

: ক্যানে লারব? উ ঘরে থাকবেন নি—ইখানে-উখানে ঘুরে বেড়াবেন আর আমি একা-একা ঘরে পড়ে কাঁদতি থাকব, নি? উ আন্দুলন করছেন, চাষীদের

জমিন পাইয়ে দিচ্ছেন। উতে আমার কী? আমি জমিন চাই না, গয়না চাই না। আমি চাই, উ ঘরে থাকুন। আমি আর দু'মাস দেখব। আসেন ভাল, না এলি, আমি জবর সিংয়ের সাথে কুথাও চলি যাব। হঁ, সত্যি চলি যাব। দেখিস্—

কুইলি আর দাঁড়ায় না। উর ইখোন অনেক কাম। যেতে যেতে বলে যায়: যাবি ত যাবি। ডর দেখাস্ কাকে?

ঘরে এসে কুইলি সবে চুলা ধরিয়ে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে, দাওয়ায় সে কার পায়ের শব্দ শুনলো।

ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে রইলো সে। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো শ্যামা—রঘুর বউ।

: অ— বউ, তুই? ভিতরে আয়—

: বংশীভাই ঘরে নেই?

চুলায় কতকগুলো শুক্‌নো ডালপালা গুঁজে দিয়ে বলে: সাত সকালে উঠে কুথায় বেরিয়ে গেছেন।

: কি হয়েছেন? তুই ত ই সোময়ে আসিস্ না, বউ। কি হয়েছেন রে?

ঘরের ভেতরে আলো কম। দরজা আর জানলা গলে যেটুকু আসে, তাতেই কাজ চলে যায়। চুলার আগুনের আলোয় একটু বেশি আলো হয়। কিন্তু সেই বাড়তি আলোটা শ্যামার মুখে কাঁপছে। ওর শক্ত মুখ আর গোল-গোল বড়ো-বড়ো চোখ দুটোকে সেই আলোয় বেশ ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছে।

: কি হয়েছেন? অমন চোখ মুখ পাকিয়ে এসেছিস ক্যানে?

শ্যামা একবার দরজার দিকে তাকায়।

: আমি ই আসমানফাঁদি মেয়্যেকে ঘরে রাখতি লারব। উকে তুই তোর কাছে রাখ্। তোর কড়া লজরে থাকবেন।

: কুথায় সিমলি? সিমলি —

কুইলি ডাকে।

সিমলি চুপি চুপি ঘরে আসে। আগুন জ্বলার শব্দ শোনা যায় তো সিমলির পায়ের কোন শব্দ শোনা যায় না। কুইলি তাই বলে: সিমলি আমাদের বড় সুলক্ষণা। দেখিস না উ চললি উর পায়ে কুনো আওয়াজ শোনা যায়ে নি। লক্ষ্মী যখন আসেন, ঠাকরুণের পায়েও এমনি কুনো আওয়াজ হয়েন না। দেখবি, উ আমাদের রাজরাণী হবেন।

: হঁ। রাজরাণী হবেন? উ রাজরাণী হবেন ত জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবেন কে?

শ্যামার মুখ-ঝাম্‌টা শোনা যায়।

সিমলি ভয়ে ভয়ে কুইলির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

: কুথায় গিয়েছিলি তুই?

কুইলি কড়া গলায় শুধোয়।

: কুথাও যাই নি, পিসি।

: কুথাও যাই নি, পিসি!

শ্যামার গলায় খাঁটি সর্ষে তেলের ঝাঁঝ: তুই তেমনি সত্যবতী কিনা! থাক্ পিসির কাছে। ইখান থিকে কুথাও একপা যাবি নি।

শ্যামা চলে যায়। সিমলি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কুইলি জিজ্ঞেস করে: গেছেন?

সিমলি দাওয়ায় উঁকি মেরে দেখে আসে।

: গেছেন।

: কুথায় গিছিলি তুই?

: কুথাও যাই নি পিসি।

: বউ যে বলে গেলেন।

: মা এমনি বলেন, তুই ত জানিস্—

: মা এমনি বলেন? আর তুই খুব সত্যবতী? বুধিয়া কুথায়?

সিমলি পাশেই মেঝেয় বসে পড়ে।

: আমি জানি নি কি, উ কুথায়?

: ফের মিছা কথা!

: তুই সর্, পিসি, আমি চুলা দেখ্ছি—

সিমলি পিসির হাত থেকে আগুন খোঁচাবার কাঠিটা কেড়ে নেয়।

: মার হাত থিকে এমনি ইকটু-আধটু কাম কেড়ে লিয়ে করলি ত পারিস্—

: আমার ভাল লাগেন নি।

: ভাল লাগেন নি? তা'লে তোর কি ভাল লাগেন?

: মা খালি বকেন—

: আর আমি তোকে পূজা করি?

: তুই ভালবাসিস্—

: একদম বাসি না। কে বাসবেন ইমোন মেয়্যেকে, যে একদম কথা শুনেন নি?

: আমি রাজরাণী হব।

: তা'লে কথা শুনিস নি ক্যানে?

: তোর কথা শুনি ত।

কুইলির গলা জড়িয়ে ধরে সিমলি বলে। কুইলি ওর নরম গাল দুটিতে চুমু খায়।

: ইখোন বল্, বুধিয়া কুথায়?

: ই ঘরের পিছনে লুকিয়ে আছেন-টাছেন হয়ত। আমি কি জানি?

: উকে ডেকে লিয়ে আয়।

সিমলি বেরিয়ে গিয়ে বুধিয়াকে ডেকে নিয়ে আসে। কাছেই কোথাও ছিল বুধিয়া।

: এসেছেন।

সিমলি চুলার কাছে যায়। হাঁড়িতে তখন ফুট লেগেছে।

কুইলি বাইরে বেরিয়ে আসে।

: কিরে, বুধিয়া? ইভাবে কদ্দিন চলবেন?

বুধিয়া কুইলির চোখের দিকে তাকাতে পারে না।

: বেলা কত হয়েছেন, খ্যাল আছেন? শুধু পাশই দিয়েছিস বাবুদের মতন। ঘটে বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু হয়েন নি। কি রে? কত দূর যেতি হবেন। হবেন নি? ইখানে ঘুরে বেড়ালি হবেন? ঘরে যাবি নি?

: ঘর ত আমার নেই, পিসি—

: ক্যানে? যেখানে ছিলি?

: উখানে আর নেই। বলে দিয়েছেন, উখানে আর থাকা চলবেন নি।

: তা'লে থাকিস কুথায়?

: কুথাও লয়।

: উ কী কথা রে? কুথাও থাকিস নি— উ কেমন করে হয়েন।

: ইখানে উখানে, যেখানে হয়েন। কুনো ঠিক নেই। ইকটা মাস্টারি হলে ঘর বানাব।

: হঁ। ঘর বানাবি। কোঠাবাড়ি। আমার মেয়েকে রাজরাণী করতি হবেন। কি রে? পারবি ত? আমার কথাটা যেন থাকেন।

: চেষ্টা করব, পিসি—

রাস্তার মুখে আগড় খোলার শব্দ হলো। তারপর পায়ের আওয়াজে বোঝা গেল, বংশী আসছে। গাঁয়ের লোকে বলে, বংশী যে রাস্তায় চলেন, উ রাস্তায় আর দুরমুশ করতি লাগবেন নি।

বুধিয়া চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। বংশী কি ভেবে ওর দিকে একবার তাকায়। ঘামে সমস্ত মুখটা বংশীর জাব্জাব্ করছে। চোখ দুটো লাল। রোদ্দুর মাথায় নিয়ে অনেকটা রাস্তা দুরমুশ করতে করতে সে এসেছে। বুধিয়াকে ঠিক চিনতে পারে নি সে। জিজ্ঞেস করে: ইটা কে?

কুইলি বলে: বুধিয়া—

বংশী দাওয়ার ধারটাতে বসে পড়ে। কপালের গামছাটা খুলে মুখ মোছে।

: কুইলি, এক ঘটি জল দে—

বুধিয়া দাঁড়িয়ে ছিল। এবার চলে যাচ্ছে।

বংশী ডাকে: বুধিয়া, দাঁড়া। কথা আছেন—

বুধিয়া দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে বংশীর কি বলার থাকতে পারে? ও এখন এগাঁয়ের

কেউ নয়। ঘরজমিন বলতে এখন ওর কিছুই নেই। তবে সে এমন কিছু কাজ করে, যা বংশীর জানার কথা নয়।

কুইলি ঘরের ভেতর থেকে জলের ঘটি এনে বংশীর হাতে এগিয়ে দেয়। ঘটাং ঘটাং শব্দে শুকনো গলায় জল ঢালে বংশী। ওর জল খাওয়া শেষ হলে কুইলি বলে : মধুয়াভাইর মামলা যে খতম হয়ে গেছেন, উর আর জেল-হাজত হবেন নি, উ খবরটা উই পরথম লিয়ে এসেছিলেন গাঁয়ে—

বংশী একবার কুইলির মুখে, একবার বুধিয়ার মুখে তাকায়।

: তাই নি কি রে, বুধিয়া? তা'লে তুই ইদিকে আয়। বস্ কাছে— বুধিয়া বংশীকে খুব ভয় পায়। সেই ছোটবেলা থেকেই। ওর ডাকে বুধিয়ার সেই ভয় যায় না। সে আস্তে আস্তে এসে বংশীর সামনে পা ভাঁজ করে বসে।

: মধুয়ার সাথে তোর দেখা হয়েন?

: হঁ, হয়েন।

: উর ত আর জেল-হাজতের ভয় নেই। ত উনি গাঁয়ে আসছেন নি ক্যানে?

: উকে অনেক কাম করতি হয়েন। কখনো দিনের বেলা, কখনো রাতের আন্ধারে, যখন যেমন সুবিধা।

: গাঁয়ে আসবেন কবে? ইখানেও ত অনেক কাম আছেন।

: সামনে পঞ্চায়েতের ভোট আসছেন ত। উই লিয়ে উকে ঘুরতি হয়েন। ভোটের পরে আসতি পারেন, তেমন হলি ভোটের আগেও আসতি পারেন।

বংশীকে একটু চিন্তিত দেখালো। সে বুঝতে পেরেছে, মধুয়ার সঙ্গে বুধিয়ার দেখা হয়, যোগাযোগ আছে। মনে হয়, বুধিয়া মধুয়ার দলে আছে: কু-লোকে কু-কথা বলেন, মধুয়া নি কি ডাকাত, মধুয়া নি কি খুনী— উ মানুষজনকে খুন করেন? সত্যি কি মধুয়া ডাকাতি করেন? মানুষজনকে খুন করেন?

বুধিয়া উঠে দাঁড়ায়।

: আমি তা'লে যাই, বংশীকাকা—

বংশী চিন্তায় পড়ে। সে বলে : কুথায় যাবি এত বিলায়? ইখানেই দু'টা ভাত খেয়ে বৈকালেই চলি যাস।

এমনি আত্তিথেয়তা বংশী বোধহয় জীবনে কখনো দেখায় নি। বুধিয়া অবাক হয়ে যায়। কুইলিও অবাক হয়ে যায়। বংশী নিজেও কম অবাক হয় নি। বুধিয়াকে আজ সে বড়ো নিজের মানুষ মনে করছে—যেন খুব কাছের মানুষ।

দক্ষিণের এক ঝলক বাতাস যেন কুইলির বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে দেয়।

: বুধিয়া ইখোন আর আগের বুধিয়া নেই। উ ইকটা পাশ দিয়েছেন। ভদ্দরলোকের মতন ইস্কুলের মাস্টর হবেন। চন্নপুর, বিষ্টুপুর, বলরামগড়ির নেতারা উকে লিয়ে মিটিন করেন।

বুধিয়া আড়চোখে বংশীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মুখ নামালো। বংশীর মুখ দেখে মনে হলো না, কুইলির কথা সে সবটা শুনেছে। শুনে থাকলেও সে যে ব্যাপারটাতে মনে মনে খুব একটা উল্লসিত হয়েছে, তাও মনে হলো না।

কুইলি ব্যস্ত পায়ে ঘরের ভেতর যায়। সিমলি দিব্যি চুলা জ্বালিয়ে রেখেছে। টগবগ করে ভাত ফুটছে।

: ভাতটা তুই নামাতে পারবি, সিমলি? আমি তা'লে পুকুর থিকে ফট্ করে ইকটা মাছ ধরে আনি। আজ বুধিয়া ইখানে খাবেন।

শুনে খুশিতে ডগমগ করে উঠে সিমলির টলটলে মুখখানা।

: সত্যি পিসি, উ আজ ইখানে খাবেন?

: ভাত টগবগিয়ে ফুটছেন, লয়?

: হুঁ?

: কুথায়? হাঁড়িতে না তোর মনে?

: পিসি, তুই ভারী—

: দেখিস, গলে যায়েন না যেন—

কুইলি মাছ ধরতে ডোবার ঘাটের দিকে যেতে যেতে দ্যাখে, বংশী আর বুধিয়া দুজনে দুদিকে চেয়ে বসে আছে। কেউ কাউকে বুঝে উঠতে পারছে না। উঠোনে রোদ্দুর যেন অসীম আলিস্যিতে গা ঢেলে দিয়েছে। মাটি থেকে রোদ্দুরের ভাপের গন্ধ মিশে আছে। ক'দিন আগে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। হাওয়া নেই। সামনের খেজুরগাছটা প্রাণ ভরে জল আর রোদ্দুর পান করে এখন যেন ঝিমুচ্ছে।

একটা কুটুমপাখি ঠিক তখনই দুপুরের নিস্তব্ধতাকে ফালা-ফালা করে ডেকে উঠলো। সেই ডাক শুনে হঠাৎ বংশীর বুকের ভেতরে খুব জোরে একটা ঝাঁকি লাগলো। ওর গোরুর গাড়ির চাকা রাস্তার খোদলে পড়লে এরকম একটা ঝাঁকি লাগল। পাখিটা বার কয়েক বেশ মিষ্টি গলায় ডেকে মধুয়ার ঘরের দিকে উড়ে গেল। বংশী বুধিয়ার মুখের দিকে তাকালো। বুধিয়াও বংশীর মুখের দিকে তাকালো। কেউ কোন কথা বললো না। চুপচাপ বসে রইলো।

কুইলি ভিজে কাপড়ে মাছ ধরে নিয়ে এলো। মাছ রান্না করে দুজনকে খেতে দিল। বুধিয়া এক ফাঁকে ডোবায় একটা ডুব দিয়ে এসেছে। খেতে খেতে বংশী মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে: মধুয়া তালে এখন ফিরবেন নি, লয়?

: ফিরলেও ফিরতি পারেন।

: কবে ফিরবেন, ঠিক করে বল দি'নি—

: উ আমি বলতি লারব।

: আচ্ছা, তোর সাথে দেখা হবেন?

: হতি পারেন।

: তা'লে উকে ইকটা কথা পুছ্ করবি ?

: কি ?

: আমার জমিন কি আমার হবেন ? না, জটা কব্জা করে রাখবেন ?

: তোর জমিন উ কব্জা করে রাখবেন ক্যানে ?

খাওয়া বন্ধ রেখে বংশী বুধিয়ার সদ্য-গোঁফ-ওঠা মুখখানার দিকে চেয়ে থাকে।

: ক্যানে লয় রে, বুধিয়া। উ কব্জা করে রেখেছেন।

: তোর ত আর জমিন নেই। উইটাই ত তোর একমাত্র জমিন।

: হুঁ।

: উ বেআইনি। আমি জগৎ সরদারকে বলে ভাগবোর্ডে দরখাস্ত করাব। উ তোর জমিন। তোরই হবেন।

বংশীর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। টান-টান উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে।

: তুই জগৎ সরদারকে চিনিস ?

: চিনি না ? বিষ্টুপুরের জগৎ সরদারকে সোব্বাই চেনেন। উ ত আমাদের সোব্ কেস্ই করেন।

: আমাদের বলতি ?

: আমাদের বলতি আমাদের। যাদের কুনো জমিন নেই।

: তা'লে বুধিয়া, বাপ, শুন্। আজ সোকালে আমি বিষ্টুপুরের জগৎ সরদারের কাছে গিয়েছিলুম। উ ইকটা কাগজে বুড়া আঙুলের ছাপ লিয়ে বললেন, ঘরে চলে যা। আমার কুনো কথা ভাল করে শুনলেন নি।

: আগে শুনেছেন ত ? তা হলেই হবেন।

: আমার ভঁরসা হয়েন নি, বুধিয়া। উ কুনো কথা বলতি চায়েন না, কুনো কথা শুনতিও চায়েন না। যেন কেমন তারা—

: উ উই রকমই। কিন্তুক খুব কামের লোক। আমাদের লাইনে উর খুব নামডাক। আমি তোর কথা উকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিব। যাতে জটা কাকা কুনো সুবিধা করতে লারেন—

: ঠিক বলবি ?

: বলব মানে ? আমি কালই যাব। তোর জমিন লিয়ে ইতো বড় অন্যায় কাম হবেন, ই মধুয়াকাকা হতি দিবেন নি, আম্মো হতি দিব নি।

: মধুয়ার যে দেখা পাচ্ছি নি রে, বুধিয়া।

: তুই দেখা না পেলে কি হবেন ? আমি ত দেখা পাই। আমার সাথে উর দেখা হবেনই। না'লে আমি বললুম কী করে, উর কেস্ ডিস্‌মিস্ হয়ে গেছেন।

বংশীর চোখ দুটো আনন্দে চকচক করে উঠলো। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে তার সান্‌কিটা নিয়ে বুধিয়ার কাছে সরে এলো। সান্‌কিতে পড়ে-থাকা অবশিষ্ট মাছটার কাঁটা বেছে বুধিয়ার মুখে ধরে বলে : ইটা তুই খা, বাপ—

: তুই খা, বংশীকাকা। আমি ত খেয়েছি। পিসি দিয়েছিল।

: দিক্। আমি তোকে নিজের হাতে দিচ্ছি। তুই খা, বাপ আমার!

বুধিয়াকে অগত্যা খেতে হয়। শৈশবেই সে পিতৃহারা। বাপের স্নেহ সে কোনদিন পায় নি। ওর মা ছাড়া ওকে কেউ কোনদিন এভাবে নিজের হাতে খাইয়ে দেয় নি। তাও আবার কপালিপাড়ার বংশীকাকা! যাকে কপালিপাড়ার সবাই যমের মতো ভয় পায়।

কুইলি ঘরের ভেতর পা দিয়ে ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়ে যায়। ওর পেছনে সিমলি। সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি সামলায়। কুইলি বুঝতে না পেরে বংশীকে জিজ্ঞেস করে: কী করছিস তুই?

বংশী বলে: বুধিয়া আমার বাপ। আমার মরা বাপ—

আর বেশি কিছু বলতে পারে না ও। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে।

বুধিয়ার চোখে জল।

বর্ষা শুরু হয়নি। এখনি বর্ষাশেষের ঘুরঘুরে পোকার মতো কয়েকটা কথা বংশীর মনে মাটি তেড়েফুঁড়ে খুব ঘুরঘুর করছে।

বুধিয়া সেদিন ভাত খেয়ে সেই-যে গেছে, আর আসে নি। এলেও দেখা হয় নি। দেখা করবে, তবে তো দেখা হবে। সে যদি এসে লুকিয়ে সিমলির সঙ্গে দেখা করে সটকে পড়ে, দেখা হবে কি করে? সিমলির সঙ্গে ওর গভীর একটা ভাব-ভালোবাসা রয়েছে। সে তা জানে, দেখেছেও। ওতে কুইলির কেমন একটা সস্নেহ প্রশ্রয় আছে। থাকুক। তার টানে সে অন্তত জলশিয়রের কপালিপাড়ায় আসে। তাছাড়া, এ গাঁয়ে আসার তার তো আর কোন টান নেই। ঘর নেই, বাস্তুভিটে নেই, জমিন নেই, মা-বাপ নেই। টান থাকবে কিসে? আছে একমাত্র সিমলি। সেই টান বড়ো টান। সেই টানে সমুদ্দুরের মতো বুকের ভেতরেও জোয়ার আসে।

সেদিন বুধিয়ার সঙ্গে কথা বলে সে বুঝে নিয়েছে, সে মধুয়ার দলে। কিন্তু মধুয়া যে কোন্ দলে, তাই-ই সে জানে না। তার জানার দরকার নেই। তবে বংশী বুঝতে পারে, সেও কখন ভেতরে ভেতরে মধুয়ার দলের হয়ে গেছে। জটার কথা সে বলতে পারবে না। জটা বাদে কপালিপাড়ার বোধহয় সবাই এখন মধুয়ার দলে। এটা কি করে হলো? একদিন সবাই জানতো, মধুয়া ডাকাত, সে মানুষ খুন করে। কিন্তু এখন গাঁয়ের সব কাজে মধুয়ার বুদ্ধি পরামর্শ চাই। যখন ওর নামে মামলা ছিল, হুলিয়া ছিল, সে ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়াতো, তখনও গাঁয়ের মনিষ্যিজনেরা ওর কথা মাথায় তুলে নিয়েছে। ওর দেখা পায় নি, তবুও। ওর কথা শুনে ওরা জটাকে বিশুখুড়ো মারা যাবার পর গাঁ-বুড়ো করেছে। কিন্তু ক'বছরে জটা তার কাজ-মের জন্যে হয়ে গেছে সব চেয়ে একটা ঘৃণ্য মনিষ্যি। ইকটা মনিষ্যি

.আলো থিকে কেমন কালো হলেন— দ্যাখ্, জটাকে দিয়ে দ্যাখ্। আর, মধুয়াকে দ্যাখ্, ঠিক উল্টো—

বুধিয়া, দেখি, মধুয়ার সব খবর রাখেন। উর নামে ইখোন আর মামলা নেই, তবু উ ঘরে ফিরতে পারছেন নি। উর ইখোন নিকি বহুৎ কাজ-কাম। সামনে নিকি পঞ্চায়েতের ভোট। পঞ্চায়েতের ভোট? উ আবার কি? উতে মধুয়ার কী ইমন কাজ-কাম থাকতি পারেন, যার জন্যে উ ঘরে ফিরতি লারছেন? মধুয়ার আরেক ব্যাপার সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। সে যেন কেমন ইকটু অন্য রকম। সবার থিকে উ ইকটু আলাদা স্বভাবের।

তেমনি কেমন একটা অদ্ভুত ছেলে হয়েছে এই বুধিয়া। ছোটবেলাতেই সে বাপকে হারায়। মা ছিল। বংশী জানে, ছোটবেলায় বুধিয়া খুব ব্যামোয় ভুগতো। তারপর মা-ও মারা গেল। সে মামা-মামীর দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মামা ওকে বিষ্টুপুরের এক বৃদ্ধের ঘরে দিয়ে আসে। সেখানে থেকে সে পড়ালিখা শিখেছে, পাশ দিয়েছে একটা। এখন সে হবে মাস্টর। কুনোদিন কুনো কপালি মাস্টর হয়েছেন? আমাদের বুধিয়া হবেন পরথম কপালি মাস্টর। কিন্তুক উর আগেই উ মধুয়ার দলে ভিড়ে কাজ-কাম করছেন। যাদের জমিন নেই, বা জমিন বেহাত হয়ে গেছেন, উই সোব্ গরিব চাষীরা যাতে জমিন পান, উ নিকি উর বেবস্থা করেন। জগৎ সরদারও নিকি উই দলের। উকিল না মোক্তার হয়েও দলের কাম করেন। ইসোব্ মধুয়ারই কেরামতি। উ দেখা দেন না, কিন্তুক ঠিক কাম্ হাসিল করে বেরিয়ে যান। না'লে দশ-চৌদ্দ সন হন্যে হয়ে ঢুঁড়েও পুলিশ উর ছায়াটাকেও ছুঁতি পারলেন নি! কী খেয়ে যে উর মা উকে জন্ম দিয়েছিলেন, ভগমানই জানেন! যাদের কেউ মনিষ্যি বলে গেরাহ্যিই করেন না, সেই গরিব কপালিদের ঘরে মধুয়ার মতন মনিষ্যিও জন্মায়, বুধিয়ার মতন ছেলেও দেখা যায়েন। যাদের জমিন নেই, বুধিয়া উদের জমিন দিবার বেবস্থা করেন, ই কী কম কথা না কম বড় কাম! বিষ্টুপুরেই থেকে উ পড়ালিখা শিখেছেন, পাশ দিয়েছেন; আর জগৎ সরদারের ঘরও ত উই বিষ্টুপুরেই। জগৎ সরদার নি কি উদের সোব্ মামলাই করেন। লোকটাকে দেখে কিন্তুক সুবিধের মনে হয়েন নি। কেমন যেন কাঠ-কাঠ। হোক কাঠ-কাঠ। কাঠের গোরু যদি দুধ দেন, তা'লে উই কাঠের গোরুও ভাল। বুধিয়া যখন বলেছেন, জগৎ সরদার ভাল তখন ভাল, না হলিও উকে ভাল হতিই হবেন।

মধুয়াকে বংশী সেই কবে দেখেছিল। প্রায় দশ স আগে। বাউলের বেশে। প্রথমে তো সে ওকে চিনতেই পারে নি। তালবাঁধের পুব প্রান্তে পোলের ওপরে। সূর্যোদয়ের সময়ে। জটা নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর একবার মধুয়া তার ঘরে এসে দেখা করেছিল এক দুর্যোগের রাতে। মধুয়ার বউ তখন ওকে ডাকাত ঠাউরে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। মধুয়া ঘরের মনিষ্যির মতো বাতাসীর কাছে পান্তা ভাত আর শোল মাছের ঝোল চেয়ে খেয়ে গিয়েছিল। সেও প্রায় দশ সন হয়ে

গেল। আর মধুয়ার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। গাঁয়ে সে ফিরেছে, তাও কয়েক মাস হয়ে গেল। এর মধ্যে একবারও দেখা হয়নি তার মধুয়ার সঙ্গে।

খোকন বক্‌সির পাঞ্জাবী দারোয়ান জবর সিংয়ের কথা মতো সে জগৎ সরদারকে দশ টাকা দিয়ে এসেছে। কিন্তু জগৎ সরদারের কথা শুনে সে একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছিল। জমিনের আশা সে ছেড়েই দিয়েছিল। তারই মধ্যে একদিন কুইলি ওর আঁতে দিল প্রচণ্ড ধরনের ঘা। সঙ্গে সঙ্গে ওর রক্তে ও শুনলো এক দুর্জয় বানের দুরন্ত গুমরানি। ও ভুলে গিয়েছিল, মনে পড়লো, ওর ঠাকুরবাপ দুখী কপালি ছিলেন ডাকাত-ঠ্যাঙানো লেঠেল, বাপ মেঘু কপালি লড়াই করেছিলেন নোনা সমুদ্দুরের সঙ্গে, আর ও পাথরের মতো শক্ত মাটি গুঁড়িয়ে ওর জমিনে ফলিয়েছিল সোনার ধান।

সঙ্গে সঙ্গে একটা খ্যাপা জানোয়ারের মতো জলশিয়রের রাস্তায় ওর ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিংবা, মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে বলে, আমি বংশী কপালি ! বহুৎ পুরুষ আগে আমরা মরা মনিষ্যির খুলিতে হাঁড়িয়ার মত খুন খেয়েছি। আমার হকের জমিনের দখল লিতে আমার ডর ? আজ আমি আমার জমিনের দখল লিব। কার কত হিম্মৎ আছে। আয়, আমাকে রুখবি আয়—

সে ভেবেছিল, জটাকে সে একহাত নেবে। কিন্তু সেদিন জটার বেশ ভালোমতো একটা শিক্ষা হয়ে গেছে। ঘুঘু বারবার ধান খেয়ে যাবে, কোনবারই ধরা পড়বে না, না ? নিজের হাতেই নিজে মার খেয়েছে। ওকে আর হাত লাগাতে হয় নি। ধম্মের কল এমনিভাবেই বাতাসে নড়ে। কদিন ঘর থেকে বেরোয়নি জটা। খুব বেইজ্জৎ হয়েছে ব্যাটা। এখন আবার বের হচ্ছে। সাইকেলে চড়ে রোজ চন্ননপুরের দিকে যায়। কি জানি, কোন ফন্দি আঁটছে কিনা ব্যাটা, কে জানে ? ব্যাটার না আবার পেটে পেটে বুদ্ধি ! কিন্তু এবার কোন বুদ্ধিতে কাম হবে না। আমার জমিন আমারই হবেন। বুধিয়া বলে গেছেন।

বড় সোন্দর ছেল্যো হয়েছেন বুধিয়া। কে বলবেন, এ বুধিয়া উ দিনের সেই বুধিয়া। নিজের ঘর নেই, জমিন নেই, কুথায় কখন থাকেন, ঠিক নেই। অথচ যার জমিন নেই, উকে জমিন দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ইমোন ছেল্যোও হয়েন তা'লে দুনিয়ায়। ঠিক আছেন, মধুয়া যখন আসবেন, আসবেন, ইখোন বুধিয়াকে হলেই চলবেন।

: কুইলি !

বংশী কুইলিকে ডাকে। রাত হয়েছে। কুইলি সেদিনের মতো ঘরে চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়ায়।

: ক্যানে ?

: উদিনের পর বুধিয়া আর আসেন নি ?

: না।

: আসছেন নি ক্যানে বল্ ত?

: উকে নানান খানে ঘুরে বেড়াতি হয়েন ত। গোলমাল শুধু তোর জমিনেরই নয়। তোর মতন বহুৎ লোকের জমিনেরই ইখোন গোলমাল রয়েছেন। বুধিয়ার উপর যে উই সোব্ জমিনের গোলমাল মিটাবার ভার।

: ইটুকুন ছেল্যে, উর উপরে ইতো বড় কাম। উতে ত বহুৎ ঝামালি রে।

: মধুয়াভাইর ফরমাশ। উপায় নেই। উ রকম সৎ ছেল্যে পাবি কুথাও তুই?

: খুব ভাল ছেল্যে রে বুধিয়া।

: ইমোন ছেল্যে চন্নপুরেও ইকটাও নেই।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তারপর বংশী বলে: তুই আজ সোকাল-সোকাল চলে যাচ্ছিস যে বড়। আয়, ইকটু বস্—

কুইলি আকাশের দিকে চেয়ে একবার রাত কত হয়েছে, ঠাহর করে নেয়। রাত হয়েছে, বংশীর খেয়াল নেই। কুইলি বংশীর কথামতো ফিরে এসে দাওয়ার ধারটাতে বসে।

: ইতো দূরে বসলি ক্যানে? কাছে এসে বস্—

কুইলির বুকের ভেতরে সাত সমুদ্দুরের তালগাছ-সমান ঢেউ সব এসে অন্ধকার বালিয়াড়ির ওপর প্রচণ্ড শব্দে একটার পর একটা আছড়ে পড়তে থাকে। বংশীর এই ডাকের অপেক্ষায় সে যে নিজের বুকের ভেতরে কতদিন কান পেতে বসে আছে। আজ ক'মাস হলো বংশী গাঁয়ে ফিরেছে। গাঁযে ফিরে সে দেখলো, কুইলি ওর ফাঁকা ঘরটা আগলে বসে আছে। সে ওভাবে বসে না থাকলে নাকি বাস্তুভিটেটাও বেদখল হয়ে যেত। একদিকে খোকন বক্সি, অন্যদিকে গাঁয়ের জমিন-চোর কপালিরা। এই দু' পাটি দাঁতের ধার—কোনটারই কম নয়। তার কামড় থেকে বংশীর বাস্তুভিটেটুকু যে রক্ষা পেয়েছে, তা কুইলির জন্যে। কিন্তু কুইলি যে এতকিছু করছে তার জন্যে, কিসের স্বার্থে?

আহা বেচারী কুইলি! ওর ঘর নেই, সংসার নেই। দিনরাত সে বংশীর সংসার নিয়ে পড়ে আছে। এখানে রাতে থাকে না, একদানা খায় না। তবু আসে। একদিনও কামাই নেই। আসতে বারণ করলেও সে আসে। কি আছে ওর মনের ভেতর? শুধু কি মধুয়ার নির্দেশ?

বংশী কোনদিন তার মনের ভেতর তাকায় নি। কারও মনের ভেতর তাকানো ওর স্বভাব নয়। তবু আজ কেন যেন ওর মনে হলো, কাজটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

ঘরের ভেতর কেরোসিনের কুপিটা জ্বলছে। দাওয়ায় সামান্য আলোর আভাস। তাতে দুজনে দুজনের অস্তিত্ব খুব সহজে বুঝতে পারে। সেই আবছা অন্ধকারে বংশী কুইলির গায়ের গন্ধ পাচ্ছে। একটি কালো মেয়ে্য মনিষ্যির ভরা শরীলের গন্ধ। ঠিক জলভরা ধানের জমিনের মতো গন্ধ।

হাওয়া নেই। জলের ধারে শুধু একটা ব্যাঙ্ ডাকছে। থেকে থেকে দূর থেকে। ডেকেই চলেছে। তাছাড়া বিশ্ব-চরাচর নিস্তব্ধ। সমুদ্দুরের ঢেউ ভাঙার শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। এখন হাত বাড়ালেই বংশী কুইলিকে ছুঁতে পারে। কাছে টেনে আনতে পারে, বলতে পারে: কুইলি, তুই না'লে আমি অকূল সমুদ্দুরে ভেসে যেতাম রে—

মধুয়ার ঘরের দিক থেকে এই নিশুতি রাতে একটা মোরগ আচম্‌কা গলা চিরে ডেকে উঠলো।

চমকে কুইলি আকাশের দিকে তাকায়। সাতভায়া অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। বলে: রাত অনেক হলেন। আমি যাই—

বংশী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাবার আগেই কুইলির ছায়াটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সকালে কুইলির আসতে অন্যান্য দিনের তুলনায় দেরি হয়ে গেল। সঙ্গে সিমলি। আসবার সময় রাস্তায় সাইকেলের চাকার দাগ দেখতে পেয়েছে কুইলি। সিমলিও দেখেছে। দাগটা একটা সাপের মতো মোচড় খেতে খেতে কিছুদূর এসে তারপর হারিয়ে গেছে।

কুইলির কপালে চিন্তার আঁচড় পড়ে। জটা রাতেরঁ অন্ধকারে চন্নপুরে আসা-যাওয়া শুরু করেনি তো? কে জানে, সে গোপনে খোকন বক্‌সির সঙ্গে কোন ফন্দি আঁটছে কিনা। ওর যে পেটে পেটে কেবল কু-মতলব।

সিমলি এঁটো সানকিটা নিয়ে মেজে আন্‌তে ঘাটের দিকে যায়। কুইলি ঝাঁটা নিয়ে ঘরের ভেতরটা ঝাঁট দিয়ে বেরিয়ে এসেই শুনলো বংশীর পায়ের মাটি-দুরমুশ-করা আওয়াজ।

: কুইলি, কাল কি বুধিয়া এসেছিলেন রে?

কুইলি সরলরেখায় দাঁড়ায়।

: ন্-না ত।

: তা'লে আমি যে স্পষ্ট দেখে এলুম।

: সাইকেলের চাকার দাগ ত? আম্মো দেখেছি। উ বুধিয়ার সাইকেল লয়, জটার হবেন-টবেন।

: জটার?

বংশী যেন একটু হতাশ হলো। বুধিয়া আসছে না। অনেক দিন হলো, গেছে। তা সাত-আট দিন তো হবেই। সাত-আট দিন বংশীর কাছে যেন সাত-আট বছর। এতদিনেও যখন বুধিয়া এলেন নি, তালে বোধয়, খবর ভাল লয়। মামলায় জগৎ সরদার তালে জিতাতে লারলেন। লারবেনই ত। লোকটা সোব্ সময় কেমন

যেন বদ্‌মেজাজী। কথায়বার্তায় তেমন ভাল লয়। ভীষণ খেচুটে। বোধয় আমার জমিনও গেলেন, দশ-দশটা টাকাও গেলেন।

দুশ্‌ শালার কপাল!

বংশী বিড়বিড় করতে করতে বলদগুলোর মুখে দু'মুঠো খড় দিতে চলে যায়। আবার কুইলি দাওয়া ঝাঁট দিতে থাকে। দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নামতেই দ্যাখে, ওর সামনে ছেলে-কোলে এসে দাঁড়িয়েছে মধুয়ার বউ পুলি।

: বউ?

: হঁ।

: শুন্‌। ইকটা কথা।

: কি কথা?

কপালিপাড়ার যত নতুন খবর সব কি করে যেন মধুয়ার বউর কাছে উড়ে আসে। যে খবর কপালিপাড়ার পিঁপড়েও জানে না, হাওয়ারও অজানা, তা কখন মধুয়ার বউর কাছে বাসি হয়ে গেছে। মধুয়ার বউ কপালিপাড়ার সমস্ত খবরের আড়ত। আবার কপালিপাড়ার লতুন কী খবর হলেন, কে জানেন।

: ইদিকে আয়।

কুইলির বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়ে।

পুলি ফিস ফিস করে বলে: কাল রাতে উ এসেছিলেন—

: কে? জবর সিং?

: ধুৎ। উ—

: মধুয়াভাই?

: হঁ। •

: তাপ্‌পর? কারু সাথে দেখা না করে চলে গেলেন?

: ইখোনো থানায় হুলিয়া রয়েছেন। রায় আসেননি। তুই কথাটা বলবি নি কাউকে।

: উ, তাই বল্‌। আমি ভাবি, ফের কিছু হলেন নিকি মধুয়াভাইর?

কুইলি এবার ঠোঁট চেপে হাসে। ওভাবে হাসলে ওর গালে এখনো একটু টোল পড়ে। দুচোখে আলো ঝিলিক মারে। বলে, মধুয়াভাই যে কাল রাতে তোর কাছে এসেছিলেন, আমি কিন্তুক ধরতি পেরেছি।

: ধরতি পেরেছিস? কি করে?

: ক্যানে? তোর তেল-চকচকে মুখ আর চোখের নিচে কালি দেখে—

: ধুৎ।

: আহা, নজ্জা প্যাচ্ছিস ক্যানে? আর কেউ ধরতি লারবেন।

পুলি আঁচল দিয়ে ভালো করে মুখটা মুছে নেয়।

: থাম্‌ কুইলি, আমার সাথে আর তুই তামসা করিস নি।

: আমি ঠিক ধরতি পেরেছি—

: কি করে বল্ দি'নি—

: ক্যানে? রাস্তায় সাইকেলের চাকার দাগ?

: অ, তাই বল্। আমি ভাবছিলুম, কী জানি কী! শুন্, ইকটা কামের কথা উ কাল বলতি এসেছিলেন।

: কি?

: কাল সোকালে মাঠে কপালিপাড়ার সোব্বার পরথম হাল নামবেন।

: ই আর কী এমন লতুন কথা! হাল ত হর সনই ই সোময়ে মাঠে পরথম নামেন। ইকথাটা বলতি মাঝরাতে মধুয়াভাইকে আসতি হলেন?

: শুনবি ত সোব্টা?

: বল্—

: নামার আগে বুড়োবটতলায় কপালিপাড়ার সোব্ হাল-বলদ লিয়ে হাল-দেব্তার পূজা হবেন।

: বাহ্। ভারী মজা হবেন ত? এই নালে মধুয়াভাই?

: তাপ্পর ইকটু লাচগান হবেন।

: হাঁড়িয়াও হবেন নি কি?

: লাচগান হবেন— হাঁড়িযা হবেন নি, ই কখনো কপালিপাড়ায় হয়েছেন না হতি পারেন?

: ঠিক আছেন। তালে কপালিপাড়ায় আজ মধুয়াভাইর হুকুম জারি করে দে।

: আমি কয়েকজন বাদে সোব্বাইকে বলে আসছি। তুই শুধু রঘু, মেঘু, বংশীভাই আর বাখুকে বলে দিবি। তা'লে আর কেউ বাদ থাকবেন নি। আমি যাই। কথাটা মনে থাকেন যেন—

মধুয়ার বউ বাস্ত পায়ে রাস্তার কোণ পেরিয়ে চোখের আড়ালে চলে যায়। কুইলি সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। সিমলি আড়াল থেকে সব শুনেছে। উঠোনে নেমে এসে হাসতে হাসতে বলে : কাল খুব মজা হবেন, লয় পিসি?

: হঁ।

কুইলি উঠোন ঝাঁট দিতে থাকে। ওর হাত দ্রুত চলে।

: নাচগান হবেন, হাঁড়িয়া হবেন, কী মজা হবেন! পিসি, তুই কাল নাচবি? হাঁড়িয়া খাবি?

: তুই থাম্, পাগলি—

: বারে, ইটা পাগলামি হলেন বুঝি? হাঁড়িয়া খেলে আমার খালি ঘুম পায়েন।

কুইলি পেছনে বংশীর পায়ের আওয়াজ পায়।

: মধুয়ার বউ এসেছিলেন ক্যানে?

কুইলি ঘুরে দাঁড়ায়।

: মধুয়াভাই কাল রাতে এসেছিলেন।

: এসেছিলেন?

বংশীর গলার স্বর যেন শান খেয়ে গমগম করে ওঠে।

: মধুয়া কাল এসেছিলেন?

: বউ উই কথা বলতি এসেছিলেন।

: আমার কথা কি বলেছেন মধুয়া? বুধিয়া আমার জমিনের কথা মধুয়াকে সোব্ বলেছেন, লয়?

বংশীর হাসি-হাসি মুখে যেন একটা গাছের সারল্য। কিন্তু কুইলি বংশীর একথার জবাবে কি বলবে? মধুয়া তো কারো কথা বিশেষভাবে কিছু বলে নি। সে আস্তে আস্তে বলে: কাল সোকালে বুড়োবটতলায় সবাই মিলে হালের পূজা করে মাঠে একজোট হয়ে পরথম হাল করতি হবেন। ইকটু নাচগানও হবেন।

বংশীর গলায় হতাশা চাপা থাকে না।

: মধুয়া তা'লে আমার জমিনের কথা কিছু বলেন নি?

মুখ শুকিয়ে সে দাওয়ার ধারে নিঃশব্দে বসে পড়ে। শূন্যদৃষ্টিতে কুইলির দিকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

: নাই বা বললেন তোর কথা? উতে তুই ইতো ভেঙে পড়ছিস্ ক্যানে? তুইও কাল হাল নামাবি—

: আমি হাল নামাব? কুথায়? কার জমিনে? আমার ত জমিন নেই।

: ক্যানে? তোর জমিনে?

: আমার জমিন আর আমার লয় রে। তোরা সোব্বাই থাকতি— —

সেদিন বংশী কুইলির সঙ্গে আর কোন কথা বলে নি। সারাক্ষণ সে মধুয়ার কথা, বুধিয়ার কথা, জটার কথা ভেবেছে। ওদের কথা ভাবতে ভাবতে খোকন বক্সির কথা, পরাণের কথা, বাতাসীর কথাও মনে পড়েছে। এরা সবাই মিলে ওকে ওর জমিন থেকে উৎখাত করে মাটির কাঙাল করে ছেড়েছে। মধুয়া আর বুধিয়ার কথা ভিন্ন। ওরা আশা দিয়ে ওর সব আশা ভেঙে দিয়েছে। জবর সিংও তো আশা দিয়েছে। সেদিক থেকে জগৎ সরদার অনেক ভালো। সে আশাও দেয় নি, ভরসাও দেয় নি।

সারা রাত চোখের পাতায় ঘুম এলো না বংশীর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শুধু ভেবেছে—অন্য কারো কথা নয়, কেবল নিজের জীবনের কথা। ই ইকটা জীবন? জঙ্গলের ইকটা জানোয়ারও ইর থেকে ভাল বাঁচেন।

ঘুমছুট্ চোখদুটো বারে বারে জানলার দিকে চলে যায়। দক্ষিণ দিকেই এই জানলাটা সে সব সময় খোলা রাখে। যদি কখনো মধুয়া আসে। এসে ডাকে ফিস ফিস করে: বংশী, এই বংশী— কিংবা বাতাসী। এক ঢাল চুল পিঠের ওপর

ছড়িয়ে জানলার পাশে মুখ বাড়িয়ে যদি সে কোনদিন বলে ওঠে : ই দ্যাখ্, তোর জন্যে আমি আজ চুল বাঁধি নি—

জানলা-বরাবর দাওয়ার নিচে মানকচু গাছের গোড়ায় ভিজে অন্ধকার সব সময় জমাট বেঁধে থাকে। ওখানে নিশুতি রাতে ঝিঁঝি ডেকে ওঠে। ঠিক যেন বাতাসীর হাতের কাচের চুড়ির শব্দ। চমকে ওদিকে তাকায় বংশী। বিছানায় উঠে বসে একবার। তারপর আবার বংশী শুয়ে পড়ে ছিলাছেঁড়া ধনুকের মতো।

সেদিন রাতটা অনেক আগেভাগেই ভোর হয়ে গেল। ভোরের দিকে ঘুম আসবে আসবে করেও এলো না। চোখ দুটো খুব জ্বালা করছিল। দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো, পুব আকাশে আলো ভুঁই ভাঙছে। চোখে-মুখে জল দেবার আগেই সে কি ভেবে বলদ দুটোর মুখে দু'আঁটি খড় দিয়ে এলো। ভাবে, আজ সে কি করবে? গাড়ি নিয়ে সে চলে যাবে কপালিপাড়া ছেড়ে, নাকি হালবলদ নিয়ে যাবে তার জমিনের দিকে।

রোদ উঠতেই কুইলি এলো। বংশী বলদদুটোর মুখে খড় দিয়েছে দেখে সে খুশীই হলো। হাতের ঝাঁটা নামিয়ে রেখে সে বলদ দুটোকে জল খাইয়ে এলো। তারপর ঘাটে হাত-পা ধুয়ে এসে বংশীর জন্যে সান্কিতে পান্তাভাত বেড়ে দিল। আলুসেদ্ধ বেগুনপোড়া নুন কাঁচালঙ্কা একটু ছাঁচি তেল দিয়ে মেখে দিল।

: শিগ্‌গির খেয়ে হালবলদ লিয়ে আয় বুড়োবটতলায়। উখানে আমার আজ অনেক কাম। তুই দেরি করিস নি একেবারে।

হালবলদ নিয়ে বংশী বুড়োবটতলায় গিয়ে দেখলো, সবাই এসে গেছে। আসে নি শুধু জটা। ওর কি লজ্জা এখনো কাটে নি। নাকি, মনে তার অন্য কোন মতলব আছে। কে জানে? ঘনু বসে আছে অনেকের মাঝখানে। অন্যান্যেরা বলদগুলোকে সামলাচ্ছে।

হালগুলোকে সিঁদুর, ফুল আর বেলপাতা দিয়ে পুজো করলো কপালিপাড়ার মেয়েরা। সিমলি ভিড়ের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকছে।

ঘনু জিজ্ঞেস করে : জটা এলেন নি?

: না। মনে হয়েন আসবেন নি।

: কামটা ভাল করলেন নি উ।

পুজোর পর শুরু হলো গান আর নাচ। তারপর হাঁড়িয়া। নাচ, গান আর হাঁড়িয়ায় বুড়োশিবতলা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা উৎসবের চেহারা নিল। হলকর্ষণ নিয়ে বুড়োশিবতলায় এর আগে কোনদিন কোন উৎসব হয়নি। উৎসবে-উৎসবে নাচে-গানে বেলা এক প'র হলো। নাচ থামলো। কিন্তু গান থামে না। গান গাইতে গাইতে সবাই চললো যে যার জমিনের দিকে। আজ বসুন্ধরার বুকে পড়ছে হালের আঁচড়। এই আঁচড়ের প্রতীক্ষায় একটি সন কেটেছে জমিনের। এরপর

বীজ বোনা হবে, রোপন হবে। শুরু হবে কপালিপাড়ার চাষীদের ব্যস্ত মরশুম।

কুইলি বংশীর পাশে পাশে যাচ্ছিল মাঠের দিকে।

: আমি তা'লে আজ হাল নামাচ্ছি আমার জমিনেই—

: হঁ।

: জটা যদি কিছু বলেন?

কুইলির দু'চোখে আর কপালে হঠাৎ রোদ্দুর জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠলো। বংশী ওতে যেন আগুনের ঝলক দেখলো। তারপর আর সে ওর মুখের দিকে তাকায় নি। বড় বড় পা ফেলে সে হালবলদ নিয়ে এগিয়ে চললো তার জমিনের দিকে।

হালবলদ নিয়ে কপালিপাড়ার কপালিরা ছড়িয়ে পড়েছে যে যার জমিনে। বংশী তার জমিনের ঈশান কোণে গিয়ে বলদের কাঁধের জোয়ালের সঙ্গে হালটা জুতে দিল। অনেকদিন পর। তারপর মাটিতে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম রেখে হালের মুঠি ধরলো চেপে।

: হ্যাট্, হ্যাট্, হ্যাট—

বৃষ্টির জলে মাটি নরম হয়ে গিয়েছিল। কপালিরা বলে 'বতর'। 'বতর' হওয়ার ফলে মাটির আর কোন প্রতিরোধ ছিল না। যেটুকু বা ছিল, তা আর টিকলো না। খুব গভীরভাবে ফালের আঁচড় পড়তে লাগলো মাটির সেই প্রতিরোধ চিরে। চারদিকে শুধু জলভাঙার শব্দ আর ফসল-বিলাসী মানুষের গান। আলের কোণে খেজুর গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে কুইলি—কালো পাথরের অপ্সরা-মূর্তি যেন।

আকাশে সূর্য-ঠাকুর রোদ্দুরের বাণ ছুঁড়ে মারছেন। একটুও ছায়া নেই কোথাও। দরদর করে ঘামছে বংশী। তার চোখে আলো নাচছে। মাটির বুকের ভেতর থেকে আদিম পৃথিবীর শরীলের গন্ধ পাচ্ছে সে। এ গন্ধ যেন তার কত ব[illegible]সের চেনা। জমিনের কোণের বাবলাগাছগুলোর ফুল ঝরে গেছে। ওখানে গা ঢেলে দিয়ে বংশী কতকাল শোয় নি। আজ হাল চষার পর বংশী ওখানে বাবলাগাছের ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে একটু শোবে। শুয়ে শুয়ে সে বাতাসীর কথা ভাববে।

বেলা বাড়ছে। রোদ্দুর হয়ে উঠছে জ্বলন্ত আঙ্রার মতো। কপালিদের গলার গানও ঝিমিয়ে এসেছে। এমন সময় দেখা গেল, লাঠিহাতে কে একজন জল ভেঙে পাগলের মতো ছুটে আসছে ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করতে করতে। মাঠের সমস্ত হাল থেমে গেল হঠাৎ। বংশীর হাল থামলো না। যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগলো। সে মুখ তুলে একবার তাকালো[illegible]না।

কুইলি চেঁচিয়ে ডাকে: বংশীভাই—

হালের মুঠি চেপে ধরে বংশী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

: উটা কে আসছেন্ রে লাঠিহাতে?

: জটাভাই। তোকে মারবে—

: আসতি দে—

কিছুক্ষণ। জটা এসে পড়লো। বংশীর হাল থামে নি।

: এই শ্‌শালা বংশী, কার হুকুমে ই জমিনে হাল দিচ্ছিস তুই?

বংশী কোন জবাব দেয় না।

: জবাব দিচ্ছিস নি যে বড়? কার হুকুমে ই জমিনে আজ তুই হাল দিচ্ছিস?

বংশী হাল থামায়।

: হুকুম? কারো হুকুমের ধার ধারি না। আমি বংশী কপালি। আমার বাপ মেঘু কপালি। উর বাপ দুখী কপালি। জমিদারের হুকুম ছাড়া আমাদের আর কারো হুকুমের কুনোদিন পেয়োজন হয়েন নি।

বংশীর গলায় কঠিন আত্মপ্রত্যয়। শুনে কুইলির বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

জটা আলের ওপর লাঠির একটা ঘা কষে দিয়ে বলে: জানিস, ই জমিন আমার নামে রেকর্ড-করা?

: ধুৎ তোর রেকর্ড! আমার বাপকেলে জমিনে আমি হাল চষছি। কুনো রেকর্ডের ধার ধারি না।

বংশী বলদ হাঁকে। হাল চলতে থাকে ধরিত্রীর বুক চিরে।

: হাল থামা, বংশী। ভাল হবেন নি। ই জমিন ইখোন আমার।

জটার হাতের লাঠি আলের ওপর আবার সশব্দে পড়ে।

: এই শ্‌শালা বংশী!

: তোর বাপকেলে জমিনে হাল দি গে যা। ইখানে গণ্ডগোল করতি আসিস নি রে, জটা। সুবিধা হবেন নি।

: তা'লে থামবি নি তুই?

: না।

: তা'লে হয়ে যাক?

: কি হবেন রে?

: দ্যাখ্, কি হয়েন—

জটা হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ক্ষেতের জলে তিড়িং করে লাফ দেয়। বংশী এবার হাল থামায়। দ্যাখে, জটা জলের পিঠে লাঠির বাড়ি মারতে মারতে এগিয়ে আসছে। ওর হাতে একটা লাঠি আছে। বংশীর হাতে পাঁচনবাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। হেঁকে বলে: আর এগোস নি রে, জটা। পিছু হট। না'লে মরে যাবি তুই।

: তুই হট্ ই জমিন থিকে।

একটি নিমেষ মাত্র। চোখের পলক না-পড়তেই বংশী বলদ দুটোর কাঁধের জোয়াল থেকে হালটা খুলে ফেলে দু'হাতে শূন্যে তুলে ফেলেছে।

এক মুহূর্ত।

জটা ভয়ে কি করবে, ভেবে পেল না। এমন সংহার-মূর্তি জীবনে কখনো সে দেখে নি। দেখে নি নয়, দেখেছে। চন্ননপুরের যাত্রায়। কেষ্টঠাকুরের বড় ভাই বলরাম ঠাকুর এমনি হাল নিয়ে কার দিকে যেন তেড়ে গিয়েছিল। শুধু তেড়ে যায় নি। ওকে হাল দিয়ে মেরেও ফেলেছিল। দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল জটার। সামনে একটু দূরে ছুটে আসছে বংশী। দু'হাতের হালের চকচকে ফালটা শূন্যে রোদ্দুরে লকলক করছে ঠিক বাস্তুকেউটের জিভের মতো। জটা আর এক-পা এগিয়েছিল কিনা বা আর এক মুহূর্ত ওখানে ক্ষেতের জলে-কাদায় দাঁড়িয়েছিল কিনা ওর মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, ওর পা দুটো একলাফে আলবাঁধ ডিঙিয়ে পাশের জমিনের জলকাদা ভেঙে ছপছপ শব্দে ছুটে পালাচ্ছিল। আর মনে পড়ে, পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে সে একবার শুধু দেখতে পেয়েছিল, বংশী হাল উঁচিয়ে তার দিকে তেড়ে আসছে একটা ক্রুদ্ধ অপদেবতার মতো। সামনে আর একটা আলবাঁধ ডিঙোতে গিয়ে সে জলকাদার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ওঠার চেষ্টা আর সে করেনি। কারণ, সে ক্ষমতাও আর তার ছিল না। ততক্ষণে বংশী এসে ওর বুকের ওপর চেপে বসে ওর গলাটা টিপে জলের মধ্যে চেপে ধরেছে।

: ছেড়ে দে রে বংশী। ঘরে আমার বউ-বাচ্চা আছেন। সোব্ মরে যাবেন।

বংশীর হাতের শক্ত আঙুলগুলো তখন জটার গলায় কাঁকড়ার দাড়ার মতো একেবারে খিল এঁটে বসেছে। জটার জিভ বেরিয়ে এসেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ঠিক মরার আগের মুহূর্ত।

কুইলি চেঁচিয়ে ওঠে খেজুর গাছের ছায়া থেকে : ছেড়ে দে, বংশীভাই। ছেড়ে দে উকে----

মাঠের কপালিরা এসে অনেক বলে-কয়ে ওকে ছাড়িয়ে দেয়। জলকাদা মেখে উঠে দাঁড়িয়ে জটা ঘরের দিকে ফিরে চলে। যেতে যেতে বলে যায় : ঠিক আছেন। আমিও ছাড়ব নি। তোকে দেখে লিব।

বংশী জটাকে আর কিছু বললো না। হালও সেদিন চষলো না আর। খেজুরগাছের ছায়ায় এসে বসলো কিছুক্ষণ। এমনটা যে হবে, সে জানতো। জটা সহজে জমিন ছাড়বে না। ওর গ্রাস থেকে জমিন কেড়ে আনা শক্ত হবে। তাই জটাকে সে আজ ধরেছিল। হয়তো ওকে শেষই করে ফেলতো ও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওকে ছেড়ে দিয়ে সে ভালোই করেছে। নইলে মধুয়ার মতো ওকে খুনের দায়ে ফেরার হয়ে এখানে-ওখানে লুকিয়ে বেড়াতে হতো পুলিশের নজরকে ফাঁকি দিয়ে।

একটু পরে হালবলদ নিয়ে ঘরের দিকে ফিরে চলে সে। সঙ্গে কুইলি। আজ সকাল থেকেই সে বংশীর সঙ্গে সঙ্গেই আছে। প্রায় তার ছায়ার মতো। বংশী মাথা-গরম মানুষ। কি করতে কখন কি করে বসে। বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে জমিনের ব্যাপারে জটার ওপরে ওর যখন প্রচণ্ড ক্রোধ জমে আছে। আজ যখন সে হাল হাতে তুলে নিয়ে শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে জটার দিকে একটা ক্রুদ্ধ চাঁড়ালের

মতো ছুটে যাচ্ছিল, তখন তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন হালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ওর বুকের ওপর চেপে বসে দুহাতে ওর গলা টিপে ধরেছিল, তখন সে আর স্থির থাকতে না পেরে গলা চিরে চিৎকার করে উঠেছিল। মাঠের কপালিরা হাল-বলদ ফেলে জড়ো হয়ে গিয়েছিল ওখানে। জটাকে ছেড়ে দিয়েছিল বংশী। তাই রক্ষে। নইলে কী যে হতো!

ঘরে ফিরে দেখা গেল, সিমলি চুলায় ভাত চড়িয়ে দাওয়ায় বসে আছে। আলুথালু বেশ। ও যেন কী ভাবছিল খুব নিবিষ্ট মনে। ওদের পায়ের শব্দে চটকা ভাঙলো ওর। ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে দ্যাখে, চুলা নিবে গেছে। ভাত হয় নি। পিসিকে কিছু জানতে না দিয়ে সে চুলা জ্বালিয়ে এবার কাছেই বসে রইলো।

কুইলি বলদ দুটোকে খড়জল খাওয়াতে চালার নিচে নিয়ে গেল। বংশী হালজোয়াল রেখে হাত-পা ধুয়ে এসে দাওয়ায় বসলো। আজকের ঘটনাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। বুঝতে পারছে, কাজটা ভালো হয় নি। সে জানে, ভাগবোর্ডে তার মামলা ঝুলে আছে। শুনেছিল, এরই মধ্যে এস্পার-ওস্পার যা হোক একটা রায় হয়ে যাবে। জগৎ সরদার কি করছে, কে জানে? মধুয়া বা বুধিয়া কারো দেখা নেই। এই অবস্থায় সেই জমিন নিয়ে আজকের হাঙ্গামার কথা সবাই জানবে। তার ওপর শেষমেশ জটা শাসিয়ে গেছে, ও ছাড়বে না। ওকে দেখে নেবে। জটা সব পারে। ওকে বিশ্বাস করা যায় না। কুইলি কোন কথা না বলে ঘরের ভেতরে গিয়ে সিমলিকে জিজ্ঞেস করে: কি রে, কি করছিস?

: ভাত বসিয়েছি।

: বাহ্, বেশ করেছিস। আমি ঘাটে যাচ্ছি। দেখি, কিছু ধরতি পারি নি কি?

: আজ কি মারপিট হলেন?

: হঁ।

সংক্ষেপে উত্তরটুকু দিয়ে কুইলি ঘাটের দিকে চলে যায়।

বংশীর মনে পড়ে, দশ সন আগের কথা। উবার লড়াই করতি হয়েছিলেন সমুদ্দুরের বালির সাথে, খরার সাথে, মাটির সাথে। আর ইবার লড়াই করতি হচ্ছেন মনিষ্যির সাথে। তাও লড়াই করতি হচ্ছেন, যে আগের বারে ছিলেন একেবারে আপনার মনিষ্যি, উই জটার সাথেই। এমনি কপাল! নিজের বাপকেলে জমিন নিয়ে নিজের মনিষ্যির সাথে মারপিট! তাছাড়া যে ভেন্ন উপায় ছিলেন নি।

রাস্তায় দূর থেকে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শোনা গেল। জটার ঘরের দিক থেকে নয়, বুড়োবটতলার দিক থেকে। জটা কি যাচ্ছে কোথাও? নাকি কেউ আসছে গাঁয়ে? কে আসতে পারে এই ভরদুপুরে? সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ আবার শোনা গেল। এবার আরো কাছে। বংশী কিছু ভেবে ওঠার আগেই সিমলি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন ডিঙিয়ে সোজা একেবারে রাস্তায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুধিয়া সাইকেলটা ওদিকের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বংশীর সামনে বসে পড়ে। ওর মুখটা কালো হয়ে গেছে, চোখ দুটো ছলছল করছে, মাথার চুল বিপর্যস্ত। সিমলি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে। বংশীর আর তর সইলো না। সে কাছে সরে এলো ওর। গলায় চাপা আবেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করে: কি রে বাপ, কি হলেন? বুধিয়া বার-দুই ঢোঁক গিলে শুক্‌নো গলাটা একটু ভিজিয়ে নেয়।

: আমরা জিতে গেছি।

বংশীর বিশ্বাস হয় না। অনেক সময় ভালো খবরও মন বিশ্বাস করতে চায় না। সন্দেহ হয়।

: জিতে গেছি, বাপ? তার মানে কি হলেন?

: তোর জমিন তোরই হলেন। জগৎ সরদার জান দিয়ে লড়েছেন। উ না'লে হতেনই না।

: কুইলি! সিমলি!

বংশী আনন্দে উত্তেজনায় উঠোনের ওদিকের প্রান্তে ছুটে যায়। ওদিকেই পুকুরের ঘাট। কুইলি ঘাটের দিকেই গেছে। বংশীর আগে ছুটে যায় সিমলি।

: পিসি, পিসি, মামলায় আমাদের জিৎ হয়েছেন—

বংশীর এখন একেবারে আত্মহারা অবস্থা। এবার সে উঠোন পেরিয়ে দক্ষিণ দিকের খেজুর গাছের নিচে ছুটে যায়। গলা চিরে ডাক ছাড়ে: এ-ই রঘু-উ-উ, এ-ই মেঘু-উ-উ, এ-ই ঘনুভাই-ই-ই—

মাঠের দূর প্রান্ত থেকে একটা স্বর ভেসে আসে: ই-ই—

ওটা অন্য কারো গলার স্বর, নাকি বংশীর গলারই প্রতিধ্বনি, ঠিক বোঝা গেল না। তবু বংশী হাওয়ায় তার সানন্দ জবাব ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে আসে: মামলা জিতে গেছি—

বংশী ফিরে এসে দ্যাখে, বুধিয়া দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে বিধ্বস্তের মতো। চোখ দুটো প্রায় আধ-বোজা।

: কি রে বাপ! তুই ইমোন করছিস ক্যানে?

বংশী হুড়মুড়িয়ে ওর পাশে গিয়ে বসে পড়ে। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে। জড়িয়ে ধরেই আঁতকে ওঠে: একী রে বুধিয়া! তোর শরীল যে পুড়ে যাচ্ছেন—

বুধিয়া ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে অতি কষ্টে বলে: কাল থিকে বুখার। আজ সোকালে জগৎ সরদার রায়টা দিলেন। খবরটা গাঁয়ে না দিলে লয়। তাই বিষ্টুপুর থিকে সাইকেলে— বড়-রোদ— মাথা ঘুরে যাচ্ছিলেন— উহ্— ই তোর রায়। সাবধানে রেখে দে—

পকেট থেকে দু'পাতার রায়ের কপি বের করে বুধিয়া বংশীর হাতে দেয়।

কুইলি ঘাট থেকে মাছ ধরে ভিজে কাপড়ে ফিরে আসতে আসতে পোড়া ভাতের গন্ধ পায়।

: ভাতটা পুড়িয়ে ফেললি, সিমলি?

পরের দিন থেকে কপালিপাড়ার রাস্তা দিয়ে জটাকে সাইকেলে করে ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখা গেল। সবাই বুঝলো, কিছু একটা মতলব নিয়ে ও চন্ননপুরে যাচ্ছে, আসছে। কিছু একটা বুদ্ধি আঁটছে কারো সঙ্গে বসে। কপালিপাড়ার গাঁ-বুড়ো হবার সুবাদে আর হাতে পয়সাকড়ি হবার ফলে ও এখন চন্ননপুরের অনেক বাবুর সঙ্গে মেলামেশা করে। চন্ননপুরের অনেক বাবুর বড়ো প্যাঁচালো বুদ্ধি। জটার মেলামেশা তাদেরই সঙ্গে বেশি। ওরা আবার খোকন বক্সির খুব কাছের লোক। ওদের খুব উঠবস খোকন বক্সির সঙ্গে। জটা কী যে ফন্দি আঁটছে আর ওর মতলবই যে কী,— বুঝে ওঠা দায়।

মঙ্গির ঘটনার পর থেকে গাঁয়ের সঙ্গে জটার যোগাযোগ আর নেই। সে বুঝে নিয়েছে, কপালিপাড়ায় সে প্রায় একঘরে হয়ে গেছে। কেউ ওর বাড়ির জল খায় না, কেউ ওদের চুলা থেকে আগুন চেয়ে নিয়ে মাটির চুলা ধরায় না। এমন কি, ওদের ডোবায় কেউ স্নান পর্যন্ত করে না। জটার তাতে কিছু যায় আসে না। সে কপালিপাড়ার কাউকেই পরোয়া করে না। 'কপালিপাড়ার সোব্ মনিষ্যিগুলানকে ও মনিষ্যি বলেই মনে করে না। কপালিপাড়ার সোব মনিষ্যিরাও উকথা বোঝেন। জটার ওপরে তাই ওদের আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। গত দশ সন ওরা ওর সব কথা শুনেছে। কপালিপাড়ার জমিন নিয়ে খোকন বক্সির দলবলের সঙ্গে দাঙ্গায় ও খুব দারুণ কাজ করেছিল, যার ফলে খোকন বক্সির লোকজন হেরে পালাতে পথ পায় নি। এমন কি, তিনভাগের একভাগ তো নয়ই, কোন ভাগই ওরা এখন খোকন বক্সিকে দেয় না। তাই ওরা একজোট হয়ে হালচাষ করে, রোপন করে, ধানও কাটে একজোট হয়ে। তবে তার সব কাজের পেছনে মধুয়া ছিল। রাতের অন্ধকারে সে গোপনে এসে ওকে সমস্ত কাজের ছক আগে থেকে বলে দিয়ে যেত। জটা ওগুলো মেনে কাজ করতো। তখন ঠিক ছিল, কোন ভুলভাল হতো না। জটাও জটা ছিল। সাধুতা ছেড়ে অসাধু হয় নি। তারপরই কী হলো, মধুয়া গ্রেপ্তারির ভয়ে গা-ঢাকা দিল। জটার জটা গেল। সেই সঙ্গে ওর গেরুয়া গেল, গেল ওর সাধুতাও। গাঁয়ের কারো সঙ্গে মধুয়ার আর কোনো সংযোগ রইলো না। একমাত্র সংযোগ যা রইলো, তা শুধু ওর বউ পুলির সঙ্গে। তাও কখনো ক্বচিৎ রাতের অন্ধকারে গোপনে। কাকপক্ষীও টের পেত না। তখন থেকেই কুইলিই পুলির কাছ থেকে মধুয়ার নির্দেশ সংগ্রহ করে। কুইলি ধীরে ধীরে জটার বিরোধিতা শুরু করে। শেষে এ বছর দু'তিন মাসের মধ্যে হুটহাট করে জটা যখন কোঠাঘর তুলে ফেললো, বংশীর ধান-বিচালির হিসাব দিল না,

নিজের বউ থাকা সত্ত্বেও চাঁপাবনির পাঁচু কপালির বউ মঙ্গিকে 'বে' করে এনে ঘরে তুললো, গাঁয়ের জনমনিষ্যির ক্রোধ ফেটে পড়লো।

এখন জটা খোকন বক্সির কাছে যায়, ওর সঙ্গে শলা করে। সে সব খবর ঠিক সময়ে গোপনে কি করে যেন পুলির কাছে পৌঁছে যায়। কুইলির সন্দেহ হয়, জবর সিংয়ের সঙ্গে পুলির কিছুদিন হলো, একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। খুব সম্ভব ও-ই পুলির সঙ্গে মধুয়া ভাইর কথা চালাচালি করে। সেদিন রাত্তিরে জটার ঘরের উঠোনে পুলির সঙ্গে জবর সিংয়ের কানাকানি সবার নজর এড়িয়ে গেলেও কুইলির নজরে ঠিক পড়েছে। পরে পুলিও ওকথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও কথার ফেরে স্বীকার করে ফেলেছে।

সেদিন প্রথম হালচাষের মাঠের ঘটনার পর থেকে জটা সাইকেলে চড়ে খুব ঘোরাঘুরি করছে। পুলির খবর, সে খোকন বক্সির বাড়ি প্রায় দু'বেলাই যাচ্ছে, কিসের শলা করছে দুজনে চুপি চুপি।

বুধিয়া সেই থেকে বিষ্টুপুরে ফিরতে পারে নি। জ্বর আরো বেড়েছিল। বংশীর ঘরেই আছে। বংশী ওকে নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়েছে। এমনিতে বুধিয়া দুব্‌লা পাতলা গড়নের। মাথায় একটু ঢ্যাঙা। রোগা বলে গাল দুটো একটু চাপা। তিন-চার দিনের জ্বরে ও আরো রোগা হয়ে গেছে। শরীলটা যেন একেবারে বিছানায় মিশে গেছে। কুইলি আর সিমলি সারাক্ষণ পালা করে ওর কাছেই থাকে। গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দ্যাখে। ভালো-মন্দ পুছ করে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ডাকে

: বুধিয়া—

বুধিয়া কখনো সাড়া দেয়, কখনো পড়ে থাকে আচ্ছন্নের মতো। বংশী ওর মুখে বদনা দিয়ে একটু জল দেয়।

: নে, ইকটু জল খা, বাপ। শিগগির ভাল হয়ে যাবি। আমি বলছি, ভাল হয়ে যাবি তুই।

ক'দিনের জ্বরে বড়ো কাহিল হয়ে পড়েছে বুধিয়া। গলার স্বর বড়ো ক্ষীণ। মাঝে মাঝে কাশতে থাকে। আজও কাশছিল। জল খেয়ে কাশিটা একটু কমলো। বলে : আমাকে শিগগিরই ভাল হয়ে উঠতি হবেন, বংশীকাকা। আমার যে অনেক কাম বাকি রয়েছেন।

: হবেন, হবেন। তুই আগে ভাল হয়ে উঠ্, বাপ।

বংশীর চোখে ঘুম আসে না। মাথার কাছে কুপি জ্বেলে বিছানায় জেগে বসে থেকে সে বুধিয়ার বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে সে বুধিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বড়ো মায়া লাগে। ত্রিজগতে ওর কেউ নেই। পরের ঘরে মানুষ। কষ্ট করে পড়া লিখা শিখে কপালি-ঘরের এই ছেলে ইকটা পাশ দিয়েছেন। পরের জন্যে কাম করে যাচ্ছেন। একী কম কথা! ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ওর মনে হয় এই বুধিয়া ওর বোধ হয় গতজন্মে বা তারও আগে ওর কেউ ছিল,

খুব কাছের মানুষ, অত্যন্ত আপন জন। মনে মনে ভাবে, ভালো হয়ে উঠলে ওর যদি কোথাও থাকবার ঠাঁই না হয়, তবে সে তার কাছেই থাকবে। ও যদি বাতাসীর ছেলে হতো, তা সে তো ওর কাছেই থাকতো, মানুষ হতো। বুধিয়াও ওর কাছে থাকবে।

ছ'দিনের মাথায় বুধিয়ার কাশিতে রক্ত উঠলো। সিমলি ওর বিছানার পাশে বসে মাথায় জলের পটি দিচ্ছিল। জানলার বাইরে খর দুপুর রৌদ্রে খটখট করছে। তারপর আর বৃষ্টি হয় নি। কুইলি খাপলা জাল নিয়ে ডোবায় মাছ ধরছিল। ঘরে কেউ ছিল না। বুধিয়ার জ্বরটা একটু বেড়েছে। সিমলি শিয়রের কাছে বসে মাথায় জলের পটি দিচ্ছিল। আজ জ্বর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুধিয়ার কাশিটাও বাড়তে থাকে। কাশতেও কষ্ট হচ্ছে তার। বুকে ব্যথা। কাশতে কাশতে হঠাৎ বালিশের ওপর ছিটকে পড়লো খানিকটা তাজা রক্ত। সিমলি ভালো করে দেখলো, হ্যাঁ, রক্তই—ভয় পেয়ে যায় সে। ছুটে গিয়ে সে পিসিকে ডেকে এনে দেখায়। দেখে কুইলির মুখটা শুকিয়ে যায়।

বংশী সকালে চন্নপুরের সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়েছিল। ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে যখন সে শুনলো, বুধিয়ার কাশিতে রক্ত উঠেছে, তখন তার বুকের ভেতরটা এক অব্যক্ত আর্তনাদে ডুকরে কেঁদে উঠলো। সইবেন নি! কপালিপাড়ার ভাগ্যে কুনো ভাল জিনিস সইবেন নি। আমি জানি। মধুয়া, বাতাসী, বুধিয়া—কপালি পাড়ার ভাগ্যে কুনোদিন সইবেন নি। ভগমানের অভিশাপ আছেন। মনে পড়লো, আকালের সনে তরকারির ক্ষেতে তেড়েফুঁড়ে উঠেছিলেন ইকটা নধর কচি পুঁইচারা। তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন অযত্নে অনাদরে। পুরুষ্টু, নধর। সেই পুঁইডগায় পোকা লাগলেন। দুদিনেই—

মধুয়াটা ফিরে এলে একটা বুদ্ধি পরামর্শ করা যেতেন। ইখোন কি করা যায়েন?

বিকেলেই সে ঘনুখুড়োকে ডেকে আনলো। কুইলি ডেকে আনল পুলিকে। খবর পেয়ে মেঘু, রঘু এলো, শ্যামাবউ, বিজলিবউও এলো। প্রিয় ওঝাকে আনার কথা উঠেছিল, কব্‌রেজ ডাকার কথাও উঠেছিল। কিন্তু বংশী বলে : চন্নপুরের ডাক্তারবাবু রুগী লিয়ে যেতে বলেছেন। উ দেখে ইলাজ দিবেন।

পুলি বলে : তা'লে লিয়ে যা। কিন্তুক উ ত হাঁটতি লারবেন। ঠিকমতো হুঁশও নেই।

: উ ভাবতে হবেন নি। আমি আমার গোরুর গাড়ি করে উকে লিয়ে যাব।

ঘনু বলে: উ ত অতি উত্তম কথা। লিয়ে যেতে পারলি কুনো কথাই নেই। তা'লে কাল সোকালেই রওনা দে—

: কাল সোকালে ক্যানে? আজই? এক্‌খুনি—

গাড়ি তৈরি করে ওতে বুধিয়ার জন্যে বিছানা পাতা হলো। দিনের আলোয় তখন

বিকেলের রং ধরেছে। বড়ো বিষণ্ণ। বুধিয়ার মুখের মতো। ধরাধরি করে বুধিয়াকে গাড়িতে শোয়ানো হলো। কুইলি বললো : আম্মো যাবো।

সিমলি এতক্ষণ ঘর-বাহির করে শেষে একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। মাঝে মাঝে ওর বুকটা মোচড় দিয়ে ফুলে ফুলে উঠছিল চাপা কান্নায়। পিসি যাবে শুনে সেও বলে : আম্মো যাবো।

শুনে রঘু শাসিয়ে ওঠে : তুই কুথায় যাবি ? যাওয়া হবেন নি তোর।

সিমলি জলভরা চোখে কুইলির দিকে তাকায়। কুইলি ওকে কাছে টেনে এনে বলে যায় : তোর যাওয়া ঠিক হবেন নি। তুই ঘরে যা। সন্ধ্যার মধ্যেই আমি ফিরে আসব ঠিক।

বুধিয়ার সাইকেল পড়ে রইলো ওদিকের বারান্দায়। বংশীর গোরুর গাড়ি ওকে নিয়ে রাস্তা, বুড়োবটতলা, তালবাঁধের বাঁক ঘুরে চন্ননপুরের রাস্তায় ধীরে ধীরে আব্‌ছা হয়ে যেতে থাকে। যতক্ষণ দেখা যায়, বুড়োবটতলায় দাঁড়িয়ে সিমলি চেয়ে থাকে সেইদিকে। যেই কৈবর্তপাড়ার আড়ালে হারিয়ে যায় গাড়িটা, সিমলি ফুঁপিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে।

আকাশের ওপারে কারা থাকেন ? কাদের ঘর উখানে ? উরা কি দেখতি পান পিরথিবির মনিষ্যিদের ? কপালিপাড়ার গাছগাছালি ঘরদোর— সোব্ ? উরা সোব্ মনিষ্যির মনগুলানও দেখতি পান ? উরা মনিষ্যির ভালও করতি পারেন, মন্দও করতি পারেন। পারেন নি ? পারেন যদি, আমি জলশিয়রের কপালিপাড়ার রঘু কপালির বিটি সিমলি গড় হয়ে তোর খানে মানছি, ভগমান, বুধিয়াকে ভাল করে ফিরিয়ে এনে দে। উর জন্যে রক্ত দিতে হবেন ? কত রক্ত দিতে হবেন ? দিব। বুধিয়াকে ভালো করে ফিরিয়ে এনে দিবি ত ?

ওদের বেড়ার ধারে আছে কবেকার একটা বেলগাছ। ওর নোয়ানো ডাল থেকে একটা কাঁটা আর একটা পাতা ছিঁড়ে আনে সে। সে শুনেছে বেলগাছের পাতা আর বেলগাছের কাঁটা খুব শুদ্ধ, দেবতারা খুব ভালোবাসেন। বুড়োবটগাছের ঝুরিগুলোর আড়ালে বসে সে বেলপাতাটা মাটিতে রাখলো। চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল। ভালো করে তাকিয়ে নিল। কেউ কোথ্থাও নেই। এবার চোখ বুঁজে বাঁ হাতের ঠিক মাঝখানের আঙুলটাতে কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। বেশ জোরের সঙ্গেই। কাঁটাটা বের করে এনে চোখ খুলে দেখে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে নামছে। সঙ্গে সঙ্গে ডানহাতে পাতাটা মেলে ধরে ঠিক আঙুলটার নিচেই। রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে থাকে পাতায়। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—। বাস্। বটের ঝুরির নিচের অন্ধকারে পাতাটা রেখে দিয়ে সে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। চোখ খুলেই সে দেখতে পাবে, তার সামনে বুড়োবটের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন ভগমান। কী সোন্দর দেখতি। শরীল থিকে আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছেন ঠিক সূযযি ঠাকুরের মতন, ফুলের সুবাসের মতন সুবাসে বুড়োবটতলা ভরে গেছেন।

: কি চাস তুই ?

সিমলি দেরি করতে না পেরে চোখ খুলে ফ্যালে। কেউ কোথ্‌থাও নেই। মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। সে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়।

: ভগমান, তা'লে তুই কি নেই ?

চন্ননপুরের সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তার বুধিয়াকে পরীক্ষা করে বললেন: মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাও। ওর যে অসুখ করেছে, সে অসুখের ওষুধ এখানে নেই। আমি লিখে দিচ্ছি, ওখানে ভর্তি করে নেবে। ভালো হয়ে যাবে।

: ঠিক ভাল হয়ে যাবেন ত, ডাক্তরবাবু ?

বংশী নিজের গলাটাকে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। সে এত মোলাম করে কথা বলতে শিখলো কোথা থেকে ?

: চল্‌, বাপ্‌। তোকে শহরের হাসপাতালে লিয়ে যাই। উখানে ভাল হয়ে যাবি তুই। ডাক্তরবাবু বলেছেন।

বুধিয়াকে বংশী বুকে তুলে নিয়ে আবার গাড়িতে শুইয়ে দিল। সূর্য ডুবে গিয়েছিল। তবু অনেকক্ষণ আলো ছিল আকাশে। তারপর ভুসো কালির মতো অন্ধকার নামলো রাস্তায়। গাড়ির নিচে টিমটিমে বাতিটা জ্বেলে দিল বংশী। তারপরই সে জোরে জোরে মুখে আওয়াজ করে বলদ দুটোকে হাঁকতে লাগলো।

: কুইলি—

: হঁ।

: বুধিয়া কি করছেন ?

: ঘুমিয়ে পড়েছেন।

: ঘর আছেন ?

: আছেন।

: ভাল হয়ে যাবেন। কি বল্‌ ?

: হঁ—

আবার মুখে শব্দ করে বলদ হাঁকতে থাকে বংশী। গড় বাসন্তীর বাস চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে শহরের বাসও চলে গেল গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে। বাসের ধোঁয়ার গন্ধ কিছুক্ষণ ভেসে রইলো বাতাসে। বাসের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল।

: কুইলি—

: উঁ ?

: আমি ত আগে ইরকম ছিলাম নিরে ?

: কি রকম ?

: বুধিয়ার জন্যে মনটা ইরকম আকুলি-বিকুলি করে ক্যানে ? আগে ত ইরকমটা

হতেন নি। ইখোন ইরকম হয়েন ক্যানে। উ কী গতজন্মে আমার বাপ ছিলেন ?

কুইলি বংশীর দিকে তাকায়। অন্ধকার আকাশে বংশীর ছায়াটাকে বেশ বড় দেখায়। মনিষ্যিটা দিন দিন কি রকম বদলে যাচ্ছেন। আগে মনে হতেন, উর ভিতরটা একেরে কাঠ। ইখোন মনে হয়েন, ওর ভিতরে সমুদ্দুরের জোয়ার-ভাটায় যেন ইকটা জলের নালী খাল কাটা হয়ে গেছেন।

চাকার শব্দে কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে রাত নিশুতি হলো। এরই মধ্যে বুধিয়া কেশে উঠলো। খুব জোরে। কুইলি ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। জ্বরটা বাড়ছে মনে হয়। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে অন্ধকারে।

কুইলি বলে : দেশলাইটা দে দি'নি ইকবার।

: ক্যানে ?

: ইকবার দেখব।

: কি দেখবি ?

: আবার উঠলেন নি কি ?

অর্থাৎ রক্ত। রক্ত দেখলে মানুষ কেন যেন ভয় পায়।

বংশী অন্ধকারে দেশলাই এগিয়ে দেয়। কুইলি দেশলাই জ্বালে। বালিশের পাশটা দেখে নেয় ভালো করে। কাঠি নিবে গেল। অন্ধকার। বংশী জিজ্ঞেস করে : কি দেখলি ? ফের্ উঠেছেন ?

: হঁ।

খানিক পরেই বংশীর কাঁধের ওপর দিয়ে পুব আকাশের গোড়ায় সাতভায়া দেখা গেল। তার একটু পরেই আকাশের গায়ে শহরের আলোর ফোয়ারা চোখে পড়লো। বংশী খুব জোরে জোরে বলদ হাঁকতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা শহরে পৌঁছে গেল।

জলশিয়রের আকাশে যেন কান্না জমে আছে। একটু ছোঁয়া লাগলেই ছল্‌কে বান নামবে কান্নার। সিমলির মুখের দিকে তাকানো যায় না। যেন ওর দু'চোখের কোণেও কান্নার মেঘ জমে আছে। সেদিন ওরা যখন ফিরলো না, রাতেও না, ওর বুকের ভেতরটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। সারারাত ঘুমোতে পারে নি ও। সকালে বুড়োবটতলায় গিয়ে মাটির উঁচু ঢিবিটার ওপর দাঁড়িয়ে সে কৈবর্তপাড়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কখন গোরুর গাড়িটার মাথার ছই দেখা যায়। মেঘের কোল ঘেঁষে অনেক বকের সারি উড়ে গেল। জটা খুড়ো গেল, ঘনু বুড়ো গেল, শিবু ভাই গেল। কিন্তু কেউ এলো না ওদিক থেকে কপালিপাড়ার দিকে।

অক্ষত বেলপাতায় পাঁচ ফোঁটা রক্ত বুড়োবটতলায় দিলে নাকি মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এটা এখনও কপালিপাড়ার কারো কারো বিশ্বাস। বংশী বিশ্বাস করে না। বাতাসীও বিশ্বাস করে নি। কিন্তু সিমলির কিশোরী মন করে। সে মনে করে,

বুধিয়া ভালো হয়ে ফিরে আসবে। সে রোজ সকালে বাসি কাপড়ে বুড়োবটতলায় গিয়ে তার মনের কামনা চোখের জলে জানিয়ে আসে।

বুধিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করে বংশী আর কুইলি খালি গাড়ি নিয়ে পরের দিন ফিরে এসেছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে এইজন্যে, বংশীকে বীজতলা তৈরি করতে হবে। আর তাছাড়া জল নেমে গেলে কপালিপাড়ার রাস্তায় গাড়ি নিয়ে আসা মুশ্‌কিল হবে।

বীজতলা তৈরি করতে কয়েকদিন লেগে গেল বংশীর। ক'দিন ধরেই আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমছিল আর সেই মেঘের গা ঘেঁষে বকের সারি উড়ে যাচ্ছিল। মেঘের গায়ে বকের সারি উড়ে যেতে দেখলে নাকি বৃষ্টি হয়। বংশী বীজতলা তৈরি করেই ছুটেছিল হাসপাতালে। বৃষ্টির মধ্যেই সেদিন দুপুরের একটু পর ফিরে এলো মুখ শুকিয়ে। কাদা পা ধুয়ে এসে সে দাওয়ায় বসে একটা বিড়ি ধরালো। কুইলি রান্না করছিল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে এসে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঘুরে বসলো। বংশীর মুখ দেখে সে বুঝে নিয়েছে, খবর খুব একটা সুবিধের নয়। উঠোনে ছিপছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কুইলি সেইদিকে চেয়ে বসেছিল। মনটা বৃষ্টিভেজা আকাশের মতো শপ্‌শপে হয়ে আছে। সিমলিকে কি বলবে সে? কথা বলতে হচ্ছে করছিল না, তবু সে বৃষ্টির দিকে চেয়ে খুব আলতোভাবে জিজ্ঞেস করে: কি রকম দেখলি?

: ভাল নয়।

বৃষ্টির আওয়াজের মতো তার গলার স্বর। বেশ ভারী। হাওয়া নেই। আকাশ গুমোট করে আছে।

: আর রক্ত উঠেছিলেন?

: উঠেছিলেন।

ওদের নিস্তব্ধতার মধ্যে বৃষ্টি পড়ে। শব্দ হয়। ঠিক দীর্ঘশ্বাসের মতো। ওরা বুঝে নিয়েছে, বুধিরার অসুখটা সাধারণ জ্বরজাড়ি নয়। কোন বড় ধরনের অসুখ। নয়তো বাণটান মেরেছে কেউ। বাণ মারলে কে আর মারবে? মনে মনে জটাকে কেমন সন্দেহ হয়। জটা যেমন শয়তান, ও সব পারে।

আকাশ কোন্ দূরে, সমুদ্দুরে হয়তো বা, একবার গুড়গুড় করে চুপ করে গেল। আজ তাহলে আরো বর্ষাবে।

কুইলি বলে: জটাভাইকে আমার কেমন বিশ্বাস হয়েন নি।

: ক্যানে?

বংশীর প্রশ্নে চমকের ছোঁয়াচ্।

: জটা ফের কিছু করেছেন নি কি?

: উ বুধিয়াকে বাণটান মারতি পারেন। না'লে উর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবেন ক্যানে?

বংশী কেমন গুম্ মেরে যায়।

ওঝারা বাণ মারেন। শত্তুরকে বাণ মারেন কেউ কেউ। প্রিয় ওঝা মারেন। টাকা দিলে মারেন। তা'লে বুধিয়াকে মারবেন ক্যানে? বংশী বলে: আমাকে না মেরে উ বুধিয়াকে মারবেন ক্যানে? বুধিয়া ত কুনো দোষ করেন নি। ... টা বুধিয়ার বাস্তুটাও গিলেছেন। বলেন, উ নিকি উর মাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। আসলে, টাকা-ফাকা কিছু লয়। আর দিলেও দশ-বিশ টাকা দিয়ে থাক্লি দিয়ে থাকতি পারেন। আসল কথা হলেন গিয়ে উর বাস্তুটা কব্জা করা। উ ত বাস্তুটা কব্জা করেছেন। বুধিয়া উর বাস্তু ফিরত লিতেও চায়েন নি। তা'লে উকে উ বাণ মারবেন ক্যানে?

: উর বাস্তুর জন্যে লয়। তোর জমিনের মামলার রায় বুধিযাই ত লিয়ে এসেছিলেন। কথাটা উ জানতি পেরেছেন হয়তো।

আবার দূরে সমুদ্দুরের কোথাও গুম্‌গুম্ করে মেঘ ডাকলো। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। বংশী বোধ হয় কুইলির কথাগুলো মনে মনে ভাবছে। বুধিয়া জগৎ সরদারকে দিয়ে তার জমিন, বলতে গেলে, জোর করেই জটার পেট থেকে কেড়ে এনেছে। কথাটাতে ভেজাল কিছু নেই। জটার পক্ষে তা জানতে পারা সম্ভব। আর এও সত্যি কথা, ওর জমিন ফেরত দেবার ইচ্ছে জটার ছিল না। ও ভেবেছিল, বংশীর জমিন কোনদিনই ওর আর হাতছাড়া হবে না। ভাগপাট্টা করে নিয়ে সে এক রকম ও ব্যাপারে নিশ্চিন্তই ছিল। কিন্তু বংশী ফিরে এসে ওর আশায় কাঁটা দিয়েছে। তবু যেটুকু আশা ছিল, বুধিয়া একেবারে তার গোড়াটাই ধরে দিয়েছে কেটে। জটা ব্যাটার ক্ষেপে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। উর জন্যে উকে বা... মেরেছেন গিধোড়টা। শালা গিধোড়টাকে খুন করে সমুদ্দুরের চড়ার বালিতে গঙ্গার মুখে দিয়ে আসব ইবার। বংশী পুছ করে: গঙ্গা পূজা কবে রে?

: কদিন বাদেই হবেন।

: ঠিক আছেন। উদিন জটার হবেন।

কুইলি চমকে তাকায় বংশীর মুখে। ওর মুখে এক চিলতে হাসির রেখা। বড়ো ভয়ানক সেই নীরব হাসি।

: উর কিচ্ছুটি করব নি আমি। তুই যেমন লাটা মাছ মাটিতে আছাড় মেরে ঘরে লিয়ে আসিস। আমি তেমনি উকে ইকটা আছাড় মেরে গঙ্গার মুখে দিয়ে আসব।

বুধিয়ার জন্যে বংশী ভেতরে ভেতরে কেমন পাগল হয়ে গেছে। নিজের ছেলের প্রতি স্নেহের টান কেমন, তা বোঝার সুযোগ কখনো হয়নি তার। কিন্তু বুধিয়ার জন্যে সে তার বুকের ভেতরে একটা কেমন বড়ো কোমল অনুভূতিকে কেঁদে বেড়াতে অনুভব করে। এ রকমটা তার আগে কখনো হয় নি। ইদানীং হচ্ছে। তার কেমন যেন মনে হয়, বুধিয়া তার মরা বাপ, তার মরা ঠাকুরবাপ। ওর জন্যে বংশীর

বড়ো মায়া হয়। গভীর মায়া। জমিনের ওপরে তার যেমন মায়া, তেমনি। এই পিরথিবিতে বুধিয়ার কেউ নেই। বাপ নেই, মা নেই। কেউ নেই, কিছু নেই। নিজের জন্যে কিছু করেন নি উ, করেছেন শুধু পরের জন্য। এমন ছেল্যে কপালিপাড়ায় ক্যানে, ভদ্দরলোকদের ঘরেও হয়েন না। হেই ভগমান, বুধিয়া যেন ভাল হয়ে উঠেন।

বেলা হয়েছে ঢের। বৃষ্টি পড়ছে ছিপছিপ— ছিপছিপ। এ বৃষ্টি থামবে না। এ সহজে থামার বৃষ্টি নয়। বংশী কুইলিকে বলে : ভাত দে।

কুইলি মুখ নিচু করে ভাত বাড়তে যায়। বংশী বসে ভাবে, জটাই কি বুধিয়াকে সত্যিই বাণ মেরেছেন? না'লে উর মুখে বার বার রক্ত উঠছেন ক্যানে? মধুয়া থাকলি পুছ্ করা যেতেন। আচ্ছা,ঘনুখুড়াকে পুছ্ করলি হয়েন না?

বড়ো চিন্তা। বংশী সহসা ভেবে কিছু ঠিক করতে পারে না। কয়েক গাল ভাত মুখে পুরে সে কুইলির চোখের দিকে খুব গভীরভাবে তাকায়।

: কুইলি----

কুইলি ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে। আকাশ গুড়গুড় করে ডেকে ওঠে।

: মধুয়া ঠিক বেঁচে আছেন ত? নি কি কেউ মেরে টেরে ফেলেছেন কুথাও?

: কি বলছিস তুই? মাথা খারাবি হয়েছেন নি কি তোর?

: তা'লে এ্যাদ্দিন আসছেন নি ক্যানে উ? শুধু বুধিয়া লয়, জবর সিংও আমাকে বলেছেন একদিন, মধুয়া আস্তি পারেন। হঁ। আমাকে বলেছেন। উর নামে নি কি হুলিয়া আর নেই।

: আমাকে বলেছিস, বলেছিস। উ কথা আর কাউকে কুনোদিন বলিস নি। মধুয়াভাই ঠিক বেঁচে আছেন। একদিন ঠিক ফিরে আসবেন। দেখে নিস—

হয়তো কুইলির কথাই ঠিক। মধুয়া ফিরে আসবে। কিন্তু কবে? বংশীর ভেতরটা বড়ো হানটান করে।

এ সনে গঙ্গাপূজা একটু দেরিতে এলেন। জল নেমে যাবার পর। ফি-সন ই দিনটাতে মা-গঙ্গা উর কোলের ছেল্যেমেয়্যেদের কাছে পূজা নিতে আসেন। বংশী কুনোদিন গঙ্গাপূজায় চাঁদা দেন নি। উ ত ইকটা রাক্কুসী। উ উর জমিনকে বাঁজা করি দিয়েছেন উর নোনা জিভ বুলিয়ে। রাক্কুসীর ফের পূজা কিসের? উ চাঁদা দেন নি, উর বাপ দেন নি, উর ঠাকুর বাপও দেন নি।

ঘনু বলে : বংশী, ইবার তুই কি করবি রে? চাঁদা দিবি ত?

: চাঁদা আমি দিব নি। আমার তিন পুরুষ দেন নি।

ঘরের ভেতর থেকে কুইলির গলা শোনা গেল : না। বংশীভাই ই সনে চাঁদা দিবেন। মা-গঙ্গার পূজা বলি কথা। কাঁচাখেকো দেব্‌তা। বুধিয়া হাসপাতালে মুখে রক্ত তুলছেন।

কুইলির কথায় বংশীর বুকের রক্তে কেমন একটা খিঁচ লাগে। বুধিয়ার মুখটা

মনে পড়ে। ওর মনের ভেতরটা ভিজে ওঠে বলে : ঠিক আছেন। কুইলি যখন বলছেন, ই সনে আমি চাঁদা দিব।

ঘনু হাসে। উর মুখে একটিও দাঁত নেই। বুড়া মনিষ্যির দাঁতহীন মুখের হাসির ইকটা ভেন্ন সুন্দরতা আছেন। উদিকে বংশীর লজর নেই। সে বলে : চাঁদা দিব। কিন্তুক আমি যাব নি।

: উ দেখা যাবেন।

তাই হলো। গঙ্গাপূজার দিন বংশী ঘরে রইলো। খুব ভোরে উঠে সে বুধিয়াকে দেখতে গেল। ফিরলো একেবারে সন্ধ্যেয়। খবর ভালো নয়। এখনো মাঝে মাঝে কাশিতে রক্ত উঠছে। বড়ো শুকিয়ে যাচ্ছে চেহারাটা। বংশীর এবার কেমন যেন মনে হচ্ছে, বুধিয়া বোধ হয় বেশিদিন বাঁচবে না। ফিরবার পথে ওর মনের ভেতরটা এক সময় ভীষণ হু-হু করে উঠলো।

বালিয়াড়ির ওধারে সমুদ্দুরের চরে আজ পূজো হচ্ছে মকরবাহিনী গঙ্গার। কপালি পাড়ার সবাই গেছে। যাবে না, যাবে না করে জটাও গেছে। যায় নি শুধু কুইলি আর রঘু কপালির মেয়ে সিমলি। কুইলি আজকাল কথা বেশি বলে না। ছলছল চোখে শুধু মুখের দিকে চেয়ে থাকে একটা বোবা মায়ের মতো। বংশী সন্ধ্যের দিকে ফিরে এলে ও বংশীর মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে দূরে সরে গেল। সব ওর বোঝা হয়ে গেছে। ওর যেন আর কিছু শোনার নেই, আর কিছু বলার নেই।

বংশী হঠাৎ পুছ করে : তোরা পূজার থানে যাস্‌নি ক্যানে ? সন্‌ঝা হয়ে গেলেন। যাবি কখন ? আমি যাব নি বলেছি, যাব নি। তোরা যাবি নি ক্যানে ?

কুইলি বংশীকে বোঝার চেষ্টা করে।

: সত্যি বল্‌ ত, বুধিয়ার খারাপ কুনো হয়েন নি—

বংশীর মনেব ভেতরটা কেমন কুঁকড়ে যায়। জোর দিয়ে বলে : খারাপ হবেন ক্যানে ? খারাপ কুনো হয়েন নি ত। বুধিয়া ত ভাল আছেন। আমার সঙ্গে কথা বললেন। কত কথা ! যা, তোরা মেলায় যা। বুধিয়া ঠিক ভাল হয়ে উঠবেন।

সমুদ্দুরের চরে হাজার আলোর রোশনি। আসমানে থম-মেরে-থাকা শাদা মেঘে লেগেছে আলোর ছোঁয়া। যেন মর্তের গঙ্গা আর আকাশ-গঙ্গার চলেছে চোখ-ঠারাঠারি খেলা। এত আলো ! সামনের বালিয়াড়ির গায়ে যেন আলো গড়িয়ে পড়ছে। আকাশের মেঘের গা চুঁইয়ে আলো নামছে জলশিয়রের মাঠে।

কুইলি সিমলিকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় গেল। ওকে দেখে পুলি এগিয়ে এলো।

: এতক্ষণে তোর সময় হলেন ? আজ সারারাত তোকে লাচতি হবেন ! যেমন দেরি করে এসেছিস—

: আমি ইখোন কি লাচব রে, বউ ? লাচবেন সিমলি। উর ইখোন উঠতি কাঁচা বয়েস।

সিমলি আড়চোখে একবার কুইলির দিকে তাকিয়ে নেয়। মুখে বিরক্তি।

: আম্মো আজ লাচব নি, পিসি।

পুলি হাসিমাখা ভুরু নাচায়।

: তোদের আজ কী হলেন, বল্ দি নি। পিসি বলেন, লাচবনি, সিমলি বলে, লাচব নি। লাচবেন তা'লে কারা? কপালিপাড়ার ঢকঢকে ঝুনো বুড়িরা? সিমলি—

: আমার পায়ে লাচ আসছেন নি আজ। আমায় ক্ষেমা দে বম্মা (বড়-মা)। আমি আজ লাচতি লারবো।

ঠিক তখনই পেছন থেকে রাখুর বউ একবাটি হাঁড়িয়া এনে ডাকে: কুইলি—

কুইলি পেছন ফিরে তাকায়। বলে: আমি আজ লিশা করব নি।

গঙ্গাপূজার দিন কপালিপাড়ার কি পুরুষমনিষ্যি, কি মেয়েমনিষ্যি সোব্বাই একটু-আধটু নেশা করে থাকে। ওটাই রীতি। যদি কেউ অমান্য করে, তাতে দেবী অপ্রসন্ন হন। ক্ষতি হয়।

প্রসাদী হাঁড়িয়াতে নেশা হওয়া একটা সুলক্ষণ। তার মানে, মা-গঙ্গা তাঁর ভক্তটির ওপরে সত্যিই প্রসন্ন হয়েছেন।

পুলির নাকের পাটা দুটো ফুলতে থাকে। ক্রোধের লক্ষণ।

: তুই লাচবি নি, পেরসাদ খাবি নি, ত এলি ক্যানে?

: উ কথা মা-গঙ্গাকেই পুছ কর।

: খাবিনি ত খাবি নি। আমি কিন্তুক খাব, লাচব। ক্যানে জানিস?

কুইলি পুলির কানের কাছে মুখ এনে বুঝতে পারলো, এরই মধ্যে সে একটু প্রসাদ চড়িয়ে ফেলেছে। গলার স্বর যথাসম্ভব নামিয়ে বলে: জবর সিং আসবেন।

পুলি কুইলিকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়। চারদিকে তখন নাচগানের প্রস্তুতি চলেছে। কুইলি পেছন ফিরে দেখলো, সিমলি রাখুর বউর হাত থেকে প্রসাদী হাঁড়িয়ার বাটিটা নিয়ে খালি করে বাটিটা রাখুর বউর হাতে ফিরিয়ে দিল। দেখে ভুরু কোঁচকায় কুইলি।

: আজও তুই লিসা করলি, সিমলি!

: করলাম পিসি। ফের খাব। আমায় আর এক বাটি দে, খুড়ি—

: না। উকে আর দিবি নি বউ। উর লিশা হয়ে যাবেন।

: হবেন নি খুড়ি, তুই দে, দে নি—

সিমলিকে কিছুতেই ঠেকানো গেল না। সে আবার এক বাটি হাঁড়িয়া খেল। তারপর আবার একবাটি।

একটু পরেই মাদলের পিঠে কাঠি পড়লো। নাচগান শুরু হলো। ফি-সন এই একটি দিন খুশির বাঁধভাঙা বন্যা আসে সমুদ্দুরের চরে। প্রসাদ আর প্রসাদী, পানভোজন এবং নাচেগানে সমুদ্দুরের চরটা ভিন্ন চেহারা নেয়। কয়েক ডজন হ্যাজাক জ্বলে। মাদল বাজে গোটা দশেক। অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে আর

গাইতে থাকে কপালিপাড়ার সব যুবতী মেয়েরা। সঙ্গে বাজে বাঁশের বাশি। বছরের এই একটি দিন নাচে গানে আনন্দে ভরপুর পূজার অর্ঘ্য নিতে মর্ত্যে আসেন স্বর্গের সুরধনি।

আজকের নাচেগানে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারে নি কুইলি। কিছুই ওর ভালো লাগছে না আজ। সে আজ আসতেই চায় নি। সিমলিও চায় নি। ওদের জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে বংশী।

পূজার মূল ছাউনির এক পাশে বালিয়াড়ির গা ঘেঁষে বসেছে কুইলি। ওর পাশে সিমলি। সিমলি বালিয়াড়ির ওপর গা ঢোলে দিয়েছে। সোজা হয়ে বসার ক্ষমতা ওর আজ নেই। অনেকখানি হাঁড়িয়া খেয়ে ফেলেছে সে। এদিকটা আলো কম। আবছা অন্ধকারে এদিকটা ঢাকা।

নাচগানের আনন্দের মধ্য দিয়ে রাত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলে গভীর নিশুতির দিকে। সবার শরীলে ক্লান্তির ছোঁয়াচ।

পেছনের বালিয়াড়র ওপর কিসের শব্দ হলো। এমনিতে বালির ওপর দিয়ে হাঁটার সময় কোন শব্দ হয় না। পায়ের সঙ্গে পায়ের আওয়াজটাকেও গিলে নেয় পায়ের তলার বালি। কিন্তু মানুষের ফোঁসফাঁস দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ ঢাকা পড়ে না। কুইলি হঠাৎ শুনতে পেল একটা ঘন ঘন নিশ্বাস পতনের আওয়াজ। পেছন ফিরে তাকিয়েই সে চমকে যায়। একটা কালো চেহারার মানুষ। দীর্ঘকায়। যেখানে হ্যাজাকের আলো পড়ে নি, অন্ধকার, আবছা আলোর আভাসটুকু পড়েছে কি পড়েনি, সেখান দিয়ে মানুষটা লম্বা-লম্বা পা ফেলে হেঁটে গেল। নিঃশব্দে, সবার নজর এড়িয়ে। বেড়ার আড়ালে দাঁড়ালো কুইলি। মূর্তিটি তাকে দেখলো কি দেখলো না, বোঝা গেল না। তারপর মনিষ্যিটা ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসলো হাত জোড় করে। হ্যাজাকের আলোয় লোকটার চেহারা স্পষ্ট হলো। কুইলির চোখদুটো বিশ্বাস করে উঠতে পারে না দৃশ্যটা। এও কি সম্ভব? ভুল দেখছে না তো সে? সিমলি শুয়ে আছে বালিয়াড়ির বালিতে পিঠ দিয়ে। বোধ হয়, ঘুমিয়ে পড়েছে। মনিষ্যিটা বালিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। করুক। মনিষ্যিটা উঠলো। উঠে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ। তারপর। ফিরে চলে। কুইলির সন্দেহ যায় না। সে উঠে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

: কে? কুইলি?

: হঁ।

: মা-গঙ্গাকে জানিয়ে গেলাম রে —

কুইলি নিজের কান দুটোকেও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যেন। বংশী রাতের অন্ধকারে গোপনে মা-গঙ্গাকে পেন্নাম করতে এসেছে আজ! জীবনে এই প্রথম। ওর বংশেও এই প্রথম। কোন কথা মুখে আসে না কুইলির। সে বংশীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে নিষ্পলক।

: বুধিয়ার কথা জানিয়ে গেলাম মা-গঙ্গাকে। উ যেন ভাল হয়ে উঠেন।

মাথার গামছা খুলে চোখ মুছে সে বালিয়াড়ি পেরিয়ে অন্ধকারে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে নিজেকে।

সেদিন রাত ভোর হবার অনেক আগেই আকাশের মুখ হাঁড়ি। হাওয়া দিতে লাগলো বেশ জোরে। বাজ ডাকলো, আকাশের বুকটা বুঝি ফেটে ফালা-ফালা হয়ে গেল। শেষ রাতের দিকে নাচগান-মাদলের উম্মাদনার রেশ ঝিমিয়ে পড়েছিল। শরীল যেন আর টানতে পারছিল না। শেষে নাচগান থামলো। ঘরে ফিরবার মতো অবস্থা যাদের ছিল, তারা ঘরে ফিরে গেল। যারা ছিল নেশায় বেহুঁশ, তাদের শরীল নেতিয়ে পড়েছিল চরের বালির ওপর। এমন সময় আকাশ উঠলো ক্ষেপে, সমুদ্দুর ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো প্রবল আক্রোশে। হাওয়ার দাপটে পূজা-মণ্ডপের ছাউনি উড়ে গেল। নেশাচ্ছন্নেরা সারা গায়ে বালি আর রাত্রি জাগরণের চিহ্ন নিয়ে কোনমতে ঘরে ফিরে গেল।

এরকমটা কোন সনেই হয় নি। ফি-সনেই নির্দিষ্ট দিনে পূজো হয়। পূজোর পরের দিন সন্ধ্যেয় ভাসান হয়। ভাসান উপলক্ষে আর এক কিস্তি হাঁড়িয়া খাওয়া হয়। আমোদ-ফূর্তি হয়। এ সনে ওসব কিছুই হতে পারলো না। সমুদ্দুরের দেবী একাই ভেসে চলে গেলেন সমুদ্দুরে। আর ভাসান দিতে হয় নি।

সেই-যে ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো, চললো একটানা সাতদিন। এমন ঝড়বৃষ্টি যে, ঘর থেকে কেউ বেরোতেই পারে নি। বংশী হাসপাতালে যাবে, ঠিক করেছিল। যেতে পারে নি। ওর মনটা পড়ে ছিল সদর হাসপাতালের বেডে। বুধিয়ার কাছে। কেমন আছে বুধিয়া? ওর অসুখটা কি এখনো সারে নি? এখনো কি কাশিতে ওসব ওঠে। ওর কেমন মনে হয়, বুধিয়া এতদিনে নিশ্চয়ই সেরে উঠেছে। কাঁচাখেকো দেব্‌তা মা-গঙ্গা কি ওর প্রার্থনা শুনতে পান নি? জীবনে কোন প্রার্থনাই সে করে নি। একটিমাত্র প্রার্থনা। তাও যদি না থাকেন, তা'লে কি পেয়োজন...? না না, পেয়োজন আছেন। বুধিয়ার জন্যে পেয়োজন আছেন। বুধিয়া ভাল হয়ে উঠবেন।

কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! থামেই না। সাতদিন একেবারে একটানা। বৃষ্টি থামলো তো জল সরে না। জল সরতে সময় লাগলো। বৃষ্টিতে একটা কাজের কাজ হয়েছে। ধানের চারাগুলো জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে। এরপর রোপনের জন্যে জমিন তৈরি করে ফেলতে হবে। তারপরে নেমে পড়ো রোপনের কামে। ক'টা রোজ মাত্তর। শরীলের বিশ্রাম থাকবেন নি। আলবাঁধে ঘেরা জমিনের আটকানো জলে লাগবে ডাইনির দাঁত। হাত-পা কুরে কুরে খাবে। হাতে-পায়ে বীজকুড়ি বেরোবে কাঁটা-কাঁটা। উদিকে লজর দিলে চলবেন নি। কিন্তু তার আগে বুধিয়াকে একবার দেখে আসা চাই।

রোদ উঠলো। যেন বাইশ বছরের তরতাজা জোয়ান। চোখের ধারালো চাউনিতে

কল্‌জে পুড়ে যায় যেন। বুকের ভেতরে কেমন নেশা ধরে। মাঠের জলে রোদ্দুর আড়মোড়া ভাঙে। রোদ্দুর তো নয়। যেন কার আইবুড়ো বয়েস। সিমলি ওদিকে তাকাতে পারে না। ওর শরীলটা কেমন যেন শিউরে শিউরে উঠতে থাকে। বুকে একটা টান ধরে। গলা বুজে আসে। চোখের কোণে জল জমে ওঠে। ভুল করে ওর দু'চোখের চাওনি কৈবর্তপাড়ার রাস্তা ধরে চন্নপুরের দিকে চলে যায়। একটিও জনমনিষ্যি নেই। কে আর আসবে? তার মনে পড়ে, বুধিয়া হাসপাতালে শুয়ে আছে। ওর খুব অসুখ। জ্বর-কাশি—কাশিতে রক্ত। সে স্বচক্ষে দেখেছে। তবু তার মন বলছে, বুধিয়া ভালো হয়ে উঠবে। ভালো হয়ে উঠতেই হবে। সে যে বুড়োবটের কাছে বেলপাতায় রক্ত দিয়েছে—ঠিক পাঁচ ফোঁটা। তা কি মিথ্যে হবে? সিমলি বুধিয়াকে অনেকদিন দেখে নি। ওর মনটা সব সময় কেমন যেন করে। তার বুকের ভেতর কাপড় নিঙ্‌ড়ানোর মতো একটা কান্না বারে বারে মোচড় দেয়। তার মনের সেই কান্নার কথা ও কাউকে বলতে পারে না। যখন কান্না পায়, সে বুড়োবটতলায় ছুটে যায়। বটের ঝুরি ধরে চেয়ে থাকে কৈবর্তপাড়ার দিকে। চোখের পাতা পড়ে না। কৈবর্তপাড়ার মাথার ওপর দিয়ে বকের সারি উড়ে যায়। যেতে যেতে এক সময় চোখের আড়ালে হারিয়ে যায়। ভারি খারাপ লাগে। কেমন যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে ওর বুকের ভেতরটা।

বংশীর ঘরের দক্ষিণের দাওয়ায় বুধিয়ার সাইকেলটা হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এই সাইকেলে চড়ে বুধিয়া শেষ কপালিপাড়ায় এসেছিল গায়ে জ্বর নিয়ে। সেই থেকে সাইকেলটা ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে। সেই একভাবে।

বংশী আজ বুধিয়াকে দেখতে যাচ্ছে। কেউ বলে নি। কিন্তু সে জানে বংশীকাকা আজ হাসপাতালে যাচ্ছে। বুধিয়াকেই দেখতে। পিসি জানে। কিন্তু সে ওকে কিছু বলে নি। বংশীও বলে নি, সে কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু পিসি জানে, বংশীকাকা বুধিয়াকে দেখতে যাচ্ছে। বংশীকাকা বুধিয়াকে যে এত ভালোবাসে, সে আগে জানতো না। কেউ জানতো না। সবাই জানতো, সে পাথরের তৈরি ইকটা বদ্‌রাগী মনিষ্যি। উর শরীলের মত উর মনটাও পাথর দিয়ে তৈরি। কাউকে কুনোদিন ভালবাসেন নি, কারুর জন্যে ভাবেন নি কুনোদিন। শুধু নিজেকে নিয়েই উর সব। সেই বংশীকাকা বুধিয়ার জন্যে আজ ভেবে সারা হচ্ছেন। আজ জমিনের কাম ফেলে ছুটছেন হাসপাতালে। বংশীকাকা যদি আজ উকে সঙ্গে লিয়ে যেতেন, তা'লে উ হাসপাতালে বুধিয়ার শিয়রের কাছে বসে উর মাথায় কপালে ঠোঁটে একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে আসতেন: তুই শিগগির ভাল হয়ে উঠবি।

সিমলি মুখ শুকিয়ে ছলছল চোখে দাঁড়িয়েছিল কুইলির পাশে। সবে সিঁদুরে সকাল হয়েছে। মাঠের কামে যাচ্ছে কপালিপাড়ার কপালিরা। বংশী জমিনের কাম বন্ধ রেখে অনেকদিন পরে গেল সদর হাসপাতালে বুধিয়াকে দেখতে। একটা ভয় গুড়গুড় করছিল ওর বুকের ভেতর। হাসপাতালে গিয়ে সে কি শুনবে, কি দেখবে?

বংশীর একটা দোষ। সে তা জানে। সে অচেনা কারো সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। হাসপাতালের ডাক্তার নার্সদের সাথে কথা বলতে ও ভয়ে ওর বুক কাঁপে। বুধিয়া যে ওয়ার্ডের যে বেডে থাকে, ওখানে যেতেও তার ভয়। সামনের বারান্দার ধাপে দাঁড়িয়ে সে মনে সাহস আনার চেষ্টা করে। তারপরই ধুপধুপ করে এগোয়।

: এ্যাই!

বংশী এই ভয়ই করছিল। সে ঘুরে দাঁড়ায়।

: কোথায় যাচ্ছ?

: বুধিয়াকে দেখতে।

: কে?

: বুধিয়া—বুধন কপালি। উ ইকটা পাশ দিয়েছেন। গরিবদের জমিন দেন। বড় ভাল ছেল্যে।

: এখন দেখা হবে না। ঘুমোচ্ছে।

: অনেক দূর থিকে আসছি। অনেক দিন পর। ইকটু দেখা হলি ভাল হতেন।

: এখন দেখা করার সময় নয়। বিকেলের আগে দেখা হবে না।

বংশী নার্সটির পেছনে পেছনে যেতে থাকে।

: চক্ষের ইকবারটি দেখা। হবেন নি? না যদি হয়েন, তা'হলে একটি খবর—উ কেমন আছেন? ভাল হয়ে উঠছেন ত?

নার্সটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

: কি নাম বললে?

: বুধন কপালি—

: আচ্ছা যাও। দেখে এসো। বেশি দেরি করো না।

বুধিয়া ঘুমোচ্ছিল। কিংবা কিছু ভাবছিল চোখ বন্ধ করে। বংশী মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত রাখে। না, জ্বর নেই। বুধিয়া চোখের পাতা খুলে তাকায়।

: বংশীকাকা—

বুধিয়া ক্ষীণ একটু হাসে। ভারী ফ্যাকাসে লাগছে মুখখান।

: কেমন আছিস রে, বাপ?

তার কথার জবাব না দিয়ে বুধিয়া খুব কষ্টে ঘাড় তুলে দরজার দিকে তাকায়।

: আর কেউ আসেন নি, বংশীকাকা?

: কাকে খুঁজছিস, বাপ? কুইলিকে?

: উঁ? নাহ্—

: তা'লে?

খুব হতাশভাবে বুধিয়ার ঘাড়টা বালিশের ওপর ভেঙে পড়ে। বংশী বুঝতে

পারে, বুধিয়া চোখ বন্ধ করে কার কথা ভাবছিল, কাকে খুঁজছে সে। তাই সে অন্য কথা জিজ্ঞেস করে।

: কেমন আছিস, বললি নি ত, বাপ?

: বড়ো কষ্ট—

: কি কষ্ট, বাপ?

: সোব্ সময় শুয়ে থাকতি কষ্ট। আর—

: আর?

: বুকে বড়ো ব্যথা।

বংশী ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

: কাশি আছেন?

: হুঁ—

: আর কাশিতে উটা উঠেন?

বুধিয়া আবার ক্ষীণ একটু হাসে। বলে: আমার মাকে খুব মনে পড়েন, বংশীকাকা। বড় দুঃখী ছিলেন আমার মা, লয়?

বুধিয়ার চোখের কোটরের কোণ ছাপিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

বংশী হাত দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

: আমার বাপ কিসে মরেছিলেন, বংশীকাকা? কী হয়েছিলেন উর?

বংশীর বুকের ভেতরটা কে যেন খামচে ধরে। বুধিয়ার বাপও মরেছিল মুখে রক্ত তুলতে তুলতে। সবাই বলতো, ডাইনির লজর লেগেছে উর বুকে। উতেই উকে লিয়ে ছাড়লেন। বংশীর মনে পড়ে। তার ভয় হয় বুধিয়াকে লিয়ে। তারও মুখে রক্ত ওঠে। কুইলি বলেছিল, জটা বাণ মেরেছে। বাণ মারলে নাকি কেউ বাঁচে না। ভাবতে ভাবতে বংশীর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। বুধিয়ার যদি খারাবি কিছু হয়েন, তা'লে, জটা, তোকে আমি ছাড়ব নি।

বুধিয়ার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে বলে: কিছু ভাবিস নি, তুই ভাল হয়ে উঠবি।

বংশীর কথায় বুধিয়া মনে কোন জোর খুঁজে পায় না।

: ভাল হয়ে উঠব? তোরা না বললেও আমি জানি, আমার বাপ কিসে মরেছিলেন। আমার কি বিমার হয়েছেন, উও আমি জেনে গেছি, কাকা। আমি আর বেশিদিন বাঁচব নি। কান্নায় বুধিয়ার গলাটা বুজে আসে। বংশী ওর মুখে চাপা দেয়। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে: অমন কথা বলিস নি, বাপ। তোকে অনেক দিন বাঁচতি হবেন।

মুখের ওপর থেকে বংশীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বুধিয়া বলে: কদিন আগে মধুয়াকাকা এসেছিলেন—

: মধুয়া এসেছিলেন? তারপর? কি বললেন?

: কি আর বলবেন ? বললেন, শিগগির ভাল হয়ে উঠ। অনেক কাম বাকি।

: আর আমার কথা ?

: তোর জমিন তোরই হবেন।

বংশীকে খুব উৎফুল্ল দেখায়।

: বলেছেন ?

: হঁ। আর, আমার বুকের ছবি তোলা হয়েছেন। উতে বিমারটা ধরা পড়েছেন। আমাকে হয়ত কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হতি পারেন।

: কলকাতার হাসপাতালে ক্যানে ? ইখানে হবেন নি ?

বুধিয়া কি বলতে যাচ্ছিল। নার্সটি এসে পড়লো। বংশী বুধিয়ার বিছানার পাশে বসে পড়েছিল। উঠে দাঁড়ায়। হয়তো এবার তাকে নার্স চলে যেতে বলবে। সে নার্সের মুখে চেয়ে থাকে। নার্স বুধিয়াকে একটা ওষুধ খাইয়ে বংশীকে জিজ্ঞেস করে : কে হয় তোমার ? ছেলে ?

বংশী কি বলবে ভেবে পায় না। বুধিয়ার মুখের দিকে একবার তাকায়।

: ছেল্যে ? হঁ। আমার বাপ—

: এর অসুখটা ভালো নয়। একটু ফলটল কিনে দিয়ে যেও মাঝেসাঝে।

বংশী দেরি না করে ভারী-ভারী পা ফেলে বাজার থেকে ফল কিনে আনতে ছুটলো। দুটো আপেল আর দুটো কমলা কিনে নিয়ে এলো আগুন দামে। বুধিয়ার হাতে দিয়ে বলে : খা বাপ। খা—আমার সামনে ইকটু খা।

: ই সোব্ তুই আনলি ক্যানে ? ই ত বহুৎ দাম।

: হঁ। ইকটু খা—

বংশীর জোর জবরদস্তিতে বুধিয়া একটা আপেল হাতে নিয়ে ওতে কামড় বসায়। ওর কেমন কান্না পাচ্ছিল। জীবনে সে কোনদিন আপেল খায় নি। আপেলের সোয়াদ কেমন সে জানে না। আর, কেউ কোনদিন এভাবে জারিজুরি করে ওকে আপেল কেন, কোন কিছুই খাওয়ায় নি। গরিব মা প্রায় বিনে চিকিচ্ছেয় মারা যাবার পর সে পরের দয়ায় মানুষ। পরের ঘরে অবহেলার দানাপানি খেয়ে সে বড় হয়ে উঠেছে। কেউ এভাবে তাকে খাওয়ায় নি, খেতেও দেয় নি। চোখে জল আসছিল ওর। খেতে কষ্ট হচ্ছিল কেমন।

বুধিয়া আপেলটা খেল। সারাক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে। বংশী ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়। বুকের ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত কেমন ভিজে ওঠে ওর।

: কাঁদছিস ক্যানে ? আমাকে ত ইবার চলে যেতে হবেন, বাপ। তুই ইভাবে কাঁদলি আমি যাই কি করে, বল ত ? ঘরে গিয়ে বলব উদের—

বুধিয়া আজ বংশীর হাতটা জোর করে চেপে ধরে থাকে। কিছুতেই সে আজ ছাড়বে না বংশীকে।

: ছাড়, বাপ। আজ্জ যাই—

: বড় কষ্ট হয়েন—

: কি কষ্ট হচ্ছেন তোর, বল্।

: কেউ আসিস না তোরা।

: ই ত ইলাম।

: অনেকদিন বাদে বাদে আসিস। বড় একা লাগেন।

: পিরথিবিতে একাই ত এসেছিস রে, বাপ। কেউ যে নেই তোর—

বুধিয়ার ভেতরে যেন আর একটা বুধিয়া ছিল। সে আজ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো হাউ হাউ করে। সঙ্গে সঙ্গে কাশির একটা দমক এসে পড়লো গলায়। কান্না চাপতে গিয়ে কাশির দমকটা আরো বেড়ে যায়। সে জোরে জোরে কাশতে থাকে। তার কাশির আওয়াজ শুনে নার্সটা কোথা থেকে ভয় পেয়ে ছুটে আসে। মুখের সামনে শাদা একটা থুথু-ফেলার বাটি ধরে। কাশির বেগে বেশ খানিকটা রক্ত ওতে এসে পড়ে। বুধিয়া এবার ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে যায় বংশীও। রক্তটা বেরিয়ে যাবার পর কাশির দমকটাও কমে যায়। নার্স তোয়ালে দিয়ে ওর মুখটা মুছিয়ে দেয়। বালিশের ওপর ধুপ্ করে শুয়ে পড়ে ও। চোখ বন্ধ। হাত বাড়িয়ে বংশীর হাতটা খোঁজে। বংশী হাতটা এগিয়ে দিতেই সে দুহাতে ওর হাতখানা আঁকড়ে ধরে।

: জানিস, বংশীকাকা, আমি আর বেশিদিন বাঁচব নি। কিন্তুক আমার যে মরলে চলবেন নি। কারণ আমি বহুৎ চাষীকে কথা দিয়েছি, উদের জমিন উদের হাতে এনে দিব। আমার ইখোনো বহুৎ কাম বাকি। ওরা যে আমার জন্যে পথ চেয়ে থাকবেন, কাকা। উদের জন্যে আমাকে অন্তত আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতি হবেন।

•

জোর চাষের কাজ চলেছে জলশিয়রের মাঠে। পুরো কপালিপাড়াই এখন চাষের কাজে নেমে পড়েছে। কারো দম ফেলার সময় নেই। বংশী এখন বড়ো একা। কুইলিকে তার ভাইদের জমিনে খাটতে হয় সারাদিন। শ্যামা বিজলি সিমলি খাটে তার পাশাপাশি। ওদের জমিন বেশি। চাষের জন্যে মনিষ্যির দরকারও বেশি। বংশীর জমিন বেশি নয়। মাত্র পাঁচ বিঘে। তারও খানিকটা আবার বালির ঢিবি। তবু চাষ করতে বাড়তি লোকের সাহায্যের দরকার। একার দ্বারা সব কাজ হয় না। অন্তত কথা বলার জন্যেও তো একজন মনিষি দরকার। বংশীর আর কে আছে? এখন বাতাসীর কথা খুব মনে পড়ছে বংশীর। ও-সনে বাতাসী তার পাশাপাশি তার জমিনে কম গতর ঢালে নি। বীজতলা থেকে ঘাস তুলে ফেলে দেওয়া, চারাগাছ তোলা, রোপন করা—এসব খুব কঠিন কাজ না হলেও খুব শ্রমসাধ্য কাজ, কঠিন ধৈর্যের কাজ। এ কাজগুলো বাতাসী খুব ধৈর্য দিয়ে করতো। একা বংশীর পক্ষে হালচাষ আর রোপন—দুদিকে সামাল দিয়ে উঠতে অসুবিধে

হচ্ছে। সময় বেশি লাগছে কাজ শেষ হতে। তার মনটা পড়ে আছে বুধিয়ার কাছে সদর হাসপাতালে। সেদিন বুধিয়া খুব কেঁদেছিল, ওকে ছাড়তেই চাইছিল না। সে কথা দিয়ে এসেছে, যত শিগগির পারে, সে আবার দেখতে যাবে ওকে। কিন্তু জমিনের কাজ ওকে পিছু টেনে রেখেছে। যাবার জন্যে মনটা আকুলিবিকুলি করলেও সে যেতে পারছে না। এ সনে আবার চাঁপাবনির কপালিরা কেউ জলশিয়রে জনমজুর খাটতে আসছে না—জটার জন্যে। কৈবর্তপাড়ার দু'একজন আসে। তাদের কেউ মধুয়ার জমিনে খাটছে, কাউকে বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়েছে জটা। বংশী ওদের বলেছিল কয়েকদিন ওর জমিনে কাজ করে দিতে। ওরা হাতের কাজ শেষ করে কয়েকদিন খেটে দেবে বলেছে। কবে ওদের হাতের কাজ শেষ হবে, কে জানে। অতদিন বসে থাকলে বংশীর জমিনে চাষ কোনদিনই শেষ হবে না।

কুইলি সারাদিন ভাইদের জমিনে খেটে সন্ধ্যের সময় আসে বংশীর ঘরে। ডোবার জলে গা ধুয়ে চুলো ধরিয়ে রান্না চাপায়। ওই শুধু ভাতে ভাতই। মাছধরার সময় কোথায়? তবু গা ধুতে গিয়ে এক-আধটা কিছু ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃষ্টিতে জল বেড়ে যাওয়ায় হাতে মাছ ওঠে না। খাপলা জালে দু'একটা যদিও-বা ওঠে, ওগুলো এত ছোট, পাতে দেবার মতো নয়। তবু তাই দিতে হয়। তাছাড়া, একমাত্র ভরসা তরিতরকারির ক্ষেত। ওই সব দিয়ে যা-হোক একটু কিছু রেঁধে বেড়ে দিয়ে কুইলি চলে যায়। বংশী তার আদ্ধেকটার খানিকটা সকালে খায়, খানিকটা ক্ষেতে নিয়ে যায় দুপুরের জন্যে। এভাবে চলে না। চললেও তাকে চলা বলে না। বড়ো কষ্ট হচ্ছে বংশীর। তার এই কথা বাতাসী জানলো না। জানলো না, গত দশ সন তার কিভাবে বিদেশ-বিভুঁয়ে দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে।

সে ইচ্ছে করলে বিন্দিয়ার সঙ্গে কলকাতায় বা টাটানগরে চলে গিয়ে একটা নতুন জীবন শুরু করতে পারতো। কিন্তু তাও সে পারে নি। বাতাসীর জন্যেই। বাতাসী ওকে বিন্দিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তার জমিনের চার চৌহদ্দির মাঝখানে এমনভাবে থিতু করে দিয়েছে যে, কোথাও যাবার—একটু নড়বারও ফুরসত রাখে নি।

: বড় মজার খেল্ খেললি তুই, বাতাসী। আমাকে জলশিয়রের মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুই ছিটকে সরে গেলি এক নিখোঁজ দুনিয়ার ভিড়ের মধ্যে। উখানকার আসমান ভেন্ন আসমান, জলশিয়রের আসমান লয়। উখানকার বাতাস জলশিয়রের বাতাস লয়। জলশিয়রের কুনো চোখ তোকে খুঁজে পায় না। জলশিয়রের মাটির গন্ধ তোকে ছুঁয়ে আসতি লারেন। আজ মনের সুখে পরাণের ঘর করছিস তুই। আর আমাকে বাকি জীবনটা এমনি ইকলা-পাকলা কাটাতি হবেন। বড় মজার খেল্ খেললি তুই, বাতাসী। না বিন্দিয়ার সঙ্গে ঘর বাঁধলাম, না কুইলির সঙ্গে।

তোর সাথেও ঘর বাঁধতে দিলি নি। বাঁধা ঘর ভেঙে দিয়ে চলে গেলি পরাণের সঙ্গে। ই বড় মজার খেল্ তোর।

জটার জমিনগুলোর আলবাঁধগুলো বেশ উঁচু। জটার হাতে এখন খুব পয়সা। কায়দা-কসরৎ করে অনেকের জমিন সে কব্জা করে নিয়েছে। গাঁ-বুড়ো হয়ে তেভাগা আন্দোলনের নামে ও কতকগুলো সহজ মওকা পেয়ে যায়। জীবনে মওকা একবারই আসে। যে তার সুযোগ নিয়ে আখের গুছিয়ে নিতে পারে, সে সবই পারে। একদিন সে দিনের সূর্য-ওঠা সূর্য-ডোবা দেখার জন্যে একদিকে তালবাঁধের শেষ প্রান্তে, অন্যদিকে পশ্চিম মাঠের রাস্তার সুদূর কোণে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে থাকতো প্রার্থনার ভঙ্গিতে। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে আসতো যেত যখন, সে কোনদিকে তাকাতো না, কথাও বলতো না কারো সঙ্গে। ওর সেই চালচলনে ওকে সবাই কেমন একটু সমীহ করতো, সঙ্গে সঙ্গে টিট্‌কিরি দিতেও ছাড়তো না একটু-আধটু। ওরা কি করে জানতে পেরেছিল, সমস্তই ওর ভণ্ডামি? মধুয়া তা বুঝতে না পেরে ওকে গাঁ-বুড়োর দায়িত্ব দিয়ে দেয়। তখন তেভাগা আন্দোলনের ছোঁয়া লেগে অঞ্চলটার আবহাওয়া ছিল সরগরম। জটা তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। ওই মওকায় বেশ পয়সা আর সম্পত্তি করে নিয়েছে সে। শুধু কোঠাঘরই বানায় নি, জমিনগুলোর চৌহদ্দির বাঁধগুলোও বেশ উঁচু করে নিয়েছে।

চাষের সময় কপালিদের পিঠের শিরদাঁড়া যখন টনটন করে, তখন ওরা জটার জমিনের আলবাঁধের ওপর দু'দণ্ড বসে জিরিয়ে নেয়, বিড়ি ফোঁকে, গালগল্প করে।

আজ কপালিরা জটার আলবাঁধের ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বংশীকেও গলা ছেড়ে ডাকে। বংশী গেল না। ওর চাষের কাম অনেক বাকি।

আবার মেঘ গজরায় গরগর ক্রোধে। এই দু'দিন আগে বৃষ্টি একটু থেমেছিল। তার আগে পুরো এক হপ্তা বৃষ্টি। মাথায় পিঠে পাখিয়া চাপিয়ে সে হাল চষেছে, বীজতলায় চারা তুলেছে, রোপন করেছে। তারপর রোদ উঠলো চড়চড়িয়ে। আজ আবার সকাল থেকে আকাশে মেঘের কানাঘুষো চলছিল। এখন গুড়গুড় করে উঠলো হঠাৎ। কি আছে আকাশের মনে, কে জানে? দু'দিন ঠাঠা রোদ্দুরের পর মেঘের ছায়ার নিচে একটু আরামে কাম করা যাচ্ছিল। হাওয়া ছিল না যদিও। গুমোট। তবু চাষীদের কাম করতে কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু আবার যদি আসমান বর্ষায়, তা'লে চাষীরা ভিজবে, হালবলদ ভিজবে, কামে ঢিলে পড়বে।

জটার এসব ভাবনা নেই। সে নিজে কাম করে না। জনমজুর দিয়ে কাম করায়। হালবলদ দু'জোড়া। কৈবর্তপাড়ার কৈবর্তদের দিয়ে এসনে কাম করাচ্ছে সে। জনমজুরদের কামে লাগিয়ে দিয়ে সে চন্দনপুরে চলে যায়। ওখানে জনকয়েক ইয়ারদোস্ত আছে তার। ওদের সঙ্গে মজা করে। সবাই বলাবলি করছিল, ও নাকি সামনের পঞ্চায়েতের ভোটে দাঁড়াবে কপালিপাড়ায়। শোনা যাচ্ছে, খোকন বক্সির

বাড়িও সে যাচ্ছে আজকাল। কী মতলবে, কে জানে? বদ্‌বুদ্ধি সব সময় ওর মাথায় কিলবিল করে।

বংশীর মনে মনে রাগ হয় বড়ো। মধুয়াটা আসছে না কেন? জটাকে কেবল সে-ই জব্দ করতে পারে। আর কিছুটা পারে কুইলি। কিন্তুক উ হলেন গিয়ে মেয়েছেল্যে, দশহাত কাপড় পরলিও মেয়েছেল্যে নেংটা। উ কথা সোব্‌বাই বলেন। কুইলিকে দিয়ে ঠিক হবেন নি। ইখোন মধুয়াকে চাই। মধুয়া পঞ্চায়েতের ভোটের কাম কুথায় করছেন? জানতে পারলি উকে ধরে আনা যেতেন। উ ইমোন কঠিন কাম লয়।

কাদারাস্তায় সাইকেল চলে না। তাই জটাকে হেঁটেই যেতে হয় চন্ননপুরে। যে যেমন, তার বন্ধুও জোটে তেমনি। জটার বন্ধুগুলো সকাল হলেই চন্ননপুরের হাটের ওপর সাইকেল নিয়ে কেবল ঘোরাঘুরি করে। সরল চাষীদের টাকাকড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করাবার জন্যে নানান্ ফন্দি আঁটে। আজ সকালেও ওরা খুব ঘোরাঘুরি করছিল। জটা ওদিকে গেল না। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে দ্রুত পায়ে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগলো। খোকন বক্‌সির বাড়িটা ওই দিকেই। কপালিপাড়ার রাস্তা দিয়ে জটা যখন চলে, সে কোনদিকেই তাকায় না। কিন্তু খোকন বক্‌সির বাড়ির রাস্তায় যখন যায়, তখন সে এদিক-ওদিক তাকায়। কারণ, এ-অঞ্চলে খোকন বক্‌সি নামটার খুব সুনাম নেই। সবাই জানে, খোকন বক্‌সির পেটটা যেমন মোটা, তারক্ষিদেও তেমনি বড়ো বেশি। কৈবর্তপাড়ার অনেককে উৎখাত করে ওখানে সে বিরাট একটা ইঁটের ভাটি করেছে। কপালিপাড়ার তালবাঁধে করেছে লাখ-লাখ টাকার মাছের চাষ। চন্নপুরের হাটের ধারে-ধারে পাকা দোকান ঘর তৈরি করে বহু টাকা মুনাফা লুটছে। খোকন বক্‌সি ইতিমধ্যে দু'দুবার ভোটে দাঁড়িয়েছিল। হেরেছে। তবু আবার দাঁড়াবে ঠিক করেছে। জটাও আগামী পঞ্চায়েতে দাঁড়াবে। সে বোধহয় খোকন বক্‌সির সঙ্গে একটা 'লাইন' করতে চায়। খোকন বক্‌সির মতো জটাকেও চেনা দায়।

খোকন বক্‌সির বাড়ির পেল্লাই দরজা পার হতে পা কাঁপে। জটার অবশ্য কিছু হয় না। ওর এ দরজা পার হওয়ার অভ্যেস আছে। দরজার দু'ধারে উঁচু পাকা দেয়াল। দেয়ালের দু'ধারে দু'জন দারোয়ানের ঘর। একদিকের ঘরে থাকে জবর সিং। ওর ঘরের দরজা খোলা ছিল। ভেতরে জবর সিং তার বন্দুকটা খুব মনোযোগ দিয়ে সাফ করছিল। জটা বন্দুক দেখলে ভয় পায়। বিশেষ করে কোন পাঞ্জাবীর হাতে বন্দুক দেখলে। সেদিন রাতের কথা সে ভোলে নি। জটার পায়ের শব্দে জবর সিং ঘাড় তুলে একবার তাকালো।

: কাঁহা যারে গা?

জবর সিংয়ের গলায় রসকষ একটুও নেই। যেন খোকন বক্‌সির ইটের লরির ইঞ্জিন।

জটা ভয়ে ভয়ে বলে : বাবু আছেন ? খোকনবাবু ?

: হ্যায়। লেকিন কাহে ?

: কথা আছেন।

: কি কথা রে ? ফের সাদি-আথি করেগা তুম ?

: নানা। সাদি করা খুব খারাবি কাম। উ করলি ইয়ে হয়।

জটা হন্‌হনিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়ায়। বিশাল পাঁচিল-বন্দী পাকা উঠোন। খোকন বক্‌সিরই উপযুক্ত। একদিকে চওড়া দালান, এমোড়-ওমোড় লম্বা। মাঝখানে একটা বিশাল চেয়ার পাতা। চেয়ারে খোকন বক্‌সি ছিল না। সম্ভবত ঘরের ভেতরে আছে। জটা উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকে : বাবু, খোকনবাবু—

জটা পাকা থামের গায়ে পিঠ রেখে মেঝের ওপর বসে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে খোকন বক্‌সি বাড়ির বাইরে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসে।

: কে রে ? জটা ?

: আজ্ঞা।

: আয়। আমি তোর কথাই ভাবছিলাম রে।

: হুজুরের দয়া।

খোকন বক্‌সি চেয়ারে বেশ জুত করে বসলো। জটা সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। মনিব বসতে না বললে সে বসে কি করে ?

: জানিস জটা, কদিন হলো, একটা চিন্তা আমার মাথায় খচ্‌খচ্ করে কাঁটার মতো বিঁধছে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বস্—

জটা খোকন বক্‌সির পায়ের কাছে প্রথমে উবু হয়ে পরে আসন পিঁড়ি করে বসলো।

: দ্যাখ্ জটা, কপালিপাড়ায় আমি একটা মাত্র মানুষ দেখলাম। সে হচ্ছে, কে বল্ তো ?

জটা কার নাম বলবে ভেবে পেল না। মধুয়া, বংশী, ঘনু—এমনি সাত-সতেরো ভেবে কিছু না পেয়ে ঘাড় উঁচিয়ে খোকনের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

: পারলি না তো ? পারবি কি করে ? পারলে তুই-ই খোকন বক্‌সি হয়ে যেতিস।

: আপনি তুই কি যে বল্‌ছিস, হুজুর !

: সে হচ্ছে জটা কপালি।

: উ মনিবের ইচ্ছা—

জটা গদগদভাবে নতমুখে শুধু মাথা নাড়তে থাকে।

: তোর মধ্যে এমন একটা গুণ আছে, যেটা কপালিপাড়ার অন্য কারো মধ্যে নেই।

জটার মাথা হাওয়ার কচুপাতার মতো নড়তে থাকে।

: তুই আমাকে ভালোবাসিস, আমিও তোকে ভালোবাসি। তুই আমাকে বিশ্বাস করিস, আমিও তোকে বিশ্বাস করি। আমি তোকে আজ যে কথা বলবো, কাউকে বলতে পারবি না কিন্তু। কাউকে না।

জটা দু'হাতে নাক-কান ছুঁয়ে জিব কাটলো।

এমন সময় পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কাদা নিয়ে খোকন বক্‌সির নায়েব হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে এলো। ওর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কাছে এসে চুপি চুপি বলে। কাজ হয়ে গেছে।

: সব ঠিকমতো হয়েছে তো?

: একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন।

এত আস্তে কথা বলছো কেন? জোরে বলতে পারো না। নাকি? ও, জটার কাছে? জটার কাছে জোরে বলতে পারো। ও আমার আপনার লোক।

নায়েব জোরে বলে : পুরো ভেড়িটা এখন আমাদের দখলে। একেবারে সমুদ্দুরের কোলের চর পর্যন্ত। চিংড়ি মাছের চাষ যা হবে, না! আমি পাহারাওলা বসিয়ে দিয়ে এসেছি। বিশ্বাস নেই জেলেপাড়ার জেলেদের।

জবর সিং সমস্ত শোনার জন্যে বেরিয়ে আসে।

খোকন বক্‌সি ওকে দেখে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে : জেলে পাড়ার ভেড়ি দখল নিতে হবে— জেনেশুনেও তুই তো আজ সকাল থেকে বন্দুক খুলে বসে আছিস্। কি, না—সাফ করতে হবে। শিকারের সময় কুকুরের হাগা। বলি, তোকে রেখে আমার লাভটা কি হচ্ছে, বলতে পারিস?

জবর সিং একবার খোকন বক্‌সির মুখের দিকে, একবার জটার বসার ভঙ্গির দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেয়।

: শোন্, তোর বন্দুক ছাড়াই আমরা জেলে পাড়ার ভেড়ির দখল নিতে পেরেছি। এবার জলশিয়র। ওখানে এবার বন্দুক চালাতে হবে। কি রে জটা, ভয় পাচ্ছিস নাকি? তোর কোন ভয় নেই। আমি এবার কপালিপাড়ার কপালিদের উচিতমতো শিক্ষা দেবো। জটা, তোর ভয়ের কিচ্ছু নেই।

জটা দু'হাতে খোকনের চটিসুদ্ধু পা-জোড়া চেপে ধরে।

: মনিব, আপনি তুই উদের ইকটা উচিত মতন শিক্ষা দে। আমাকে উরা কুকুরের থেকে কম হেনস্থা করেন নি। আমার কল্‌জেটা জ্বলে পুড়ে ছাইপাঁশ হয়ে যাচ্ছেন।

: ভয় নেই। হবে। সব হবে। তুই ঠিক থাকিস। আগে তোকে যে করেই হোক, একটা কাজ করে ফেলতে হবে।

: হুকুম কর, মনিব—

: তোর জমির আলবাঁধগুলো শিগ্‌গির উঁচু করে ফ্যাল্।

উৎসাহে, উত্তেজনায় জটা আবার দু'হাতে খোকনের পা-জোড়া চেপে ধরে।

হেসে বলে : মনিব, উ আর আপনি বলবি কি? আগে থিকে উ কামটা আমি সেরে রেখে দিয়েছি।

: কতটা উঁচু?

: উ বেশ উঁচু। যতটা হলি হয়। তোকে বলি বাবু, যেদিন আমি পরথম শুনেছি, আপনি তুই বললি, উখানে নুনের কারখানা করবি, তখনই আমি সম্‌ঝে লয়েছি, আমার জমিনের আলবাঁধগুলো বেশ করে উঁচু করা পেয়োজন।

খোকন বক্‌সি ওর মাথাটা বাঁ-হাতে চাপড়ে দেয়।

: সাবাস জটা! তোর বাপ-মা তোর জটা নাম রেখেছিল কেন, এখন বেশ ভালো করে আমি বুঝতে পারছি। তাহলে বল্ জলশিয়রে আমার সল্ট ফ্যাক্টরি—নুনের কারখানাটা হবে কিনা।

জটা খুব আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলে : হবেন। আলবাৎ হবেন।

খোকন নায়েবের দিকে তাকায়। খুব আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টি।

: তাহলে যা করবার, এই মাসেই করে ফেলতে হবে।

জবর সিং এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। এবার সে বলে : এ মাহিনামে ত আট-দশ রোজ বাকি। আগের মাহিনামে হোনেসে—

জবর সিংয়ের কথাটা খোকনের বিশেষ পছন্দ হয় নি। ডাকে : নায়েব!

নায়েব বলে : জবর যখন বলছে, সামনের মাসেই হোক, বাবু।

জবর সিং বলে : হামারা বন্দুক ভি তখন ঠিক হো যায়েগা।

: ঠিক আছে। তাই হবে।

খোকন জটার দিকে ঘুরে বসে। নায়েব আর জবর সিং যে যার কাজে চলে যায়। জটা খোকনের মুখের দিকে তাকায়। ভালো করে তাকায়। সে কোনদিন খোকন বক্‌সির এমন খুশিভরা মুখ দেখে নি। আহা! খোকনবাবুর মুখের হাসিটা যেন আজ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ। দেখলে চোখ দু'টো যেন ভরে যায়েন।

: হ্যাঁ রে জটা, কিছু খাবি?

বড়ো বিগলিত হাসি হাসলো জটা।

: না মনিব, আজ লয়। উ পরে হবেন।

: পরে কেন? আজই হবে। ভাগলপুরী গাইয়ের দুধ কখনো খেয়েছিস?

: আজ্ঞা মনিব, উ আমি পাব কুথায়?

: আজ তুই আমার ভাগলপুরী গাইয়ের দুধ একটু খেয়ে যা—

খোকন গলা ছেড়ে ডাক দেয়। বাড়ির ভেতর থেকে একটা বুড়ো চাকর ছুটে আসে। খোকন ভাগলপুরী গাইয়ের এক গেলাস দুধ নিয়ে আসতে হুকুম করে। বিনা বাক্যে বুড়ো চাকর অন্দর মহলের দিকে ছুটে যায়।

খোকন আদরভরা খুব আপ্লুত গলায় ডাকে : জটা—

: আজ্ঞা, মনিব—

: তোর খুব দুঃখ, না?

জটা মাথা নিচু করে বলে : মনিবের, আজ্ঞা, সোব্‌ই জানা আছেন।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো জটার।

: হুজুর, বড় দুঃখ ইকটা মনে থেকে গেছেন।

: জানি। মুখের খাবার ফস্‌কে যাবার যে দুঃখ কী, তা আমি জানি রে, জটা।

জটা মুখ নীচু করে বসে থাকে। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। চাকর দুধের গেলাস নিয় এলো। খোকন জটাকে ডেকে বলে : নে, খা—

জটা মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে এনে গেলাসটা ধরে নেয়। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে দুধের গেলাসটার দিকে।

খোকন জিজ্ঞেস করে : চাঁপাবনির কার বউ যেন?

: পাঁচু কপালির আজ্ঞা।

দুধের গেলাসটার দিকে অপলক চেয়ে থাকে জটা।

: উকে আমি শেতলার থানে লিয়ে গিয়ে 'বে' করেছিলাম। উ আমার বউ হয়েছিলেন কি না, তুই বল্‌, হুজুর?

: ও আবার তোর বউ হবে। নে খা—

জটা গেলাসে চুমুক দেয়। নিজের অজান্তে মুখ ফস্‌কে একটা লালচভরা আওয়াজ বেরিয়ে যায় : আহ্‌—

: কেমন মাল?

: ভাল।

: শুধু ভালো?

: খুব ভালে!

ঠিক তখনই জবর সিংয়ের বন্দুকের একটা শব্দ হলো। আচম্‌কা জোর শব্দ। শুনে জটার হাতের গেলাস থেকে খানিকটা দুধ ছলকে পড়ে।

: কিসের আওয়াজ হলেন, হুজুর?

খোকন চিৎকার করে ওঠে : এ্যাই জবর সিং।

জবর সিং বেরিয়ে আসে। হাতে বন্দুক।

: কি হলো?

: কুছ্‌ হুয়া নেহি, হুজুর। আচম্‌কা এক গোলি ছুট্‌ গিয়া।

জলশিয়রের চাষের কাজ শেষ। শেষের ক'দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল। খুব জোরে নয়। ঝিরঝিরে। চাষের পক্ষে খুব ভালো। আজ আবার আকাশে ঝলমলে রোদ উঠেছে। মাঠে হলুদে-সবুজে মেশামেশি একটা মিহিন রং খেলেছে বেশ। আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে নীল। এখানে-ওখানে দলছুট্‌ মেঘ ভাসছে দু'এক টুকরো। সব মিলিয়ে চারদিকে কেমন একটা ঢিলেঢালা মেজাজ। জলশিয়রের

কপালিপাড়ার আর যেন কোন কাজে আঁট নেই। পুরো একমাস দেড়মাস মাঠের জমিনেই কেটেছে। এখন আকাশের বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের টুকরোগুলোর মতো কপালিদের আর কোন কাজ নেই। ঘরের পুঁজি যা ছিল, চাষের কাজে সমস্ত ফুরিয়ে গেছে। দলছুট্ মেঘের টুকরোগুলোর মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়: কুথাও কুনো কাম-টাম আছেন গ?

বংশী সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলো, আজও ভোরে কুইলি আসে নি। সিমলিও না। কি হলেন, কে জানেন? উদেরও ত চাষকাম ফুরিয়ে গেছেন। তারপর সে চোখ রাখলো আকাশে। সকালের নির্মল নীল আকাশ। তখনও পুবের আকাশের ধারে দিগন্তের মাথায় লালের ছোপ লেগে আছে। মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। বুধিয়ার কথা মনে পড়ে। তার বুধিয়া হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। সে আজ ওকে দেখতে যাবে। কাল রাতেই ঠিক করে রেখেছে। দক্ষিণের দাওয়ায় বুধিয়ার সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জং ধরেছে ওর গায়ে।

বংশী বুধিয়াকে আজ দেখতে যাবে।

কুইলি আজ আসে নি। বুড়োবটতলায়ও ওকে দেখা গেল না। কপালিপাড়ার রাস্তাটা বাঁক খেয়ে যেখানে চন্ননপুরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, সেখান থেকে পরাণের ঘরটা দেখা যায়। কেউ থাকে না। কিন্তু বর্ষার সময় এক-আধবার ওর দাওয়ায় কপালিপাড়ার মিটিন হয়। এ বছর আর হয় নি। কিন্তু আজ এই সাত সকালে ওর দাওয়ায় মনিষ্যির ভিড় কেন? কী হলেন আবার!

জনমনিষ্যির জটলা। হাওয়ায় ভেসে আসছে কথার টুকরো-টাক্‌রা। ওদিকে মন দেবার এখন সময় নেই বংশীর। সে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাঁক ঘুরে চলতে থাকে। রাস্তার কাদা পুরোটা শুকোয় নি। দুধারে বৃষ্টির জলে আকন্দের ঝাড় তেড়েফুঁড়ে বেড়ে উঠেছে। গোছা-গোছা ফুলে ভোমরাদের জটলা। কৈবর্তপাড়ায় খোকন বক্‌সিব ইটখোলায় বর্ষাকালে কাজ বন্ধ থাকে। শীত পড়তে-না-পড়তেই আবার কাজ আরম্ভ হবে। চিমনিগুলো কালো-কালো ধোঁয়া দিনরাত ওগ্‌রোতে থাকবে।

চন্দনপুরের বাস-স্ট্যাণ্ডে দনুপালের ছেলের চায়ের দোকানে চা খাওয়ার সময় হলো না বংশীর। গজরাতে গজরাতে বাস এসে পড়লো একটা। তেমন ভিড় ছিল না। ভেতরে যাওয়া গেল। বসারও একটু জায়গা পাওয়া গেল।

মাসখানেক আগে বংশী বুধিয়াকে শেষ দেখে এসেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, অনেক দিন হয়ে গিছে। এর মধ্যে মন খুব টানলেও সে যেতে পারে নি। কেউ নেই যে, ওর একটা খবর এনে দেবে। মধুয়া এখনো নিপাত্তা। বুধিয়া বলেছিল, সে নাকি একবার ওকে দেখে গেছে। এর মধ্যে সে হয়তো আবার দেখে গিয়েছে, কিন্তু বংশী কোন খবর পায় নি।

সদরে বাজারের সামনেই বাস-স্ট্যান্ড। ওখান থেকে হাসপাতাল কিছুক্ষণের হাঁটাপথ। রাস্তায় একটা ছোটখাটো ফলের দোকান। কি ভেবে বংশী দাঁড়িয়ে যায়। কোমরের গেঁজে থেকে পয়সা বের করে। দুটো আপেল আর একটা কমলা হয়ে যায় ওতে। তারপর সে তার ভারী-ভারী বড়-বড় পা ফেলে অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যায় হাসপাতালের গেটে। এদিক ওদিক তাকায়। কেউ কোথাও নেই। টুপ করে ঢুকে পড়ে সে। এক-পা এক-পা করে এগোয়। ভয়ে ভয়ে। খানিকটা যেতেই তার চোখে পড়ে খাকি হাফ-প্যান্ট-পরা একটা লোক টুলে বসে ঢুলছে। সে লোকটার চোখে পড়ে গেল।

: কোথায় যাবে ?

: আমার লোক আছেন ?

: রুগী ?

: হঁ।

: এখন দেখা হবে না। চারটের পর।

: উর খুব বেমার।

: চারটের আগে হবে না। এখন গেটের বাইরে তিন ঘণ্টা—

: উ ত অনেক সময়। ইকটু দেখেই চলে যাব। আগের বার ডাক্তর দিদি দেখতে যেতে দিয়েছিলেন গ।

: হবে না, বলছি।

বংশী এক লহমার জন্যে কী ভাবে। ওর জোরে নিশ্বাস পড়তে থাকে। কপাল আর গলার দু'পাশের শিরাগুলো পাক খেয়ে ফুলে ফুলে ওঠে।

: দ্যাখ, আমার ঠাকুর বাপ দুখী কপালি ডাকাত ঠেঙিয়েছিলেন, আমার বাপ মেঘু কপালির গলায় মেঘ ডাকতেন। আমি উই জলশিয়রের কপালিপাড়ার বংশী কপালি। আমার ছেল্যে জলশিয়রের বুধন কপালি তামাম দুনিয়ার গরিব চাষীদের জমিন বিলি করেন। উ ইখানে উই ঘরের বিছানায় শুয়ে মুখে রক্ত তুলছেন। উকে আমি দেখব। ই ফলগুলান উকে খাওয়াব। ডাক্তর দিদি বলছেন—

বংশীর গলার আওয়াজে লোকটা দু'পা পিছিয়ে যায়। আগেকার সেই নার্সটা পাশের ঘরে দরজা দিয়ে দুপুরের ঘুমটা সেরে নিচ্ছিল। তার ঘুম ছুটে যায়। হুড়মুড়িয়ে দোর খুলে বেরিয়ে আসে।

: এখানে হল্লা করছো কেন ? কি হয়েছে ?

লোকটা কী বলতে যাচ্ছিল। বংশীকে দেখে নার্সটি চিনতে পেরেছে দেখে সে চুপ করে যায়।

: ডাক্তার দিদি!

: কি বলছো তুমি ?

: আমি বংশী কপালি। আমি বুধিয়াকে একটু দেখে চলে যাব। ই ফলগুলান উকে খাওয়াব। উ আমাকে যেতে দিচ্ছেন নি।

: কার কথা বলছো ?

: বুধিয়া—

: বুধন কপালি ?

: হুঁ।

: ও ত নেই।

: নেই ? কুথায় গেছেন ?

নার্সটি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কয়েক পলক।

: ও ত মারা গেছে—

নিমেষের মধ্যে বাইরের আকাশ, সামনের রাস্তা, হাসপাতাল, সমস্ত পৃথিবী, অন্ধকারে ঢেকে গেল। নার্সটা, লোকটা, ঘর, ঘরের দরজা সব অন্ধকার।

: বুধিয়া নেই ?

ভীষণ গর্জনের আক্রোশে যেন মেঘ ডেকে উঠলো। আবার বংশীর কপাল আর গলার দুপাশের শিরাগুলো মোচড় খেয়ে ফুলে উঠলো। মেঘের ডাকের মতন একটা কান্না গলা ছিঁড়ে আর্তনাদের মতো বেরিয়ে আসছিল। বংশী দু'চোয়াল চেপে কান্নাটাকে বেরোতে দেয় না। জোরে একটা ঢোঁক গিলে সে বলে : বুধিয়া নেই। নাহ্, ই কথা আমি মানব নি। বুধিয়া আছেন। তোরা ঝুট্ বলছিস।

নার্সটি এগিয়ে গিয়ে বুধিয়া যে ঘরে ছিল, তার দরজা খুলে দেয়। শূন্য বিছানা। বুধিয়া নেই। এই বিছানায় শুয়ে বুধিয়া যে সেদিন তার হাত ধরে কেঁদেছিল। সে মরতে চায় নি। সে আরো কিছুদিন বাঁচতে চেয়েছিল। বলেছিল, এখনো তার অনেক কাজ বাকি। অনেক গরিব চাষীকে জমিন দেওয়ার কাম তার এখনো বাকি থেকে গেছে। ও না ফিরলে ওরা যে ওর পথ চেয়ে থাকবে। সেদিন চলে যাবার সময় বুধিয়া ওর হাতটা প্রাণপণে চেপে ধরেছিল। ছাড়তেই চাইছিল না। সে কি তবে জানতে পেরেছিল, সে আর বাঁচবে না ?

বংশী কখন হাঁটু মুড়ে ঠাণ্ডা মেঝেয় বসে পড়েছিল। বসে বুধিয়ার মাথার বালিশে মুখ গুঁজে দিয়েছিল। এই বালিশে হয়তো বুধিয়ার মাথার চুলের গন্ধ লেগে আছে। না জানি, কত চোখের জল লেগে আছে। বংশীর মোটা-মোটা পাঁজর গুলো ফুলে ফুলে উঠছিল।

বুধিয়া নেই। দুনিয়ার বুধিয়ারা বেশিদিন বাঁচেন না। উরা কাম শেষ করে যেতে পারেন। উদের কাম কুনোদিন শেষ হয়েন নি।

লালবর্ণ চোখ নিয়ে উঠে দাঁড়ায় বংশী। নার্সটি ওর পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

: সাতদিন আগেও যদি আসতে ভাই—

বংশী ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বুঝলো, পৃথিবীর সব আলো মুছে গেছে। চারদিকে কেমন ঝাপসা।

বুধিয়া, বাপ আমার! তোকে আমি হাসপাতালের এই ঘরে রেখে গেলাম রে!

ঘরটার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে বংশী চলতে লাগলো মেঝেয় লাথি মারতে মারতে। তুই এই ঘরে শুয়ে থাক বুকে তোর দরদ লিয়ে। কুনোদিন তুই মরবি নি। তোর দরদও কুনোদিন মরবেন নি। আমি মনে করব, তুই হাসপাতালে শুয়ে আছিস। একদিন লয় একদিন তুই সেরে ফিরে আসবি আমাদের জলশিয়রের কপালিপাড়ায়। জলভরা চোখে রঘু কপালির মেয়ে সিমলি বুড়োবটতলায় দাঁড়িয়ে চন্নপুরের রাস্তার দিকে চেয়ে থাকবেন। তোর জন্যে পথ চেয়ে, শুধু তোর জন্যে—

দাঁড়াও—

বংশী তাকালো। চোয়াল দুটো সে শক্ত করে চেপে রেখেছে।

একটা পুঁটলি ওর হাতে দিয়ে নার্সটা বলে: এটা নিয়ে যাও। এতে ওর একটা জামা আর একটা কাপড় আছে।

সমুদ্দুরের জলে বুধিয়ার জামা আর কাপড়টা ভাসিয়ে দেবার আগে সে পুঁটলিটা খুলে একবার ভালো করে দেখে নিল। ওতে বুধিয়ার গায়ের গন্ধ লেগে আছে। গন্ধটা শুঁকে সে ও দুটো বুকে চেপে ধরে নির্জন চরের বিশাল ব্যাপ্তিতে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তখনও বেলা আছে। বিষণ্ন রোদ্দুর। চারদিক কেমন বিষাদে ভরা। ঢেউ ভাঙার শব্দ— যেন কার কান্না বলে মনে হচ্ছে। বংশীর কানের পাশে রগদুটো টনটন করছিল। সে সমুদ্দুরের ঢেউতে বুধিয়ার জামা আর কাপড়টা ভাসিয়ে দেয়। ভেসে চলে যায়। বুধিয়ার সব স্মৃতি ওর চোখের সামনে ভেসে চলে যাচ্ছে। সে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সে দেখে, কাপড় আর জামাটা আবার ফিরে এসেছে চরের বালিতে। ওগুলো যেতে চায় না। ফিরে আসে। যেতে যেতে ফিরে আসে। যেন যাবার ইচ্ছা নেই। তাই বারে বারে ফিরে ফিরে আসে।

বংশীর মনে পড়লো, বুধিয়া মরতে চায় নি। সে বাঁচতেই চেয়েছিল। তার থাকবার মতো চালচুলো ছিল না, আপনার বলতে কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। ছিল বুকভরা রোগ। তাই নিয়ে সে রোদবৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে গরিব চাষীদের জন্যে খেটে মরেছে। কিছু পায় নি। তবু সে বাঁচতে চেয়েছে। হঠাৎ তার কেমন মনে হলো, বুধিয়া মরে নি, বুধিয়া মরতে পারে না। সে বেঁচে আছে। সে বেঁচে ফিরে আসবে।

বংশী ফিরে চলে। সামনে বালিয়াড়ি। পেছন ফিরে তাকায়। বুধিয়ার জামা-কাপড় ঢেউতে আবার ফিরে চলে যাচ্ছে।

বালিয়াড়ির ওপর পা টেনে টেনে উঠে এসে দাঁড়াতেই জলশিয়রের কপালিপাড়া ওর চোখের সামনে যেন টিটি করে ফেটে পড়লো। হলুদে-সবুজে মেশানো উজ্জ্বল ধানের ক্ষেত, তালবাঁধ, তালবাঁধের ওপর কপালিপাড়ার কপালিদের মতো কালো চেহারার ঝাঁকড়া তালগাছের সারি, তার ঘর, রঘু-মেঘুদের ঘর, জটার কোঠাঘর, ওদিকে পরাণের ঘরটাও—ওর চোখে এক সঙ্গে এত সব ভেসে উঠলো। ওখানে

সবাই বেঁচে আছে। ধানগাছের মতো, তালগাছের মতো বেঁচে আছে। ইকটা জ্যান্ত পিরথিবি উখানে হাসছেন , কাঁদছেন, বাঁচবার কথা ভাবছেন।

গামছায় বাঁধা ফলগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিল বংশী। দুটো আপেল, একটা কমলালেবু। গেঁজের পয়সা বের করে হাসপাতালের কাছের দোকানে সে কিনেছিল বুধিয়ার জন্যে। বুধিয়াকে সে ওগুলো খাওয়াতে পারে নি। সাতদিন আগে সে এই পিরথিবি থেকে চলে গেছে।

এই ফলগুলো আর রাখা কেন? ঘরেও বা সে ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

ভাবলো, ফিরে গিয়ে সমুদ্দুরের জলে ওগুলো সে ছুঁড়ে দিয়ে আসে। বুধিয়ার নাম করে। নাহ্ থাক্। কপালিপাড়ার কোন ছেলের হাতে দিয়ে দেবে সে। সে-ই ছেলেই হয়তো একদিন বুধিয়ার মতো বড়ো হবে। একটা-দুটো পাশ দেবে। বুধিয়ার মতো গরীব চাষীদের জন্যে কত কাম করবে।

তালবাঁধের রাস্তার ধারেও আকন্দ ফুল ফুটেছে। ভোমরা উড়ছে ফুলের থোকাগুলোকে ঘিরে। পরাণের ঘরটা ডানদিকে। দাওয়ায় কাপড় শুকোচ্ছে। বংশী ভারী ভারী পা ফেলে ঘরের দিকে এগোয়। বুড়ো বটতলায় কেউ ছিল না। শুধু বছর দু' একের একটা ন্যাংটো ছেলে মুখে আঙুল পুরে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। বংশী দাঁড়িয়ে পড়ে। ছেলেটাকে ইশারায় কাছে ডাকে। আশ্চর্য! ছেলেটা এতটুকু ভয় পেল না। একপা-একপা করে ওর দিকে এগিয়ে এলো। বংশী গামছা খুলে ফলগুলো বের করে ওর দু'হাতে দুটো আপেল ধরিয়ে দিল। ছোট্ট হাতে আপেল দুটো সামলাতে না পেরে সে তার ছোট্ট বুকে ও দুটো চেপে ধরে থাকে। বংশী চলে আসছিল। একটু দাঁড়ায়। নিচু হয়ে আপেল দুটোর ওপরে কমলালেবুটাও চাপিয়ে দেয়। চলে আসতে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। উবু হয়ে ওর সামনে বসে পড়ে। কাঁধের গামছাটা টান টান করে ওকে পরিয়ে দেয়। তারপর জোরে জোরে পা ফেলে চলতে থাকে। রাস্তার বাঁক ঘুরে ঘরের আগড়ের সামনে পৌঁছে সে ফিরে চেয়ে দ্যাখে, ছেলেটা ওর পেছনে পেছনে এতদূর একা একা ওর সঙ্গে চলে এসেছে।

: কাদের ঘরের ছেল্যে তুই? যাহ্—ঘরে যাহ্।

আগড় খুলে বাঁক ঘুরে সামনে আসতেই গোয়ালের ছাউনির নিচে দড়ি গলায় ঠায় দাঁড়িয়ে বলদ দুটো ওর দিকে তাকালো। তাকিয়েই রইলো। কাছে গিয়ে দেখলো, ওদের মুখে একগাছিও খড় নেই। সামনের গামলায় জলও নেই এক ফোঁটা। কুইলি কি এ বেলাও আসে নি?

বংশী ওদের মুখে খড় দিল। গামলায় জল দিল। ফোঁস ফোঁস করে বলদ দুটো আধ-গামলা করে জল সাবাড় করে দেয় এক নিমেষে। দাওয়ার দিকে আসতে গিয়ে বুধিয়ার সাইকেলটা চোখে পড়লো। দক্ষিণের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। কয়েক পলক সে সাইকেলটার দিকে চেয়ে থেকে দাওয়ায় এসে বসে। বসেই থাকে। দুনিয়ার ক্লান্তি তার শরীলে। কিছুই ভালো লাগছে না। বুধিয়া নেই। বুধিয়া চিরকালের মতো পিরথিবি থেকে চলে গেছে। সে আর কুইলি সেদিন ওকে ওর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে রেখে এসেছিল। সে আর কোনদিন কপালিপাড়ায় ফিরে আসবে না। কুইলি আর একবারও ওকে দেখতে যেতে পারে নি। বংশী গেছে। মধুয়াও নাকি একবার গিয়েছিল। ওরা কেউ বুধিয়াকে বাঁচাতে পারে নি। বংশী ভাবে, এখন সে কুইলিকে খবরটা দেবে কি করে। সিমলিকেই বা সে কি করে দেবে তার জীবনের এত বড় দুঃসংবাদ। তার চেয়ে ওরা ভুলে আছে ভুলে থাক। ওরা জানুক, বুধিয়া এখনো হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। সে এইভাবে ওদের মনে অনন্তকাল শুয়ে থাকুক। ও ওদের কিছু বলবে না।

: এ্যাই! উখানে কে রে?

একটা ছোট্ট মাথা। দেয়ালের কোণটাতে উঁকি মারছে। ভাল জ্বালা হলেন ত। পরের ছেল্যেরা এসে আমাকে মায়ার ফাঁদে ফেলছেন ক্যানে? এক তো বুধিয়া আমার বুকে দারুণ দাগা দিয়ে গিয়েছেন। দগ্‌দগে উই দাগা ইখোনো শুকান নি। ফের ইকটা ছেল্যে আমার দেওয়ালের কোণে ইখানে উঁকি মারছেন। যাহ্—যাহ্ ইখান থিকে—

আগড় খোলার আওয়াজ হলেন। কেউ আসছেন, মনে হয়েন। যাহ্—যাহ্ ইখোন ইখান থিকে—

: তুই ইখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস রে? তোর মা উদিকে তোকে খুঁজে মরছেন। যা—

কুইলি।

কুইলি ওর ছোট্ট মাথাটা হাতের তেলোয় পুরে জোর করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে ওকে আগড় খুলে রাস্তায় বের করে দিয়ে আসে। ঘরে আসবার আগে সে বলদ দুটোর চালার কাছে যায়। বলদ দুটোর মুখে খড়-জল দেওয়া হয়েছে। তারপর সে বংশীর সামনে দিয়ে আড়াআড়ি চলে যায় দরজার কাছে। শেকল খুলে ভেতরে যায়। ঘাটে যায়। জল আনে। চুলা ধরিয়ে ভাত বসায়। চুলা দেখে মনে হচ্ছে আজ বংশী ভাত রাঁধে নি। তাহলে সে আজ খেল কী? না কি, সে আজ কিছুই খায় নি। কুইলি তরকারির ক্ষেতে গেল। আঁচলের কোণে নিয়ে এলো গোটা-কয় বেগুন-ঝিঙে-ঢেঁড়স।

ভাদ্দর মাসের সন্ধ্যা নামতে না-নামতেই বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। পৃথিবীর ওপর ঝুপ করে রাত গড়িয়ে পড়ে। উঠোনে অন্ধকার নামছে। বংশী পায়ের ধুলো কাদাও ধোয় নি। তেমনি বসে আছে। কুইলি ভাতের পর তরকারি রাঁধছে। কড়ায় খুন্তি নাড়ার শব্দ হচ্ছে। সে জানে না, বুধিয়া নেই। এই ক'মাসে বুধিয়া কি ওর মন থেকে মুছে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। নাকি, কুইলি জানে না, সে আজ সকালে

হাসপাতালে গিয়েছিল। জানবে কি করে? সে তো আজ সকাল থেকে এদিকে আসে নি। এই এলো। ভালোই হয়েছে, কুইলিকে সে বুধিয়ার কথা কিছু বলবে না।

বুধিয়ার কথা সে কাউকে বলবে না। মনে মনে ঠিক করে। কিন্তু সে কী করে বুধিয়ার কথা ভুলবে? বুধিয়া যে জটার হাত থেকে তার জমিন কেড়ে এনে তাকে দিয়ে গেল। সে জন্যে ভাগ বোর্ডের অফিসে, জগৎ সরদারের কাছে সে কত ছোটাছুটি করেছে। বিনিময়ে সে বুধিয়াকে কিছু দিতে পারে নি। বুধিয়া তাকে কিছু করবার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল। এত নিঃশব্দে চলে গেল যে, শেষবারের মতো সে তাকে দেখতে পেল না। সে বুধিয়াকে বড় ভালোবেসে ফেলেছিল। নিজের ছেলের মতো।

: বুধিয়া, তোকে আমি কোনদিন ভুলতে লারবো।

হঠাৎ মেঘের ডাকের মতো আর্তনাদে ফেটে পড়ে বংশী।

কুইলি ঘুরে দাঁড়ায়।

: কী হয়েছেন বুধিয়ার?

: নেই বুধিয়া নেই। চলে গেছেন। কাউকে কিছু না বলে—

বংশী ঘুরে বসে দেয়ালে মুখ চেপে রাখে। ওর মোটা-মোটা পাঁজরগুলোর নিচে একটা সমুদ্দুর ফুঁসতে থাকে।

: বুধিয়া! আমি ইখোনে কী বলব সিমলিটাকে—

কুইলি একটা খুঁটি ধরে দাওয়ার ধারে বসে পড়ে। মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে। অন্যদিকে। চোখের জলে ওর সমস্ত মুখ ভেসে যাচ্ছিল।

: উ যে সমস্ত দিন চন্নপুরের রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন গ—বুধিয়ার জন্যে—

অন্ধকারে বংশী ঘাটে যায়। পায়ের ধুলো কাদা ধোয়। চোখে, মুখে, ঘাড়ে, কপালের দুদিকের রগে বেশ করে জল দেয়। গলাটা আঠা-আঠা হয়ে আছে। বিস্বাদ। মুখে জল নিয়ে বার কয়েক কুলকুচি করলো। তারপর ফিরে এসে হাত মুখ মুছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দু'পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

শরীলটা একটু ঠাণ্ডা হলো। মনে এখন কোন কান্না নেই। কেমন উদাসীন লাগে সব কিছু। তার মনে হয়, সে যেন আজকের নয়। অনেক দিনের পুরনো। অনেক দিন সে এখানে এইভাবে বসে আছে। তার খিদে-তেষ্টা নেই। কোন কিছুর প্রতি তার কোন টান নেই। সমস্ত কপালিপাড়ার ছবি ফুটে উঠছে তার চোখের সামনে। এই কপালিপাড়ার কপালিরাও আজকের মানুষ নয়। বহুদিন ধরে এরা বাস করছে এখানে। এরা জন্মেছে, বড় হয়েছে, খেটেছে, ঝগড়া-মারামারি করেছে, আবার ভালোও বেসেছে। ভালোবেসে এরা ঘর বেঁধেছে, ঘর ভেঙেছে, ভাঙাঘরের মাটির ঢিবি সরিয়ে আবার নতুন করে ঘর বেঁধেছে। মেয়ো মনিষ্যি পুরুষ মনিষ্যি মিলে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। সন্তান বড় হয়েছে। এইভাবে নতুন

মনিষ্যি আসে। পুরনো মনিষ্যিরা চলে যায়। ওদের শরীল পুড়ে ছাই হয়। ছাই আর নাভিকুণ্ডলী সমুদ্দুরের জলে ভেসে যায়। তবু কপালিপাড়ার মনিষ্যিরা বেঁচে এসেছে তাদের মনের বিশ্বাস আর বুকের স্বপ্ন নিয়ে। তালবাঁধের কালো চেহারার, লম্বা ঝাঁকড়া-মাথার তালগাছের সারির মতো কপালিপাড়ার কপালিরা বুড়োবটতলার জমাটবাঁধা অন্ধকারের মতো নানা বিশ্বাস এবং সংস্কার নিয়ে বেঁচে থাকে।

বংশীর মনে হয়, তার শরীলটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেছে। তার ক্ষিদে-তেষ্টা নেই, কাম-ক্রোধ নেই। সে একটা ভারহীন অস্তিত্ব মাত্র।

কুইলি রান্না শেষ করে ঘর থেকে এক সময় বেরিয়ে আসে। অন্যান্য দিন রান্না সেরে সে দাওয়ার ধারে কিছুক্ষণ বসে। আজ আর বসলো না। সোজা উঠোনে নেমে দাঁড়ালো।

: ভাত বেড়ে দিয়ে গেছি। খেয়ে নিস।

: আজ আর বসবি নি ?

: না। কাল থিকে আমি আর আসতি লারব।

: আসবি নি ?

কুইলি পাথর হয়ে গেছে যেন। আঁধারের গায়ে খোদাই-করা একটা পাথরের প্রতিমা যেন।

: ক্যানে আসবি নি ? কেউ কিছু বলেছেন ?

: না। বাতাসী এসেছেন। ইবার থিকে উ তোকে রেঁধে দিবেন।

অন্ধকারে পাথরের প্রতিমা চোখের আড়ালে ভেসে চলে যায়। নিঃশব্দে। নতমুখে।

ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফোটে নি। আকাশে খুঁজলে তখনো একটা দুটো তারা দেখা যায়। পুলি এত ভোরে ছেলে কোলে কুইলির খোঁজে আসে। বংশীর উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে ওকে। এত ভোরে কুইলি আসে না। আগে কখনো-সখনো আরো ভোরে সে এসে পড়েছে ঠিক। কিন্তু ক'দিন হলো, সে আর আসছে না। বলে গেছে, সে আর আসবে না। পুলি কিন্তু থামে না। ডাকে : কুইলি—

ঘুম ভেঙে বংশী দোর খুলে বেরিয়ে আসে।

: কুইলি ত ইখোনো আসেন নি। ক্যানে ? কী হয়েছেন ?

পুলির চোখ দুটো ভোরের তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল।

: কাল উ এসেছিলেন—

: কে ? মধুয়া ?

: হঁ।

: আমি জানতি লারলাম।

: ইবার উ গাঁয়ে আসবেন।

: আসবেন?

: হঁ। উকথা পরে হবেন। ইখোন জলশিয়রের কপালিপাড়ার সব্বোলাশ হাতি যাচ্ছেন। উই কথাই বলতি এলাম।

বংশীর চোখ দুটো হঠাৎ আগুনের গোলার মতো পাক খেয়ে ওঠে।

: ক্যানে!

: খোকন বক্‌সি লোক-লস্কর দিয়ে বালিয়াড়ি কেটে সমুদ্দুরের নুনজল ঢুকিয়ে দিবেন জলশিয়রের ধানের মাঠে, কপালিরা যাতে উকে জমিন ছেড়ে দিয়ে সরে আসেন। উতে উ নিকি নুনের কারখানা করবেন। আজ ভাদ্দর মাসের আমাবস্যা। ষাঁড়াষাঁড়ি জোয়ার আসবেন। নিশুত রাতে বালিয়াড়ি কেটে দিলে ধরা যাবেন নি কেউ কেটে দিয়েছেন নি কি জোয়ারের তোড়ে বালিয়াড়ি ভেঙে উড়ে গেছেন।

: ফন্দিটা ত খোকন বক্‌সি এঁটেছেন বেশ। উকে রুখতি হবেন। মধুয়া কী বলে গেছেন?

: উই কথাই উ বলে গেছেন। মরতি হয় ত হবেন। খোকন বক্‌সিকে যে করেই হোক, রুখতি হবেন। কৈবর্তপাড়ার কৈবর্তরা রাজি হয়েন নি। তাই চাঁপাবনির কৈবর্তদের আর উর কৈবর্তপাড়ার ইটখোলার কাহার মজুরদের উ টাকার লোভ দেখিয়ে রাজি করিয়েছেন।

: আজ তা'লে জলশিয়রের চরে উদের লাশ পড়ি যাবেন। তুই ঘরে যা। আমি কপালিপাড়ায় খবর করে দিচ্ছি।

আজ অনেকদিন পরে বংশীর রক্তে গরগর আওয়াজ করে ওঠে এক দঙ্গল হিংস্র জানোয়ার। ধারালো নখ বের করে তারা যেন ঘন ঘন মাটি আঁচড়াতে থাকে বুকের ভেতর।

: বালিয়াড়ি কেটে জলশিয়রের ধানের জমিনে নুনজল ঢুকিয়ে দেবেন। খোকন বক্‌সিকে আজ তালে জলশিয়রের কপালিপাড়ার কপালিরা খুদ বাঘের খেল্ দেখাবেন।

: ঠিক আছেন। সোব্ কিছু কিন্তু করতি হবেন খুব গোপনে। জটা যেন জানতি লারেন। তুই, বংশীভাই, ঘনুকাকাকে খবর করে দে। আজ রাতে সোব্বাই যেন তৈয়ার থাকেন যার যা হাতিয়ার লিয়ে। আমি যাচ্ছি কুইলির ঘরে। আমি ইদিকটা দেখছি, তুই ঘনুকাকাকে লিয়ে উদিকটা দ্যাখ—

: মধুয়া বলেছেন ত?

: হঁ।

: তা'লে আর কুনো কথাই নেই। মধুয়া যা বলেছেন, উই হবেন। কপালিপাড়ার কপালিরা আজ খোকন বক্‌সির গুণ্ডাদলকে সমুদ্দুরে ভাসান দিবেন। হঁ—

: সোব্ সময় মনে রাখতি হবেন, উদের হাতে বন্দুক আছেন।

পুলি আর দাঁড়ালো না। বংশীও দরজায় শেকল দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ঘনু দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল। রোদ উঠে গেছে আকাশে। কপালিপাড়ার ঘুম ভেঙেছে। বংশীকে দেখে ঘনু হাসে।

: আয় বংশী, বস্। আমি ভাবছিলাম তোর কথা। জানতাম তুই আসবি। বাতাসী ত এসেছেন। কিন্তুক পরাণের খবর কি?

বংশী বসে না।

: পরাণ? পরাণের খবরে আমার কাম নেই, খুড়া।

ঘনু হাসে।

: বাতাসী ত ফিরে এসেছেন।

: বাতাসী ফিরে এসেছেন, এসেছেন। আমার উতে কী? খুড়া, উ সোব্ কথা ছাড়ান দে ইখোন। জলশিয়রের কপালিপাড়ার সব্বোনাশ হতি চলেছেন।

: কপালিপাড়ার সব্বোনাশ! কি হয়েছেন, শিগ্‌গির বল্।

ঘনু হুঁকো নামিয়ে টান হয়ে বসে।

: জটা যেন কুনো কথা জান্‌তি লারেন।

: আরে না না। জটা ইখোন আর কেউ নয় কপালিপাড়ার।

: হুঁ। জটাকে কিছুই বলা চলবেন নি। খুব গোপন।

: ঠিক আছেন।

: আজ আমাবস্যা। খোকন বক্‌সি আজ নিশুত রাতে বালিয়াড়ি কেটে নুনজল ঢুকিয়ে দিবেন আমাদের জলশিয়রের ধানের জমিনে।

: মতলব?

: ইখানে জমিনের দখল লিয়ে নুনের কারখানা করবেন। আজ চাঁপাবনির কপালিদের আর ইটখোলার কাহার মজুরদের দিয়ে বালিয়াড়ি কেটে দিলে সোব্বাই ভাববেন, ষাঁড়াষাঁড়ি জোয়ারের তোড়ে বালিয়াড়ি ভেসে গেছেন।

: ফন্দিটা ত মন্দ করেন নি উ!

: মধুয়া কাল রাতে এসে পুলিকে বলে গিয়েছেন সোব্। বলে গিয়েছেন যার যা হতিয়ার আছেন উই লিয়ে আজ রাতে রুখতি হবেন খোকন বক্‌সির গুণ্ডাদলকে।

: তা'লে ত ইখোন থিকেই সোব্বাইকে তৈয়ার হতি বলতি হয়েন।

: কিন্তুক খুব গোপনে। সোব্বাইকে চুপি চুপি তুই খবর করে দে, খুড়া। তুই ইখোন আমাদের একমাত্র ভরসা।

: ঠিক আছেন। তামাক খা।

ঘনু নতুন করে তামাক সেজে আনতে বউকে ফরমাশ করে। প্রায় দশ সন আগে বংশী যখন গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, খোকন বক্‌সি কৈবর্তপাড়ার কৈবর্তদের দিয়ে বংশীর জমিনের ধান কেটে নেবার ফন্দি করেছিল। মধুয়ার কথায় তখন জটা হয়েছিল গাঁ-বুড়ো। সে কপালিপাড়ার কপালিদের একজোট করে ওটা

রুখেছিলেন। আজ ঘনু কপালির সামনে এসেছে তার গাঁ-বুড়ো হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণের তার চেয়েও বড়ো একটা সুযোগ। কিন্তু সে কি পারবে এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে তার যোগ্যতাকে নিখুঁতভাবে প্রমাণ করতে ? এবার বংশী আছে। কুইলি আছে। কপালিপাড়াও এখন আরো এককাট্টা। ওবারে ছিল কেবল বংশীর জমিনের ব্যাপার। এবার লোনাজল ঢুকলে কপালিপাড়ার সবার জমিন যাবে। তারপর জলশিয়রের পুরো মাঠ জুড়ে হবে খোকন বক্সির নুনের কারখানা।

ঘনুর বউ কলকেয় নতুন করে তামাক চড়িয়ে দিয়ে গেল।

: খুড়া, কি ভাবছিস তুই ?

: তুই কি ভাবছিস, আগে বল্।

: আমি বলি কি খুড়া, ঠিক সন্ঝা বিলা সোব্বাই বুড়োবটতলায় জটলা করে ইক্টু হাঁড়িয়া খাবেন। মরদদের হাতে থাকবেন সোব্ রকমের হাতিয়ার। লাঠি, ভালি, টাঙ্গি, কুদাল, শাবল, কাঁড়বাণ—যার যা আছেন। আর মেয়েমনিষিদের হাতে থাকবেন ইকটা করে মশাল।

: ঠিক বলেছিস। আমাবস্যার রাত। মশাল না হ'লি চলবেন নি।

: সোব্টা শুন্বি ত, খুড়া। ই সোব্ বুড়োবটগাছের আড়ালে লুকিয়ে রাখতি হবেন। আমরা আজ লড়াইর জন্যে তৈয়ার হয়ে আছি, উ কথা একদম জানতে দেওয়া হবেন নি উদের। মরদেরা মাদল বাজাবেন, মেয়েমনিষ্যিরা লাচ করবেন, গান গাইবেন। সোব্বাই ভাববেন, চাষকামের পর কপালিপাড়ার মনিষ্যিজন ইকটু ফুর্তি করছেন। জটার উপর সোব্ সময় কিন্তুক লজর রাখতি হবেন। কৈবর্তপাড়ার রাস্তায় একজন আর চাঁপাবনির রাস্তায় একজন সন্ঝা থিকে পাহারা দিবেন। উরা বালিয়াড়ির দিকে চলি গেলে বুড়োবটতলায় খবর করে দেবেন। উরা যদি একজোট হয়ে বালিয়াড়ির দিকে যান, আমাদের একজোট হয়ে এগুতি হবেন। আর, যদি ভাগ ভাগ হয়ে যান, আমরাও ভাগ ভাগ হয়ে এগুব।

: বংশী, তোর কথায় বুঝা যায়েন, তোর ঠাকুরবাপ দুখু কপালি কি করে ডাকাতদলকে কাবু করেছিলেন।

ঠাকুরবাপের কথা কেউ বললে বা তার নিজের মনে পড়লে বংশীর বুকটা কেমন টানটান হয়ে ওঠে।

ঘনু ভয়ে ভয়ে বলে : কিন্তু বংশী, খোকন বক্সির দারোয়ান জবর সিং আছেন নি ? উর ফের বন্দুক আছেন, লয় ?

: তুই জবর সিং আর উর বন্দুককে ডরছিস নি কি, খুড়া ? মনে রাখিস, আমার ঠাকুরবাপ ছিলেন দুখু কপালি। উর হাতের লাঠি যখন ঘুরতেন, তখন বন্দুকের গুলিও সিঁধাতি লারতেন। ঠিক লয় ?

: ঠিক।

: তা'লে ?

: আজ সন্ঝাবিলায় বুড়োবটতলায় কপালিদের লড়াইর লাচ হবেন।

তাই হলো। সন্ধ্যে থেকেই বুড়োবটতলায় কপালিপাড়ার কপালিরা এক এক করে এসে জুটতে লাগলো। মরদ মেয়েমনিষ্যি—সবাই। মাদল এসেছে, সঙ্গে লাঠি এসেছে, ভালি এসেছে, টাঙ্গি-কুড়াল-শাবল এসেছে, কাঁড়বাণও এসেছে। দা-কাটারিও বাদ যায় নি। সকাল থেকেই কপালিপাড়ার ঘরে ঘরে বেশ একটা সাজ সাজ রব চলছিল। ঘরে ঘরে শানপাথরে লোহা ঘষার ঘস্‌ঘস্ আওয়াজ উঠছিল। শান-পাথর নিয়ে টানাটানি চলেছিল সারাদিন। সমুদ্দুরের নোনা জলহাওয়ায় লোহার ফলায় জং ধরে বড়ো তাড়াতাড়ি। বর্ষাকালে একটু বেশি। শান না দিলে ধার ওঠে না। কেউ-বা কিছু করবার না পেয়ে লাঠিতে তেল মাখিয়েছে সারাদিন বসে।

সকাল থেকে কুইলি একটা টাঙ্গি নিয়ে শানপাথর ফেলে তাতে শান দিয়েছে। টাঙ্গির ফলাটা রুপোর মতো ঝকঝক করছে। তবু কুইলি ফলাটা শানপাথরে ঘষতে ছাড়ছে না। রঘু ধার পরখ করে বলে: কুইলি তোর ইতে যে দাড়ি কামানো যেতি পারেন রে। কী করেছিস ইটা। ইটা টাঙ্গি না দাড়ি কামাবার ক্ষুর।

কুইলি গম্ভীর গলায় বলে: উতে আজ খোকন বক্‌সির মাথা আর জবর সিংয়ের দাড়ি কামানো হবেন।

সন্ধ্যের পরই মাদলের পিঠে কাঠি পড়লো। সারাদিন রোদ্দুর খেয়ে মাদলগুলোর চামড়া টান-টান হয়ে আছে। কাঠির বাড়ি পড়তেই আওয়াজ উঠলো—বুম্-বুম্। যেন কালোহাঁড়ি মেঘের বুক-কাঁপানো বাজের আওয়াজ। মেয়েরা নাচ শুরু করলো। অন্ধকারে নাচ জমলো না। দু'দিকে দুটো মশাল জ্বেলে ধরতে হলো। সেই মশালের আলোয় দেখা গেল, কে একজন সাইকেলে চড়ে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে চন্ননপুরের রাস্তার দিকে ছুটে যাচ্ছে। লগন আর শিবু ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাঁকের মুখ থেকে লোকটাকে ধরে আনলো। জটা। জটা বোঝানোর চেষ্টা করে, ওর বউর দাঁতের প্রচণ্ড যন্তন্না। একটা ইলাজের ব্যবস্থা না করলে নয়। লগন বলে: যন্তন্না তোর বউর দাঁতে লয়, যন্তন্না তোর আঁতে। খোকন বক্‌সির জন্যে তোর আঁতে যন্তন্না উঠেছেন। উ আমরা জানি। যেতে দিব নি তোকে আজ। লে, মাদল বাজা—

লগন গলার মাদলটা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলে: বাজা। বাজাতি হবেন। ছাড়ব নি তোকে আজ।

মাদলে কাঠি দিয়েই ওর আওয়াজে জটা নিজেই চমকে ওঠে। মনে মনে বলে: ভালই হলেন। খোকন বক্‌সির আজ কি হবেন, বলা যায়েন নি। ইদের সাথে থেকে তবু বাঁচার রাস্তাটা খোলা থাকবেন।

হাঁড়িয়া খাওয়া হচ্ছে। আজ হাঁড়িয়ার কলসী কুইলির হাতে। একবারের বেশি যে চেয়েছে, সে-ই ধমক খেয়েছে। আজ নেশা করবার দিন নয়— ওটা সে

ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে ওদের।

দ্রিমিক দ্রিমিক দ্রিমি।
দ্রিমিক দ্রিমিক দ্রিসি ॥
ফাগুন হলেন আগুন যদি
আকাশ ক্যানে লাল গ,
বুকে বাজেন মাদল আর
হাওয়া নি মাতাল গ।
দ্রিমিক দ্রিমিক দ্রিমি....

মাদলের দ্রিমিক দ্রিমিক বোলে আর পায়ের ঝিনিক ঝিনিক তালে রাত বাড়ছে। কৈবর্ত-পাড়ার রাস্তায় পাহারায় যে ছিল, সে ফিরে এলো। কাউকে আসতে দেখা গেল না। আরও কিছুক্ষণ বাদে চাঁপাবনির রাস্তা থেকে ফিরে এলো কপালিপাড়ার নাড়ু।

ব্যাপারটা তাহলে একটা গুজব ছাড়া কিছু নয়। মিথ্যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে। ওরা আসবে না। মধুয়া কী শুনতে কী শুনেছে আর কী বলতে কী বলেছে— সে-ই জানে। তবু জটা যদি সাইকেলে গিয়ে আগেভাগে খবর দিয়ে আসতো, বোঝা যেত, কপালিপাড়ার দুর্দান্ত প্রস্তুতির খবর পেয়ে তারা আসে নি। কিন্তু তা তো নয়। জটা কপালিপাড়ার নজর ফস্‌কে পালাতে পারে নি। আসলে, ওরা আসবে না, তাই আসে নি। আসার হলে ঠিক আসতো। খবরটা একটা ফাঁপা খবর। যাক্, তাতে কী হয়েছে। চাষকাম শেষ করে কপালিপাড়া আজ একটু ফুর্তির মুখ দেখলো। মন্দ কী!

সিমলি হাঁড়িয়া খেয়ে একধারে খোলা হাওয়ায় বসে ঢুলছিল। শ্যামা গেল ওকে তুলে আনতে। ইকটু নাচুক মেয়েটা। তা'লে উর ঘুম ছুটে যাবেন। ওকে টেনে দাঁড় করিয়েছে শ্যামা। সিমলির ঘুম ভাঙে না।

: সিমলি!

দুটো কাঁধ ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিতেই ঘুম ভেঙে চোখ মেলে তাকালো সিমলি। দুহাতের তালুতে চোখ দুটো ভালো করে রগড়ে নিয়ে দূরে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে : উই দ্যাখ্ মা, বালিয়াড়ির উধারে কত আলো!

শ্যামা চেঁচিয়ে উঠলো। কুইলি চেঁচিয়ে উঠলো।

: নাচ থামা সোব্, নাচ থামা। বালিয়াড়ির উধারে দ্যাখ্ কত আলো!

হাঁড়িয়া আর নাচের নিশায় কারো কোন কিছু খেয়াল ছিল না। সবাই ভেবেছিল, ওরা আজ আর কেউ বালিয়াড়ি কাটতে এলো না। তাই শেষ পর্যন্ত হাঁড়িয়া আর নাচে-গানে মেতে উঠেছিল সবাই। খেয়াল ছিল না কোনদিকে। এরা ধরেই নিয়েছিল, খবরটা একদম ভুয়া। এখন চমক ভাঙলো। হাতে যে যার হাতিয়ার তুলে নিল। মেয়েরা জ্বেলে ধরলো একটার পর একটা মশাল। গলার মাদলগুলো

পড়ে রইলো বুড়োবটতলায় মাটিতে। ওদের বুকের রক্তে এখন মাদল বাজতে শুরু করেছে। যা হয় একটা হবে আজ। হৈ-হৈ শব্দে ওরা চললো। রাস্তার বাঁক ঘুরতে গিয়ে চোখে পড়লো, তালবাঁধের কোণে আকাশে শুকতারা উঁকি মারছে।

বংশীর হাতের লাঠিটা বেশ শক্ত করে ধরা। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, ওরা কোন্ রাস্তায় বালিয়াড়ির ওপারে গেল। রাস্তা তো মাত্র দুটো। একটা কৈবর্তপাড়ার রাস্তা, অন্যটা চাঁপাবনির ভেড়িবাঁধ। আর একটা রাস্তা বংশীর নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। ওটা হলো সমুদ্দুরের চরের রাস্তা। ওদিকে বোলাগ্গা গ্রাম হয়ে সমুদ্দুরের চরবরাবর সোজা চলে আসা যায় বালিয়াড়ির ওধারে। বংশী এখন তার ভুলটা বুঝতে পারে।

কখন থেকে ওরা এসে বালিয়াড়ি কাটছে, এরা টেরই পায়নি। বালিয়াড়িটা পুরো কেটেই ফেললো কি না, কে জানে। যদি পুরো কেটে ফেলে, তাহলে সমুদ্দুরের জোয়ারের লোনাজলে শুধু জলশিয়রের ধানী জমিগুলোই ডুবে যাবে না, পুরো কপালিপাড়াটাই ভেসে যাবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে।

: ছুটে চল্, ছুটে চল্, কপালি ভাইবুনেরা—

পুব আকাশে তড়ড়িয়ে শুকতারা উঠে যাচ্ছে। একটু পরেই ভোর হবে। সূয্যি ভুঁই ভাঙবে পুব আকাশে। আসবে এ বছরের ষাঁড়াষাঁড়ি জোয়ার। কাটা বালিয়াড়ির বালি ভাসিয়ে নিয়ে হাজারটা জিভ বের করে সমুদ্দুর ঢুকে পড়বে জলশিয়রের ধানের মাঠে, সামান্য খড়কুটোর মতো কপালিপাড়াকে জিভে তুলে নিয়ে খলখল আক্রোশে তুমুল গর্জন করতে করতে ছুটে যাবে ঢালুপথে তালবাঁধের দিকে।

: যে করেই হোক, বাঁচাতি হবেন আজ। ছুটে চল্—ছুটে চল্, কপালি ভাইবুনেরা

বংশী যা ভেবেছিল, তা নয়। বালিয়াড়ির বালি ওরা খুব বেশি কাটতে পারেনি। একটা হ্যাজাক জ্বলছে বালিয়াড়ির আড়ালে। জন চল্লিশ-পঞ্চাশ মানুষ বালিয়াড়ির বালি সরাচ্ছে একপাশে। বালিয়াড়ির ওপরে কপালিপাড়ার দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছে জবর সিং। হাতে বন্দুক। দূর থেকে আলোর বিন্দুগুলোকে সে পরথমে জোনাক-পোকা ঠাউরেছিল। বিন্দুগুলো তাদের দিকে ছুটে আসছে দেখে সে বুঝে নেয়, ওগুলো জোনাকি পোকা নয়। কপালিপাড়ার জ্বলন্ত ক্রোধ। বহুদিন পরে কপালিপাড়াটা ফের জেগে উঠেছেন তা'লে।

আওয়াজ শুনে খোকন বক্সির নায়ের বালিয়াড়ির ওপর উঠে এসেই বুঝতে পারলো, সামনে বিপদ। সমূহ বিপদ! সে চিৎকার করে ওঠে: বাবুমশাই, ওরা কি করে খবর পেয়ে গেছে। সব মশালটশাল নিয়ে তেড়ে আসছে। ওরা ছাড়বে না, হুজুর। আপনি পালান। যে দিকে পারেন, পালান।

: পালাবো ? কোথায় পালাবো ? কেন পালাবো ? হ্যাজাকের কাছ থেকে দূরে সমুদ্দুরের দিকে ফিরে শীতল হাওয়া খাচ্ছিল খোকন বক্সি। সে নায়েবের চিৎকার শুনলো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। তাকে পালাতে বলছে কেন

নায়েব? সে কেন পালাবে? জবর সিং বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে কেন? চল্লিশ-পঞ্চাশটা মানুষের হাতে হাতিয়ারগুলো তাহলে আছে কিসের জন্যে?

দেখতে দেখতে কয়েকটা আলোর বিন্দু বালিয়াড়ির মাথায় উঠে এসে জবর সিংকে ঘিরে ফেললো। জবর সিং পালাবারও চেষ্টা করলো না। গুলি ছুঁড়বার জন্যে একবার মাত্র সে বন্দুক তুলেছিল, তারপর বিপদ বুঝে নামিয়ে ফেলেছে। একী! আলোর বিন্দুগুলো যে মশাল! কপালি মেয়েদের হাতের মাশাল! ওদের পাশে যে ধারালো হাতিয়ার হাতে কপালিরা! হাতিয়ারগুলো আবার আলোয় ঝিলিক মারছে। এ কী! সর্বনাশ! ওরা যে এবার দেখছি এদিকেই তেড়ে আসছে!

: এই জবর সিং, তোর হাতে বন্দুক আছে কোন্ কম্মে? গুলি কর্। গুলি করে মেরে ফ্যাল্ অসভ্য জানোয়ারগুলোকে। আরে, এই ভাড়াটে মজুরগুলো! তোদের কাছে লাঠি-ফাঠি কিছু নেই! খালি হাতে বালিয়াড়ির মাথায় ঘুড়ি-ওড়ানো দেখতে এসেছিস নাকি? যা দিয়ে পারিস, ওদের রোখ্। এসে পড়লো যে!

সত্যিসত্যিই, ওরা এসে পড়লো। মশালের আলোয় ওদের হাতের শড়ন-খাওয়া ভালি, কুড়াল, টাঙ্গি, শাবল, কাটারির ফলাগুলো ঝিলিক মেরে খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে, হেসে উঠছে ওদের হাতের তেল-মাখানো লাঠিগুলোও। এমনটা যে হবে, খোকন বক্সি আগে থেকে ভাবতে পারে নি। জানলে আসতো না। সে এসেছিল, জোয়ারের নোনাজল কলকলিয়ে জলশিয়রের ধানের জমিনে ঢুকবে, তা দেখবে বলে। জল তো ঢুকলোই না। এখন প্রাণ যায়-যায়। যত দোষের গোড়া ওই ব্যাটা জটা। ওর আসবার কথা ছিল সন্ধ্যের আগে। ব্যাটা এলোনা। ওর জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে অযথা দেরি করে ফেললো এরা। দেরির জন্যেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। আর এখন সে কোন্ দিকে পালাবে? যেদ দিয়ে এসে. . ., সেই দিক দিয়ে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

থলথলে শরীর নিয়ে কয়েক পা ছুটেই দেখলো, সামনেই মশালের আলোয় কপালিদের হাতের হাতিয়ারগুলো তাদের লক্‌লকে জিভলবের করে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। শুরু হলো তার পেছন ফিরে দৌড়। সর্বনাশ! এদিকেও যে তাই। বালিয়াড়ির দিকেও জ্বলছে মশালের সারি। নায়েব গেল কোথায়? মজুরগুলো পালিয়েছে, না, ওদের সঙ্গে মিশে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না। এমন বিপদে কোনদিন পড়ে নি খোকন বক্সি। ওরা ওকে তিনদিক থেকেই ঘিরে ফেলেছে। একটা দিকই শুধু খোলা আছে। ওটা সমুদ্দুরের দিক। সমুদ্রও এদি- ষাঁড়াষাঁড়ি জোয়ারে উত্তাল হয়ে দারুণ রোষে এগিয়ে আসছে। যা থাকে কপালে—খোকন সেইদিকেই ছুটে যাচ্ছে। খোকন বক্সি তার সামনে অবধারিত মৃত্যুকে দেখতে পেল। সমুদ্দুরের একটা ঢেউ এসে তার বুকের ওপর ভেঙে পড়লো। পরের ঢেউতে তাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে কোথায়, কেউ জানে না।

জবর সিং ছুটে নেমে এলো। একেবারে জলে। ডান হাতটা খোকন বকসির

গলায় পেঁচিয়ে দিয়ে ওকে টানতে টানতে নিয়ে এলো চরের ওপর। কপালিদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুহাতে বন্দুকটাকে বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বললো : আউর এক কদম আগে বাঢ়নে সে গোলি কর্ দেগা। হঁ—

সবাই থমকে থেমে যায়। হিংস্র শিকারীদের শিকার আজ ফস্‌কে যাচ্ছে।

: উকে ছেড়ে দে। উ আমাদের সব্বোনাশ করতি এসেছিল। উকে আমাদের হাতে ছেড়ে দে। যা করবার, আমরাই করব।

: কি করবি ?

জবর সিং বন্দুক নামিয়ে পুছ্ করে।

: উকে কেটে টুক্‌রাটাক্‌রা করে সমুদ্দুরের হাঙরগুলোর মুখে দিয়ে দিব। আর কিছু করব নি। ওরা খেয়ে বাঁচবেন।

নাড়ু কাঁড়বাণ তুলে তাক করে।

: জবর সিং, তুই আমাদের গুলি কর্। আমি আমার বাণ দিয়ে উর বুকটা শুধু ইফোঁড়-উফোঁড় করে দিব।

জবব সিং হুকুমের স্বরে বলে : নাড়ু, কাঁড়বাণ নামা। আমার কথা শুন্। উকে ছাড়ান দে। উর বিচার হবেন।

কুইলি টাঙ্গি হাতে এগিয়ে আসে।

: নাড়ু ক্যানে শুনবেন তোর কথা ? তুই কে যে তোর কথা শুনতি হবেন। তুই ছেড়ে দে। উর বিচার আমরা করব।

: ঠিক আছেন। লে, উকে কুথায় লিয়ে যাবি, লিয়ে যা। উর বিচার তালে তোরাই কর্।

কুইলি অবাক হয়ে যায় জবর সিংয়ের কথা শুনে ।

: উ যে আমাদের মতন কথা বলেন রে।

পাশেই মশাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল পুলি। কুইলি ওকে পুছ করে : কিরে বউ ? উ আমাদের মতন কথা বলেন ক্যানে ?

: আমি উর কী জানি ?

খোকন বক্‌সি চেয়ে দেখলো, কপালি মেয়েদের হাতের মশালগুলোর আলো ফিকে হয়ে আসছে। দূরে হ্যাজাকের আলোর আর তেমন জোর নেই। পুব আকাশে চেয়ে দেখলো, একটা দগদগে সূর্য উঠছে। এখন তার মনে হচ্ছে, সে বেঁচে আছে এবং বোধ হয়, এ যাত্রায় সে বেঁচে গেল। কিন্তু দুঃখ একটা থেকে গেল, বালিয়াড়িটা সরানো গেল না। জুনশিয়রের মাঠে তার সাধের সল্ট ফ্যাক্টরিটা আর হলো না।

এ আবার কী ! বালিয়াড়ির উপর থেকে পুলিশ নামছে কেন ? পুলিশকে আবার খবর দিল কে ? দু'তিনজন অফিসার ওদের সামনে, মনে হচ্ছে। সে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে হেঁয়ালির মতো লাগছে।

তাহলে কাল রাতে বালিয়াড়ি কাটার কথা নিশ্চয়ই আগে থেকেই কেউ কপালিপাড়ার কপালিদের জানিয়ে দিয়েছে। এটা কি তবে জটার কাজ ? শুধু তাই নয়, পুলিশকেও খবর দিয়ে রেখেছে। একটা খুব গভীর আর বড়ো ধরনের চক্রান্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে। সে তার কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি।

: আরে খোকন বাবু যে ! আপনি এখানে এ অবস্থায় কেন ? আপনার লোকজন সব কোথায় গেল ?

থানার নতুন ও. সি.। মাস ছয়েক হলো এসেছেন। লোক সুবিধের নয়। ঘুষ খায় না।

: আর বলবেন না, স্যার। ভয়ে সব শালা পালিয়েছে।

: এঃ-হে-হে-হে—। ব্যাড্ লাক্ । আপনাকে ফেলে পালিয়েছে ? কতজন ছিল ওরা ?

: জনা পঞ্চাশেক। সব কাওয়ার্ড আর বেইমান—

: কখন এসেছিলেন ?

: একটু দেবি হয়ে গিয়েছিল। তা'রাত তিনটে হবে।

: কাজ হলো ?

: কোথায় আর হলো ? খানিকটা হতে নাহতেই এই সব অসভ্য বদমায়েস কপালিগুলো তেড়ে এলো। কিছুতেই ছাড়ছে না, আপনারা এসেছেন, ভালোই হয়েছে। আপনারা আমাকে এদের হাত থেকে বাঁচান।

পাশের ভদ্রলোক মুখ খোলেন : খোকনবাবু, আমি সেচ বিভাগ থেকে আসছি। সমস্ত সি-ডাইকটাই আমাদের আণ্ডারে। এই যে বালিয়াড়িটা, ওটাও সিডাইকেরই অংশ। তা জানেন ?

: জানি। কালরাতে জনা পঞ্চাশেক লোক নিয়ে—

: আপনি এটা কাটতে এসেছিলেন। এসেছিলেন কিনা ?

: বলেছি তো এসেছিলাম । অস্বীকার করছি না।

অন্য অফিসারটি হেসে উঠলেন।

: আপনি তো সবই স্বীকার করছেন।

: আমি খোকন বক্সি। যা করি, তা স্বীকার করতে ভয় পাই না।

: ভেরি গুড ! আমি কৃষিবিভাগের লোক। আপনি জোয়ারের নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়ে জলশিয়রের মাঠের ধানী জমিন নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

: ধানী জমিন কোথায় ?

: জলশিয়রের মাঠে ধান চাষ হয় নি ?

: বছর আট-দশ হলো, হচ্ছে। ওতেই এগুলো ধানী জমিন হয়ে গেল ? আগে ওখানে জোয়ার-ভাঁটা খেলতো।

: যখন খেলতো, তখন খেলতো। এখন ধান চাষ হয়। এ সব ধানী জমিন। চাষীরা তার মালিক। আপনি অন্যের জমিন নষ্ট করতে এসেছিলেন কোন্ রাইটে।

: আমি ওগুলো জমিদার রায়বাহাদুর ত্রিলোচন মল্লিকের কাছ থেকে কিনেছি।

: সব ভেস্টেড্ ল্যাণ্ড । চাষীরাই এখন মালিক ।

: বুঝেছি। কত টাকা খেতে চান, বলুন ?

: বক্‌সি মশাই, টাকাতেই কি সব হয় ?

: কিসে হয়, বলুন।

: থানায় চলুন।

জবর সিং কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে ও.সি.র সামনে এগিয়ে যায়।

: আমি কাল তক্ খোকন বাবুর দারোয়ান ছিলাম। সাত-সন কাম করেছি। আর উরকাম করব নি। আপনি তুই থানার বড়বাবু আজ্ঞা। ইটা খোকনবাবুর বন্দুক। লাইসেন্স আছেন উর কাছে। তোর কাছে আজ জমা করে দিলাম।

খোকন বক্‌সির দিকে সে ঘুরে দাঁড়ায়।

: খোকনবাবু, ই তোর পাগড়ি, আজ্ঞা। তোকেই ফিরত দিলাম। আজ থেকে আমি জবর সিং লয়, আমি জলশিয়রের কপালিপাড়ার মধুকপালি।

ও.সি. সাহেবের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

: তোর নামে সেই খুনের মামলা ছিল না ?

: আজ্ঞা । উ ঝুটা মামলা খারিজ হয়ে গেছেন।

: জানি। কাল থানায় অর্ডারের কপি এসেছে।

: আজ্ঞা। দাড়িটা রাখতি হয়েছিলেন। উটা আর কাউকে দিবার নেই। উটা কামিয়ে আজ অনেক সন বাদে ঘরে ফিরে যাব।

বংশী ওদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর চোখের সামনে আজ কত কী ঘটে গেল। সে পাগলের মতো মধুয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। গলা চিরে চিৎকার করে ওঠে

: মধুয়া! তুই মধুয়া ?

মধুয়াকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বংশী ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ওর চোখে পলক পড়ে না। শুধু দুটো জলের ধারা দু'চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

মধুয়া ঠোঁট দুটো প্রাণপণে চেপে আছে । ঠোঁট দুটো কাঁপছে বোঝা যায়। তারও চোখ দুটো কান্নায় ভরে উঠেছে।

এবার জোয়ার আসবে। সমস্ত চরটাকে ছাপিয়ে জোয়ারের ঢেউ বালিয়াড়ির বুকের ওপর গিয়ে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে।

কুইলি পুলির গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে : আজ বুঝলাম, উদিন জবর সিং তোর কানে কানে কী বলেছিলেন, বউ—

জবাবে পুলি কুইলির পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়।

কপালিপাড়ার সবাই তখন মধুয়াকে ঘিরে ধরেছে। ওদের হাতে এখন আর মশাল নেই। হাতের মশালের আলো এখন ওদের সবার চোখে জ্বলছে। বংশী মধুয়ার সামনে এসে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসে পড়ে।

: মধুয়া ! তুই আমার কাঁধে উঠ্। তোকে আজ আমরা কাঁধে করে কপালিপাড়ায় লিয়ে যাব। তুই আমাদের বুকের বল—মাথার মণি।

এমন দিনে বুধিয়া নেই। সে দেখে যেতে পারলো না কপালিপাড়ার এমন একটা দৃশ্য। আর আশ্চর্য ! কেউ একবারও বুধিয়ার নাম মুখে আনলো না। এত শিগ্‌গির বুধিয়াকে সবাই ভুলে গেল ! অন্য সবারই কথা বাদ দাও। কুইলি ? কুইলি কি করে বুধিয়াকে ভুলে গেল ? সে যে ওকে নিজে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিল। গাড়িতে সারাক্ষণ সে যে ওর মাথা কোলে নিয়ে বসেছিল। জ্বরে সারাক্ষণ সমস্ত শরীল পুড়ে যাচ্ছিল বুধিয়ার। সব ভুলে গেল কুইলি ? মনিষ্যি এত সহজে সব কি করে ভোলে ? হয়তো সব ভোলে বলেই মনিষ্যি বাঁচতে পারে। বেঁচে থাকে। তা নইলে সব যদি মনিষ্যির মনে থাকতো, কিছুই যদি সে ভুলতে না পারতো, তাহলে মনিষ্যি বাঁচতে পারতো না, পাগল হয়ে যেত। আর সিমলি ? শরৎকালের শিউলি ফুলের মতো সিমলি ? ও ভুলবে কি ? সে তো এখনও জানে না, ওর বুধিয়া আব পিরথিবিতে নেই। আর কুনোদিন সে ফিরবে না। সিমলি ! তুই চিরজীবন ওর পথ চেয়ে থাক্। চোখের জলে ধুয়ে ফ্যাল্ বুধিয়ার অতীতের সব স্মৃতি।

কাল মিটিন ছিল বুড়োবটতলায়। মধুয়ার জন্যে মিটিন। মধুয়া ইতিমধ্যে বহুবার কপালিপাড়ায়, ওর ঘরে এসেছে। কিন্তু গোপনে। গত বিশ সনের মধ্যে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় সে এলো এই পরথম। আর আশ্চর্য ! কালকের মিটিনে সবার আগে এসে হাজির হয়েছিল জটা। সে আজ মধুয়ার পাশে একেবারে আঠার মতো লেগেছিল। মিটিনের শুরুতেই সে বলে বসলো : মধুয়া, তোর কথায় আজ থেকে দশ সন আগে কপালিপাড়ার সোব্বাই আমাকে গাঁ-বুড়ো করেছিলেন। তুই এসেছিস। ইবার আমাকে তুই ছাড়ান দে।

মধুয়া হাসলো। মধুয়া তার দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে। ও এখন পুরোপুরি কপালিপাড়ার মধুয়া।

: তোকে আর ছাড়ান দিব কি রে, জটা ভাই ? তুই ত নিজের থিকে ছাড়ান লিয়ে বসে আছিস্।

: আমাকে আর কেউ মানেন না।

কুইলি সামনে বসেছিল। সে বলে ওঠে : তুইও আর কাউকে মানিস না।

: ঠিক আছেন। আজ থিকে আমি আর কপালিপাড়ার গাঁবুড়ো নেই।

: আজ লয়। অনেকদিন থিকেই তুই আর কপালপাড়ার গাঁবুড়ো নেই।

: বেশ। ইবার মধুয়া যা করবেন, উই হবেন।

: ঠিক আছেন। তুই ইখোন বংশীভাইর জমিনের দশসনের ধান-বিচালির হিসাব দিয়ে দে। বলেছিলি, মধুয়াভাই এলে উকে হিসাব দিবি—

: দিব। আমি কি কুনোদিন বলেছি, দিব নি।

: হঁ। দিয়ে দিস্।

মধুয়া চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। সবাই এসেছে।

: তোরা ত আজ সোব্‌বাই এসেছিস। আমি বলি কি, ঘনুকাকা ইখোন গাঁ-বুড়োর কাম যেমন করছেন, তেমনি করুন।

ঘনু পাশেই বসেছিল। বলে: আমি বুড়া হয়েছি। অন্য কাউকে—

: গাঁ-বুড়ো ত বুড়া মনিষ্যিরাই হয়ে এসেছেন, খুড়া—

: ঠিক কথা। বিশুভাই গা-বুড়ো ছিলেন। কিন্তুক মধুয়া, তখন দিনকাল ছিলেন এক রকম, ইখোন হয়েছেন ভেন্ন রকম। ঠিক কিনা? আমি বলি, লতুন কাউকে কর্। কপালিপাড়ার কুনো জোয়ানকে—

মধুয়া কী একটু ভেবে নেয়। বলে: সামনে পঞ্চায়েতের ভোট হবেন। আজ যে গাঁ-বুড়ো হবেন, পঞ্চায়েতের ভোটে উই আমাদের গাঁ-বুড়ো হবেন।

বংশী সামনে বসেছিল। সে বলে: তা'লে মধুয়া, আজ থিকে তুই আমাদের গাঁ-বুড়ো।

মধুয়া হাসে।

: না রে বংশী। আমি হলি চলবেন না। আমাব অনেক কাম। নানান্ খানে আমাকে ঘুরতি হয়েন। আমি বলি কি, আজ থিকে কুইলিই হলেন আমাদের গাঁ-বুড়ো।

সবাই একসঙ্গে হো-হো করে উঠলো। অনেক গভীর থেকে আওয়াজটা উঠে এসে যেন কপালিপাড়া, জলশিয়রের ধানী জমিন, তালবাঁধ, শরতের আকাশ ছাপিয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে গেল।

মধুয়া বলে: তা'লে গাঁ-বুড়ো কথাটা আর চলবেন নি।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে বললো: গাঁ-বুড়ী—

আবার হাসি। এবার হাসিটা অনেক ফিকে।

: না। গাঁ-মাতা—

সবাই চুপ।

: আজ্র থিকে কুইলিই হলেন কপালিপাড়ার গাঁ-মাতা। ইবার তোরা লাচগান করবি। উর আগে তোরা ইকটু বুধিয়ার কথা ভাব্। বুধিয়া আজ্র নেই।

: বুধিয়া নেই?

সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

: বংশী সাব্ জানে। উকে পুছ্ কর্—

: আমি কিছু জানি না—

বংশী বুক চাপড়ে আর্তনাদ করে ওঠে।

সবাই চুপ। কুইলি বলে ওঠে: সিমলি ইখানে ছিলেন। উ কুথায় গেলেন?

নাচগান আর হলো না। বিকেল থেকেই মেঘ জমছিল আকাশে। অল্পক্ষণ পরেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামলো।

ঘরে ফিরে বংশী দেখে, বুধিয়ার সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে মাথা রেখে সিমলি কাঁদছে। কাঁদ্ সিমলি, কাঁদ্! সারা জীবন কাঁদবি তুই! কী হারালি, তুই জানিস না। কুইলি ওকে খুঁজতে এলো একটু পরে। কাঁদতে কাঁদতে ঘরে নিয়ে গেল ওকে।

সারারাত বংশীর কেবল বুধিয়ার কথা মনে পড়ছিল। দাওয়ায় ওর সাইকেলটা পড়ে আছে। জং ধরছে। কেউ ঝাড়পোঁছ করে না। বুধিয়ার মতো ওটার যেন সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। বুধিয়া সেদিন ওর হাত ধরে আরও কিছুদিন এই পিরথিবিতে বাঁচতে চেয়েছিল। এই পিরথিবির হাওয়ায়, এই পিরথিবির রোদ্দুরে। বংশীর বুকের ভেতরটা বড়ো টনটন করে ওঠে। রাতে আর ঘুম আসে নি চোখে। কাল সারারাত ওর বুকের ভেতর বুধিয়া বড়ো কেঁদেছে। ভোর রাতে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই। ঘুম ভাঙতে একটু দেবি হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখে-মুখে জল দিয়ে দাওয়ার ধারে চুপচাপ বসে রইলো। শরৎকালের বৃষ্টি। কখন থেমে গেছে। উঠোনটা শুকিয়ে খটখট করছে। রোদ্দুর পড়েছে গা এলিয়ে। বোঝা যায়, কুইলি অনেকদিন বংশীর ঘর গোছাতে আসেনি। উঠোনে তাই অনেকদিন ঝাঁট পড়েনি। বেশ নোংরা হয়ে পড়ে আছে।

ওদিকে কিসের একটা শব্দে বংশী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। দেয়ালের কোণের গা ঘেঁষে ঝুঁকে আছে ছোট্ট একটা মাথা।

: কে রে উখানে?

মাথাটা দেয়ালের আড়ালে সরে যায়।

: ইদিকে আয়।

মাথাটাকে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে আবার দেখা যায়: ঝাঁকড়া চুল, ডাগর-ডাগর দুটো কালো চোখ। বেশ মিষ্টি। অনেকটা বুধিয়ার মতো। এক যায়, এক আসে। দিন আর রাতের মতো আলো আঁধারের খেলা। বংশী ভিজে-ভিজে গলায় ডাকে: ইদিকে আয, আয় বাপ্—

দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে তারই গামছাটা টানটান করে পরে এসেছে। কেউ পরিয়ে দিয়েছে বোধ হয়। বংশী তার দিকে তার হাত দুটো বাড়িয়ে ধরে।

: আয়, কাছে আয়—

ছেলেটি ছুটে এসে তার প্রসারিত দু'হাতের মধ্যে ধরা দেয়। বংশী ওকে দু'হাতে লুফে নিয়ে ওর দু'গালে চুমা এঁকে দেয়। আর আশ্চর্য! সেও বংশীর দু'গালে চুমু খায়। বলে: কোলে বত্‌ব—

বংশী ওকে কোলে নিয়ে বসায়। জিজ্ঞেস করে: তোর নাম কি রে?

: দুকাই—

: দুকাই?

: না।

: তা'লে?

: দুকাই—

: দুখাই?

: হিঁ।

: তোর বাপের নাম?

: নেই।

: তোর মায়ের নাম?

: বাতাতী—

বংশীর বুকের রক্তে খুব জোর একটা ঝাঁকি লাগলো। ওদিকের বাবলা গাছের ডালে একটা পাখি ডেকে উঠলো: বাতাসী!। গাঁয়ের বুকের ভেতর থেকে কে কাকে ডাকছে: বাতাসী! কে কোথায় যেন কেঁদে উঠলো: বাতাসী—

বাতাসী কেন জলশিয়রে ফিরে এলো? সে তো একাএকা বেশ ছিল। ঘর, হালবলদ, জমিন, গোরুর গাড়ি, কপালিপাড়ার জনমনিষ্যি—এসব নিয়ে সে তো বেশ ছিল। সে বেশ নিজের মতো করে সব একরকম গুছিয়ে নিয়েছে। সে আর আগেকার মতো নেই। বদলে গেছে পুরোপুরি। নিজেকে ভেঙেচুরে বদলে নিয়েছে একেবারে। এখন সে এক ভেন্ন মনিষ্যি। এখন এ সময়ে জলশিয়রে কেন এলো বাতাসী? একদিন সে ওর সঙ্গে ঘর করেছিল। অনেক দিন ঘর করেছিল ঠিকই। সেদিন স্ব-ইচ্ছায় এসেছিল। বংশীও তাকে গ্রহণ করেছিল। তারপর একদিন সে স্ব-ইচ্ছায় তাকে ছেড়ে নিজের হাতের তৈরি সংসার ফেলে রেখে নিঃশব্দে চলে গেছে। এখন সে পরাণের বউ। পরস্ত্রী।

বংশী সব দিক ভালো করে ভেবে দেখলো, এখানে এই জলশিয়র গাঁয়ে ওদের দু'জনের থাকা সম্ভব নয়।

অনেকদিন পরে বহু কষ্টে ওর জমিন এখন ওর হয়েছে। খোকন বক্‌সি আর জটা—দুজনের গ্রাস থেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে ওর বাপ্‌কেলে সেই পাঁচ বিঘে জমিন। ভেবেছিল, বাকি দিনগুলো সে তার জমিন চাষ করে, গোরুর গাড়ি চালিয়ে কোনমতে কাটিয়ে দেবে। কোথাও যাবে না সে আর। এ পিরথিবিতে তার অভিমানের কোন দাম নেই, তার দুঃখকে কেউ বুঝতে চায় না, তার মনের জ্বালা-যন্ত্রণার কোন সঙ্গী-সাথী নেই। সে জানতো, এবার সে থিতু হয়ে বসেছে, থিতু হয়েই থাকবে। জলশিয়র ছেড়ে আর কুথাও সে যাবে না।

এতদিন বাদে আবার কেন বাতাসী ফিরে এলো?

বংশী কি আবার গাঁ-ছাড়া হয়ে যাবে? বাতাসী একবার তাকে গাঁ-ছাড়া করেছিল। সে কি তাকে আবার গাঁ-ছাড়া করতে ফিরে এসেছে?

বংশী দূরের-আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। তার কোলে বসে একমনে

আধো-আধো স্বরে বকবক করে চলেছে একটি শিশু। যার মায়ের নাম বাতাসী।

আবার কেমন নিরুদ্দেশের আকাশ তার মনের সামনে হাতছানি দেয়। থিতু হয়ে ঘর বেঁধে বাস করা তার কপালে নেই।

শালার হাঘরের পোড়া কপাল!

কপালিপাড়ায় আবার ফিরে আসতে হবে, বাতাসী ওকথা ভাবে নি। ওর কপালটা ওই রকমই। সে যা ভাবে, তা কোনদিনই হয় না। আর যা ভাবে না, তাই হয়। ওবারে আকালের সনে বংশীর সঙ্গে চলে গিয়ে রাজগঞ্জ থেকে কপালিপাড়ায় ফিরে আসার কথা যখন সে শুনলো, তখন তার মনটা দুমড়ে গিয়েছিল একেবারে। কিন্তু তার কোন কথাই টেঁকে নি। নিরুপায়ভাবে মাথা নিচু করে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। এবারেও তাই হলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একান্ত বাধ্য হয়েই ছেলের হাত ধরে সেই কপালিপাড়ায়ই তাকে ফিরে আসতে হলো। কপালিপাড়াই যেন তার নিয়তি। নিয়তির মতো কপালিপাড়া তাকে বারে বারে টেনে নিয়ে আসে। এখানে কিভাবে যে তাব দিন কাটবে, সে জানে না। তবু কপালিপাড়ায়ই তাকে শেষ পর্যন্ত আসতে হলো।

আগে নিজেকে নিয়েই সে ভাবতো। এখন আব ভাবে না। এখন তার যত ভাবনা, দুখাইকে নিয়ে। হাওড়ায় যখন ছিল, তখন ছিল দুখাইর গাড়িঘোড়া চাপা পড়ার ভয়। ঘরে একদণ্ড থাকতে চায় না। কেবল বাইরে পালাবার ঝোঁক। এখানে এসে ভয়, তালবাঁধে কিংবা ডোবায় পুকুরে পড়ে তার ডুবে যাবার।

এতদিন ফাঁকা পড়ে থাকায় ঘরটা হয়েছে একটা ভূতের বাসা। সাফাই করে, গোবর-মাটি লেপেও এখনো বাস করবার মতো হয়ে ওঠে নি। দিনের বেলায় যদি বা চলে যায়, রাত্তিরে ভয় করে। সাপখোপের ভয়।

সেই সকাল থেকে দুখাইর দেখা নেই। কোথায় গেছে, কে জানে। সেদিন কে তাকে একখানা গামছা পরিয়ে দিয়েছিল। হাতে দিয়েছিল লেবু আর আপেল। কে দিয়েছে সে বলতে পাবে নি। কপালিপাড়ায় লেবু-আপেল দেবার মতো কে আছে? শাক-ভাত যেখানে জোটে না, সেখানে লেবু আর আপেল! বাতাসীও ঠিক ঠাউরে উঠতে পারে নি। কে হতে পারেন? দুখাইকে দেখে কার বুকে উল্‌সে উঠেন ইমোন ভালবাসা?

দুখাইকে খুঁজতে বেরোয় বাতাসী। বুড়োবটতলায় অনেকগুলো বাচ্চা খেলা করছিল। ওখানে দুখাইকে দেখতে না পেয়ে ওর বুক উড়ে যায়। মেঘু-রঘুর ঘরেও নেই। কপালিপাড়ার সেই পুরনো রাস্তা। দুধারের ঝোপঝাড়, গাছগাছালি কত বড় হয়ে গেছে। দশ-দশটা সন। কিছু কম সময় নয়। যাবার পথে ডোবা পুকুরগুলোতে অজানা আশঙ্কায় চোখ চলে যায়।

সেই পুলির আগড়। আগড় খুলে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাঁটলে বাতাসীর পায়ের শব্দ হয় না। তবু পুলি টের পায়। এ নির্ঘাত বাতাসী। সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে

আসে। যা-ই ঘটুক আর যত জরুরী কামই থাক, পুলির হাত থেকে সহজে ছাড়ান নেই। কতদিন পরে বাতাসীর সঙ্গে দেখা। কত কথা জমা হয়ে আছে। কত হাসি, কত তামাসা। বাতাসীকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে দাওয়ার ধারে বসায়।

: আমি জানতুম, তুই আসবি। সোকাল থেকে মনটা তোর জন্যে বড় আকুপাকু করছিলেন। তুই না এলে আমি যেতাম আজ।

: আমারও মনটা কেমন করছিল রে, পুলি। ছেল্যেকে খুঁজতে বেরিয়ে পরথমেই ইলাম তোর কাছে।

: উ আমি জানি, তুই কাকে খুঁজতে বেরিয়েছিস। আর বুঝি পরাণের সাথে থাকতি মন ধরছিলেন নি? বংশীভাইর জন্যে মন কেমন করছিলেন, লয়? আমার মন বলছিলেন, বংশীভাইকে ছেড়ে তুই বেশিদিন থাকতি লারবি। তবুও ত দশ-দশটা সন তুই ত উকে ছেড়ে—

: দ্যাখ্ পুলি, তোকে ইকটা কথা বলি, কাউকে বলিস নি। ভালবাসা বল্ আর যা-ই বল্, উ যা পাবার ইখানেই উর কাছেই পেয়েছি। কিন্তুক আমি যে পরাণের 'বে'-করা বউ, উ কথা ত মন ভুলতে লারলেন ইতগুলো সনেও। পরাণ আমাকে অনেক আশা-ভরসা দিয়েছিলেন। উখানে গিয়ে দেখলাম, সোব্ ঝুটা। উ আমাকে কুনোরকমে বংশীর ঘর থিকে কপালিপাড়া থিকে বের করি লিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। উখানে গিয়ে দেখি উ 'বে' করেছেন। উর ইকটা ছেল্যেও আছেন। আমি তখন কপালিপাড়ায় পালিয়ে আসতি চেয়েছিলাম। কিন্তু উ পথ ত আমার বন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন আর কী করি! সোব্ কিছু মেনে লিয়ে উখানে আমাকে থাকতি হলেন।

: পরাণ আর ইকটা 'বে' করেছিলেন?

: ইকটা ছেল্যেও তখন হয়েছিলেন।

অবাক হয়ে যায় পুলি। পরাণ তাহলে ঝুটমুট কথা বলে বাতাসীকে ঠকিয়েছে। বেচারী বাতাসী! বাতাসী এখনো আগের মতো তেমনিই আছে। কিন্তু দেখলে বোঝা যায়, তার মনে কোন সুখ নেই। বুকের কোন্ গভীরে যেন একটা কান্নার গোপন ঝাঁপি লুকোনো আছে। সে ঝাঁপির ঢাকনা কোনরকমে একবার যদি খুলে যায়, তার কান্নায় ভেসে যাবে পিরথিবি।

: বউটা আমাকে দেখতি লারতেন। ঘরের কুনো জিনিসে আমি হাত দিতে লারতাম। অকথা-কুকথা মুখে যা আসে, বলতেন। খেতে দিতেন নি। এই ক'সন আমার ভাত-কাপড় আমাকে গায়ে-গতরে খেটে জোগাড় করতি হয়েছেন, জানিস, পুলি?

: পরাণ কিছু বলতেন নি?

: আমাকে লিয়ে ঘর করবার বাসনা উর ছিলেন নি। বংশীর কাছ থিকে কেড়ে লিয়ে যাওয়াই ছিলেন উর কাম। উর বে-করা বউকে বংশী লিয়ে ঘর করবেন, উতেই উর রাগ। আগে আমাকে বলেছিলেন, উ নি কি কারখানায় চাকরি করেন।

গিয়ে জানলাম সোব্ ঝুটা। উ হাড়-কাঁকালের কারবার করেন। রাতের বিলায় বস্তা লিয়ে দূরে-দূরে যেখানে ভাগাড় আছেন, উখানে হাড়-কাঁকাল কুড়িয়ে লিয়ে সারের কারখানায় যোগান দেন। মানুষের ভাল হাড়-কাঁকাল সোব্ হাসপাতালে বিক্রি করে দিয়ে আসেন। উ দিয়ে নিকি পড়া-লিখা হযেন।

পুলির চোখ দুটো বড়ো হয়ে ওঠে। কী শুনছে সে? নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে ওর কষ্ট হচ্ছে।

: তোর মনে আছেন, পুলি? আকালের সনগুলো কাটিয়ে ফিরে এসে ইখানে-উখানে আমরা কত হাড়-কাঁকাল দেখতি পেয়েছিলাম। হঠাৎ উগুলো কুথায় উধাও হয়ে গেলেন, মনে পড়েন? বুড়োবটতলায উ লিয়ে মিটিনও হয়েছিলেন, মনে পড়েন?

: হঁ। মনে পড়েন। চারদিক থেকে হাড়-কাঁকাল সোব রাতারাতি উধাও—

: উগুলান পরাণই সরিয়েছিলেন। উগুলান সরিয়ে ভালমনিষ্যি সেজে গাঁয়ে হাজির হয়েছিলেন।

: বলিস কি, বাতাসী?

: আমিও আগে জানতে লেরেছি। পরে উ আমার কাছে সোব্ কবুল করেছেন।

: পরাণ হাড়-কাঁকাল কুড়িয়ে বেচেন? গাঁয়ের মনিষ্যি শুনলে ত উঁকে গাঁ-ছাড়া করে ছাড়তেন।

: আমি সোব্ মেনে লিয়েছিলাম, পুলি। আমার আর কুনো উপায় ছিলেন নি। উখান থিকে পালিযেই বা যাব কুথায়, কুন্ চুলায়? আমার যে যাবার আর কুনো জায়গা ছিলেন নি। উদিকে বউটা দিনরাত আমাকে যে কি যাতনা দিতেন, আমি তোকে বলে বুঝাতি লারব। খেতে দিতেন নি, ঘরে শুতেও দিতেন নি। শীতের রাতেও ইতটুকুন ইক্ টুক্‌রা দাওয়ায় হিমজাড়ির মধ্যে গায় কাঁথা দিয়ে পড়ে থাকতাম।

বাতাসী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। নিজের জীবনের লাঞ্ছনা ও দুঃখ-বেদনার স্মৃতি এক-একটা দগ্‌দগে ক্ষতের মতো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, ব্যথা দেয়। বড় কান্না পায়। পুলি হাত দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়। ওরও মনের ভেতর বৃষ্টি নামে। কান্না ঝরে। বাতাসীকে পুলি বড়ো ভালোবাসে। ওর দুঃখের কথায় ওরও কেমন কান্না পায়।

: উরই মধ্যে দুখাই পেটে এলেন। আমার উপর যাতনা বেড়ে গেলেন। দুখাই যতদিন পেটে ছিলেন, একদিনও কারখানার কামে কামাই দিই নি। কামাই দিলে খাবার জুটতেন নি। দুখাই হলেন। তখন হাসপাতালে। তিনদিনের দিন উরা সোব্‌বাই রাতের বিলা কাউকে কিছু না জানিয়ে কুথায় চলি গেলেন। হাসপাতাল থিকে ছুটি করে দুখাইকে লিয়ে ফিরে এসে দেখি, কেউ নেই, সোব্ ফাঁকা। পাশের ঘরে যারা ছিলেন, উরা টের করেছেন। আমি কামে যেতাম, উরা দুখাইকে দেখতেন। তিন তিনটা সন এমনি করে কাটলেন। ভেবেছিলাম, মনিষ্যির প্রাণ, একদিন

নয় একদিন কাঁদবেন। শেষে বুঝলাম, সোব্ ভরসাই ঝুটা। শেষে কপালিপাড়াই আমাকে টেনে লিয়ে এলেন। মরতি হয়েন, ইখানেই মরব। আর কেউ না দেখুন, তুই ত আমার দুখাইটাকে দেখবি। তোর ভরসাই আমার একমাত্তর ভরসা রে, পুলি—

পুলির বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে বাতাসী।

: কথা দে, পুলি, তুই আমার দুখাইকে দেখবি। আমি না মরি, কুথাও চলি যাব—

পুলি বাতাসীর মুখটা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে: ঠিক আছেন, বাতাসী। আজ থিকে তোর দুখাই আমার গণাইর সঙ্গে একসাথে বড় হয়ে উঠবেন।

গণাই ঘরের ভেতর ঘুমোচ্ছিল। সে দাওয়ায় মায়ের গলা শুনে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে কাছে দাঁড়িয়ে পুলিকে দেখতে থাকে। ওর কান্নাভরা মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বাতাসি এই পরথম পুলির ছেলেকে দেখছে। সে ওকে বুকে টেনে নেয়।

: দশ সন আগের কথা তোর মনে পড়েন, পুলি? ঘরের উঠানে দু'পাটির চারা পুঁতে দিয়ে তুই বলেছিলি, ফুল ফুটলে ঘরে সুখ আসবেন। বর্ষার পর যখন ফুল ফুটলেন, তখন তুই কুথায় চলে গেছিস। ফুলগুলানের দিকে তাকালে আমার শুধু তোর হাসিমুখই মনে পড়তেন।

বাতাসী গণাইকে পুলির কোলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

: যাই। ছেল্যেটা কুথায় গেলেন, খুঁজে লিয়ে আসি। কুথাও যাবি নি। আমি ফের ফিরে আসছি ইক্‌খুনি—

বাতাসী ছেলেকে এখানে-ওখানে অনেক খুঁজলো। দেখা নেই। নাম ধরে অনেক ডাকলো। সাড়া পেল না। শেষে বংশীর ঘরের রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে ডাকে: দুখাই—

দুখাই বংশীর দাওয়ায় খেলা করে বেড়াচ্ছিল। বংশী বসে দেখছিল দুখাইকে। বাতাসীর গলা শুনে দুখাই ছুটে এসে বংশীর পিঠের ওপর পিঠ হয়ে দুহাত দিয়ে ওর গলাটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাস্তার বাঁকটা ঘুরে বাতাসী এসে দাঁড়ালো উঠোনের একপাশে। দুখাইকে সে দেখতে পায়।

: দুখাই—

: দাব নি। দা তুই ইকান তিকে—

দৃশ্যটা বাতাসী বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। সেই ঘর, সেই দাওয়া, সেই উঠোন। বংশী তাকায় বাতাসীর মুখে। সকালের স্নিগ্ধ রোদ্দুর এসে পড়েছে ওর মুখে। বাতাসী তেমনিই আছে। তেমনি চিকন কালো তেলতেলে মুখ। তেমনি ছিপছিপে লাউডগার মতো শরীল। তেমনি ডাগর-ডাগর করুণ টানা-টানা চোখ। নড়বার শক্তি ছিল না তার। কোন কথা নেই মুখে। যেন মাটির প্রতিমা। দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। যেন কতকাল ওরা এমনি করে চেয়ে আছে।